KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৮ সূর্য সেন স্ট্রিট, কল-১২
Collection : KLMLGK	Publisher বীর সরকার
Title [illegible]	Size 7'x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫৯/১-২	Year of Publication : September 1999
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : [illegible]	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৯ সংখ্যা ১ ও ২

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবর্ষ স্মরণে বাংলায় রহস্যরস-সাহিত্যে তাঁর অবদানের মূল্যায়ন ছাড়াও অলৌকিক কাহিনী বয়নে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনন্য ভূমিকার বিশ্লেষণ রয়েছে ড. সুভদ্রকুমার সেনের সন্দর্ভে।

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' অবলম্বনে ড. বিজিতকুমার দত্তের প্রতিপাদ্য—বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর শৈলীর মেলবন্ধন ঘটিয়ে শরদিন্দু বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অভিনবত্বের উদ্ভাবক এবং এই ধারাতেও সার্থক স্রষ্টা।

শরদিন্দুর অতিলৌকিক কাহিনী রচনার মুনশিয়ানা প্রসঙ্গে ড. বিষ্ণু বসুর আলোচনা।

তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচ্য, শরদিন্দুর মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য। শিশু ও কিশোরদের উপযোগী কাহিনীগুলির প্রতি আলোকপাত করেছেন অশোককুমার মিত্র।

'বঙ্গসংহার এবং'—দেশভাগের কিছু আগে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা' গঠনের উদ্যোগ এবং পরিণতির কৌতূহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত নিয়ে এবারের কিস্তি।

'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত-মন'-এর ২য় কিস্তি।

পাকিস্তান থেকে ফিরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থার অন্তর্নিহিত রহস্য বিশ্লেষণ করেছেন শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

'রাসসুন্দরীর আত্মকথা'—এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে উনিশ শতকের গ্রাম্যবধূ স্বশিক্ষিত রাসসুন্দরীর অসাধারণত্ব।

চতুরঙ্গ

অকাদেমির নতুন দুটি সংকলন

বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য

সংকলন ও সম্পাদনা ।। সুতপা ভট্টাচার্য

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথম দুই শতক সময়কাল পর্যন্ত প্রকাশিত মেয়েদের এসব লেখার মধ্যে ধরা পড়েছে কীভাবে পশ্চিমের সাহিত্য-বিজ্ঞান-ইতিহাস সবকিছুই পরিগ্রহণ করেছে মেয়েরা, যত্ন করে অর্জন করেছে নিজের দেশের জ্ঞানভাণ্ডার। ১১০ টাকা

বাংলা থিয়েটারের গান

সংকলন ও সম্পাদনা ।। দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই গ্রন্থে সংকলিত দুশ চৌষট্টিটি গান, এক অর্থে দুশ বছরের বাংলা নাট্য সংস্কৃতির বিস্মৃত মুকুর, অন্য অর্থে অবশ্যই, এক উজ্জ্বল উদ্ধার। ৫০ টাকা

সাহিত্য অকাদেমি
জীবনতারা, ২৩এ/৪৪ এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড,
কলকাতা ৭০০ ০৫৩, দূরভাষ : ৪৭৮-১৮০৬
প্রাপ্তিস্থান : অকাদেমি দপ্তর, দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, উষা পাবলিশিং, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ইত্যাদি।

সাউথ অব পার্ক স্ট্রিটে একমাত্র বাঙালি রেস্তোরাঁ

পারিজাত

অপেক্ষাকৃত ন্যায্য মূল্যে এখানে পাওয়া যায়
মাছ ও মাংসের বিচিত্র উপাদেয় খাদ্যসম্ভার
বিড়লা তারামণ্ডলের বিপরীতে মাত্র
কয়েক সেকেণ্ডের পথ
থিয়েটার রোড ও চৌরঙ্গি রোডের সংযোগস্থল।

বর্ষ ৫৯ সংখ্যা ১ ও ২

■ রহস্যরসস্রষ্টা শরদিন্দু — সুভদ্রকুমার সেন — ১
■ তুঙ্গভদ্রার তীরে —'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' — বিজিতকুমার দত্ত — ১০
■ 'সত্যান্বেষী' শরদিন্দু — তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৮
■ 'জননান্তর সৌহৃদানি' : অপ্রাকৃত গল্পের শরদিন্দু — বিষ্ণু বসু — ২৬
■ শিশুসাহিত্যে শরদিন্দু — অশোককুমার মিত্র — ২৯

■ পিপাসা — উৎপলকুমার বসু — ৩২
সমস্তদিন — প্রমোদ বসু — ৩৩
জাগা — নির্মল বসাক — ৩৪
নির্দ্বিধায় — রবি গঙ্গোপাধ্যায় — ৩৫
নির্মলা — মন্দার মুখোপাধ্যায় — ৩৬
সংবেদের নীল — সুকুমার চৌধুরী — ৩৭
অপাপবিদ্ধ — শেখর আহমেদ — ৩৮
সাক্ষাৎকার — সুচন্দ্রনাথ দাস — ৩৯

ধারাবাহিক সন্দর্ভ

■ বঙ্গসংহার এবং — সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত — ৪০
■ বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক বাঙালি মধ্যবিত্ত-মন — অরুণ মজুমদার — ৪৯
■ রাসসুন্দরীর আত্মকথা — এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় — ৫৯
■ কিছু হাসি, কাশি আর ঘামের গন্ধ — শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় — ৬৬

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

■ পাকিস্তান : একটি অস্মিতার সংকট — শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — ৬৯
■ শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য বার্লিন সম্মেলন : জুন ১৯৯৯ — সুরজিৎ দাশগুপ্ত — ৭৫

গ্রন্থসমালোচনা — ৭৬

■ কুমার রায় ■ সোহরাব হোসেন ■ অনিতা অগ্নিহোত্রী ■ মেঘ মুখোপাধ্যায় ■ সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

স্মৃতিচারণ

■ গৌরীদি — আমার স্মৃতিতে — প্রণতি মুখোপাধ্যায় — ৮৫

চিঠিপত্র

■ অতীন্দ্রমোহন গুণ — ৮৭

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯
থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত
অক্ষর বিন্যাসে — র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

মূল্য : পনেরো টাকা / সডাক আঠারো টাকা
শিল্প পরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত

দূরভাষ : ২৩৭-৩৭৭০
সম্পাদক : আবদুর রউফ

ভারতবাসী মাত্রেই দাবি করেন
তিনি মিষ্টির ঠিকুজি কুলুজি সমস্ত জানেন।
কিন্তু সত্যিই জানেন কি?

★ ঘরে বাইরে রসগোল্লার প্রচলন কে করেন বলুন তো?
★ এই রসগোল্লাকে প্রথম বায়ু নিরুদ্ধ আধারে আবদ্ধ করেন কে?
★ রসমালাই কার সৃষ্টি?
★ ডায়াবিটিস রুগীর জন্যে বিশেষ মিষ্টি তৈরি করেন কে?
★ কে প্রথম সন্দেশের মধ্যে ছানার পায়েস ভরার কথা ভাবেন?

যদি সব প্রশ্নের উত্তরে বলে থাকেন কে. সি. দাশ,
তাহলে আপনি সত্যিই.....

কে. সি. দাশ

১) ১১এ ও বি, এসপ্ল্যানেড ইস্ট,
কলিকাতা-৭০০ ০৬৯
টেলিফোন : ২৪৮-৫৯২০

২) ৩৮, চার্চ স্ট্রীট
ব্যাঙ্গালোর-৫৬০ ০০১
টেলিফোন : ৫৫৮-৫৬৭২/৭০০৩

নবীন চন্দ্র দাশ
২এ, হেমকর লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৫
টেলিফোন : ৫৫৪-৫৬৮৯

প্রবন্ধ

রহস্যরসস্রষ্টা শরদিন্দু

সুভদ্রকুমার সেন

১. রহস্যরসসাহিত্য

সাহিত্যে পূর্বাপর প্রচলিত নব রসের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নতুন একটি দশম রস যুক্ত হয়েছিল তার বহু বিচিত্র ও ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই। এই নব সংযোজিত দশম রসটিকে বলতে পারি 'রহস্য'-রস। সংস্কৃতে 'রহস্য' শব্দের অনেক অর্থ। বর্তমান আলোচনায় শব্দটিকে আমি সাধারণ প্রচলিত বাংলা অর্থেই গ্রহণ করেছি। হাস্যপরিহাস বোঝাতে নয়। সাহিত্যে এই রহস্যরসের দুটি বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। একটিকে বলতে পারি লৌকিক রহস্যরস, অন্যটিকে অলৌকিক বা অতিলৌকিক রহস্যরস। এখানে লৌকিক শব্দটিকে প্রাত্যহিক জীবন সম্পৃক্ত অর্থাৎ ইংরেজি mundane অর্থে এবং অলৌকিক বা অতিলৌকিককে সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনের সীমারেখা অতিক্রমী অর্থাৎ ইংরেজি preternatural অর্থে ব্যবহার করেছি। আমাদের ব্যবহৃত অর্থে অলৌকিক রহস্যরস mysticism থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, স্বতন্ত্র। লৌকিক রহস্যরস পরিবেশিত হয় লৌকিক রহস্যসাহিত্য মারফত আর অলৌকিক বা অতিলৌকিক রহস্যরস অলৌকিক রহস্য সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। এখানে বোধহয় 'লৌকিক রহস্য' ও 'অলৌকিক বা অতিলৌকিক রহস্য' বলতে কী বোঝাতে চাইছি সেটা আরও পরিষ্কার করে বলা দরকার। 'লৌকিক রহস্য' বলতে বোঝাতে চাইছি সেই রহস্য যা এক বা একাধিক মানুষের মাথা খাটিয়ে বের করা এমন ঘটনা যা অন্য কোনও মানুষ মাথা খাটিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে। অর্থাৎ একজন (বা অনেকে) যে সমস্যার সৃষ্টি করছে অপরে তার সমাধান করছে। অনেকটা যেন অঙ্কের বইয়ের পরিচ্ছেদের শেষে জুড়ে দেওয়া প্রশ্নমালা। গ্রন্থকর্তা প্রশ্নগুলি তৈরি করে দিলেন আর অন্য আর একজন—এ ক্ষেত্রে ছাত্রেরা—তার সমাধান করে দিল। অলৌকিক রহস্য অবশ্যই লোকসৃষ্ট নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানবিক বুদ্ধি অলৌকিকের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পেতেও পারে। অনেক ক্ষেত্রেই পায় না। এই অলৌকিক রহস্যসাহিত্য ক্ষেত্রবিশেষে পাঠককে তাৎক্ষণিক আনন্দ দেয়। কখনও কখনও আমাদের জীবনভাবনায় ক্ষণিক বা স্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। (সহজ কথায় প্রথম থাকের গল্পকে বলতে পারি গোয়েন্দা গল্প আর দ্বিতীয় থাকের গল্পকে ভূতের গল্প।) সাহিত্যে লৌকিক রহস্যগল্পের চাইতে অলৌকিক বা অতিলৌকিক রহস্যকাহিনী প্রাচীনতর। ইংরেজি উচ্চকোটির সাহিত্যে অলৌকিক-অতিলৌকিক রহস্যরস পরিবেশিত হয়েছে নাটকে (Hamlet), কবিতায় (Christable, The Listeners)। লৌকিক রহস্যরস সাহিত্যের হাটে দেখা দিয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এর বৈপ্লবিক বিকাশ ঘটেছে। লৌকিক রহস্যসাহিত্যের প্রকৃত স্রষ্টা হলেন মার্কিন কবি-সাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো (Edgar Allan Poe ১৮০৯–১৮৪৯)। পো প্রদর্শিত এই শ্রেণীর (genre) সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে সুখপাঠ্য ধ্রুপদী (classical) লেখক হলেন আর্থার কোনান ডয়েল (Arthur Conan Doyle ১৮৫৯–১৯৩০)। ডয়েলের প্রতিভাস্পর্শে এই সাহিত্য এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে এই সাহিত্যকে এখন অনেকে বলছেন নাগরিক জীবনের রূপকথা অর্থাৎ Urban folktales। অর্থাৎ গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের গল্প সংকলনের (Haus und Kindermarchen) যে খাতির যে মর্যাদা সেই খাতির বা মর্যাদা লৌকিক রহস্যরসসাহিত্যের প্রাপ্য। ডয়েলের পরে অনেকে এই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বাংলাসাহিত্যে এই দুই রহস্যরসের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ও বিংশ শতাব্দীতে। বলাবাহুল্য ইংরেজিসাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগেই এই ব্যাপার সম্ভব হয়েছে। বাংলাসাহিত্যে অলৌকিক সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য ফসল রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি (ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, মণিহারা) উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা। রবীন্দ্রনাথের পরে এই ধরনের সাহিত্য সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুল। লৌকিক রহস্যকাহিনীর রচনা ও শুরু উনবিংশ শতাব্দীতে। বাংলায় এই ধরনের কাহিনী যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ পাই বটতলা ডিটেকটিভ সংকলনের সংখ্যা বৃদ্ধি থেকে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯ – ১৯৭০) রহস্যরসের দুই ভিন্ন ধারার অনুশীলন করেছেন বরাবর। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই দুই নবীন ধারার তিনি মোটেই খুচরো কারবারি নন, রীতিমত পাইকারি যোগানদার। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের তুলনা চলে। তফাত এইটুকু যে প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন এই ধরনের বিশেষ করে লৌকিক রহস্যকাহিনী রচনায় জোর দেন — পরাশর বর্মা সিরিজ — তখন তিনি সিরিয়াস গল্প, উপন্যাস ও কবিতা লেখা ছেড়ে দেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চকোটির সাহিত্য ও এই ধরনের নিম্নবর্গীয় সাহিত্য প্রায় যুগপৎ রচনা করেছেন। বর্তমান নিবন্ধে অল্প পরিসরে তাঁর দুই প্রকার রচনার একটি সামগ্রিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি।

‘লৌকিক’ ও ‘অলৌকিক-অতিলৌকিক’ রহস্যসাহিত্য নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে ‘অলৌকিক-অতিলৌকিক’ সাহিত্যের উৎস সন্ধানে সিগমন্ড ফ্রয়েড এবং অন্যান্য মনস্তত্ত্ববিদ ও বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদরা পরে এ সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। বর্তমান নিবন্ধে এই দুইশ্রেণীর সাহিত্যের উৎস-সন্ধানের বা এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের কোনও ইতিবৃত্ত দেওয়া অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করেছি। দেশে ও বিদেশে অলৌকিক-অতিলৌকিক সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠে উৎসুক পাঠক ‘উপচ্ছায়া’ গ্রন্থের ভূমিকাদুটি[১] এবং লৌকিক রহস্য সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের জন্য ‘ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি’[২] বইটি পড়তে পারেন।

২. লৌকিক রহস্য

অপরাধ (Crime) তদন্ত, অনুসন্ধান বা হুনুরবৃত্তি (investigation) ও সাজা (punishment) সব সমাজে, সব দেশে, সবকালে সাধারণজীবনের স্থিতাবস্থার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি বিশেষ অঙ্গ। সমাজে ব্যক্তিবিশেষ অপরাধ করে, সে অপরাধের তদন্ত করে অপরাধী বা দোষী ব্যক্তির সাজা দেয় রাষ্ট্রিক প্রতিনিধি। এই প্রথার প্রচলিত রূপ আমাদের দেশের প্রাচীন, মধ্য ও অনাধুনিককালের সাহিত্যে প্রচুর আছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অংশ না হয়েও একজন ব্যক্তি অনুসন্ধান করছে এবং দোষী ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার হাতে তুলে দিচ্ছে এই ধরনের চরিত্র কল্পনা করে সাহিত্য রচনার সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীতে। (এই প্রসঙ্গে বলা দরকার ওল্ড্ টেস্টামেন্টের (The Old Testament) দানিয়েলের (Daniel) উপাখ্যান নব্যধারার অপরাধ ও অনুসন্ধানের (crime and detection) প্রথম ঐতিহাসিক নিদর্শন।) উল্লেখযোগ্য যে উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন লৌকিক-রহস্যসাহিত্য অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[৩] স্বভাবতই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ও বিপুল চাহিদার যোগান মেটাতে এই শ্রেণীর (genre) সাহিত্যকর্মে ব্রতী লেখকদের কাহিনীতে, ঘটনার সংস্থাপনে, মানবমনস্তত্ত্বের ব্যবহারে অভিনবত্ব সঞ্চারে সতত প্রযত্ন করতে হয়। ফলে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই সাহিত্য বিচিত্র ও বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়। (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিদেশি গুপ্তচরদের ক্রিয়াকলাপ ও সে চেষ্টার প্রতিরোধও এই সাহিত্যের কথাবস্তু হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে যত লেখা হয়েছে সুখপাঠ্যতায় অদ্যাপি সবার সেরা হরলার (Sydney Horler ১৮৮৮ – ১৯৪৪)। (নাইট হক (Night hawk) চরিত্রকে হুনুর করে লেখা বইগুলি।) মোটামুটিভাবে এই লৌকিক রহস্যসাহিত্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। অবশ্যই এই থাকগুলি নিশ্ছিদ্র জল-অচল (watertight) শ্রেণীবিন্যাস নয়। থাকগুলি এই রকম :

এক. কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু : ক. হুনুর বা গোয়েন্দা। কিন্তু যেহেতু তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থার অংশ নন তাই তাকে পুলিশের সাহায্য নিতে হয় অপরাধীকে ধরতে অথবা সাজা দিতে। এই ধরনের কাহিনীতে হুনুর ও পুলিশের মধ্যে নিগূঢ় অথবা উলঙ্গভাবে প্রকটিত love-hate relationship (প্রেম-বিদ্বেষ সম্পর্ক) থাকে। প্রকৃষ্ট উদাহরণ রেক্স স্টাউটের (Rex Staut) ইন্সপেক্টর ক্র্যামার (Crammer) চরিত্র।

খ. পুলিশ ইন্সপেক্টর। এই জাতীয় কাহিনীতে সিসটেমই (system) প্রধান হয়ে ওঠে তাই চরিত্রটি পাঠকমনে বিশেষ দাগ কাটে না। ব্যতিক্রম সিমেনোঁ (Simenon) ও অ্যাপেলবি (Appleby)। এই ধরনের কাহিনীর কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু গোয়েন্দা বা হুনুরের কর্মপদ্ধতি, তার বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্লেষণদক্ষতা।

দুই. ক. অপরাধকর্মের সংঘটন। এই ধরনের কাহিনীতে অপরাধী বা একটি সংঘ খুব ছক কষে একটি দুষ্কর্ম করে। এ জাতীয় কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য অপরাধীর কার্যকলাপ। এই শ্রেণীর কাহিনীতে অনেক সময় অপরাধ সংঘটনের পরই গল্পের শেষ হয়ে যায়। এই ধরনের

কাহিনীকে anti detective story বলতে পারি। লৌকিক রহস্য কাহিনীর বোধহয় একটা (একমাত্র নয়) বক্তব্য হল Crime does not pay। এই জাতীয় গল্প উল্টোই প্রমাণ করে।

খ. অপরাধ সংঘটন ও অপরাধীকে শনাক্তীকরণ। এ রচনাগুলি উপন্যাস বা খুব বড় গল্প। কাহিনী স্পষ্টত দুটি ভাগে বিন্যস্ত। প্রথম ভাগে অপরাধ দ্বিতীয় ভাগে অনুসন্ধান।

তিন. (রোমাঞ্চক) ঘটনার ঘোর ঘনঘটাপ্রধান রুদ্ধশ্বাস দ্রুতগতিপ্রধান কাহিনী। ক. হুনুর ও অপরাধী (দল) সর্বদাই পরস্পরের প্রতি ধাবিত। খ. অপরাধী (দল) কে হুনুর অনুসরণে তৎপর।

প্রথম ও দ্বিতীয় থাকের সঙ্গে তৃতীয় থাকের কাহিনীর দুটি মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথমত, এই ধরনের কাহিনীতে চরিত্র বা চরিত্রের মনস্তত্ত্ব নয়, ঘটনার সংস্থাপনই প্রধান। ঘটনার গতি কখনও শ্লথ হয় না। বিশ্লেষণকে ছাড়িয়ে ও ছাপিয়ে যায় গতি। প্রথম থাকের ও দ্বিতীয় থাকের উপন্যাসগুলিতে তদন্ত (investigation) ও চুলচেরা বিশ্লেষণই (analysis) প্রধান। এই শ্রেণীর কাহিনীতে হুনুর আর গোয়েন্দার মধ্যে চলে বুদ্ধির তীব্র প্রতিযোগিতা। তৃতীয় ধরনের গল্পে ঘটনাই পরিণতির দিকে অবধারিতভাবে নিয়ে যায়। এ যেন ট্রেন। ইঞ্জিন থেকে গার্ডের গাড়ি পরস্পরের সঙ্গে লেগে আছে কাপলিংয়ের (Coupling) সাহায্যে। দুটি কোচের মধ্যে সম্পর্ক থাকতে পারে, না-ও পারে। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের রচনায় হুনুর ও অপরাধীর মধ্যে বিশেষ কোনও তফাত নেই। এরা যেন পরস্পরের এপিঠ-ওপিঠ। তফাত একজন আইন ভাঙে আর অন্যজন আইন লঙ্ঘন না করে যতটা বে-আইনি কাজ করা যায় তা করতে পিছপা নয়। মারপিট, গুণ্ডামি (এবং প্রয়োজনে) অত্যাচারে এবং মদ্যপানে দুজনেই সমান দক্ষ। মার্কিন সমালোচকদের ভাষায় এঁরা হলেন শক্তপোক্ত গোয়েন্দা (hard-boiled detective)। এডগার ওয়ালেস (Edgar Wallace ১৮৭৫ – ১৯৩২) অনুপ্রাণিত এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট — অবশ্যই আমার মতে — শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ব্রেট হ্যালিডের (Brett Halliday আসল নাম David Dresser ১৯০৪ – ১৯৭৭) গোয়েন্দা মাইক শেন (Mike Shayne)।

আগেই বলেছি যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লৌকিক রহস্য কাহিনীর পাইকারি ব্যবসায়ী। কিন্তু কাহিনীর পটভূমিকা নির্বাচনে তাঁর পরিণিতিবোধ লক্ষণীয়। তিনি তাঁর কাহিনীগুলিকে প্রথম থাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। দ্বিতীয় বা তৃতীয় থাকের কাহিনী তিনি মোটেই লেখেননি। কেন লেখেননি সে প্রশ্নের উত্তর জানা নেই তবে মনে হয়, না লিখে ভালই করেছেন। আমাদের জীবনভাবনার ও জীবনচর্চার সঙ্গে ওই ধরনের কাহিনীকে খাপ খাওয়ানো প্রায় অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার। সাধারণভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের মধ্যে লৌকিক ও অলৌকিক রহস্যকাহিনী সম্বন্ধে বিরূপতা হয়ত নয় তবে উন্নাসিকতা আছে। বোধহয় reservation বলাই ভাল। এদের মধ্যে যাঁরা এ ধরনের কাহিনী রচনা করেছেন বা করছেন তাঁরা এ কথা জানাতে কদাপি ভোলেন না যে এই কাহিনী কেবলমাত্র কিশোরপাঠ্য। অর্থাৎ এঁদের লেখা অন্যান্য সাহিত্যকর্ম থেকে এরা সম্পূর্ণ আলাদা। একাসনে বসার যোগ্য নয়। শরদিন্দুবাবু ও বনফুল এ ব্যাপারে সবার থেকে ভিন্ন। তিনি তাঁর লেখা ‘লৌকিক’ ও ‘অলৌকিক’ রহস্য কাহিনীগুলিকে কখনওই তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর সৃষ্টিকর্ম বলে স্বীকার করতেন না। তাঁর প্রথম গোয়েন্দাকাহিনী সংকলন ‘ব্যোমকেশের ডায়েরী’ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন —

> ডিটেকটিভ গল্প সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে — যেন উহা অন্ত্যজ শ্রেণীর সাহিত্য। আমি তাহা মনে করি না। Edgar Allan Poe, Conan Doyle, G. K. Chesterton যাহা লিখিতে পারেন, তাহা লিখিতে অন্ততঃ আমার লজ্জা নাই।

বস্তুত তিনি দু'ধরনের লেখাই লিখে গেছেন প্রায় সমান্তরাল ভাবে। একটি প্রমাণ দিলেই আমার কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে। ১৩৪০ সালে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘জাতিস্মর’ প্রকাশিত হয়। ওই বছরেই বের হয় ‘ব্যোমকেশের ডায়েরী।’

একটা ব্যাপারে লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক স্যার আর্থার কোনান ডয়েলকে টেক্কা দিয়েছেন। কোনান ডয়েল তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে বেশি মর্যাদা দিতেন। শরদিন্দুবাবু বোধকরি ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ ও ‘চিড়িয়াখানা’ দুটি বইয়ের প্রতি সমমনোভাবাপন্ন ছিলেন। এই প্রসঙ্গে কোনান ডয়েলের পুত্রবধূ তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন যে পরিণত বয়সে কোনান ডয়েল শার্লক হোমসের নামোচ্চারণ পর্যন্ত বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে শার্লক হোমস তাঁকে (কোনান ডয়েলকে) তাঁর প্রাপ্য যথাযোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শার্লক হোমসের কাহিনী গুলির জনপ্রিয়তা তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকীর্তিকে নেপথ্যে সরিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিগত পরিচয়েরসূত্রে জানি যে শরদিন্দুবাবুর ব্যোমকেশের প্রতি কোনও বিরূপতা ও বিদ্বেষ ছিল না। পক্ষান্তরে তিনি আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে সত্যবতীর কোষ্ঠী বিচার করে তিনি দেখেছেন যে তার ভাগ্যে গাড়ি নেই। (অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সত্যবতীকে গাড়ি কিনিয়ে দেবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়েছিলেন।) শরদিন্দুবাবুর গণনা যে কত অভ্রান্ত তা তিনি নিজের জীবনে প্রমাণ করে গেছেন।

শরদিন্দুবাবুর সঙ্গে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের আরও কোনও কোনও বিষয়ে মিল আছে। দু'জনেই ঐতিহাসিক রোমান্স রচনায় সিদ্ধহস্ত। ওয়াটসনের মধ্যে কোনান ডয়েলের ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। দু'জনেই ডাক্তার। অজিতের মধ্যে শরদিন্দুবাবুর ছায়া আছে — দু'জনেই লেখক। ওয়াটসন শার্লক হোমসের কাহিনী লিখেছেন। কয়েকটি গল্পে ওয়াটসন অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় হোমসকেই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে। শরদিন্দুবাবুও ব্যোমকেশকে দিয়ে গল্পটি লিখিয়েছেন অজিত বইয়ের ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ার জন্য। ডয়েলের মতো শরদিন্দুবাবুও প্রেতলোকে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। তবে ডয়েল বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী রচনা করেছেন — প্রোফেসর চ্যালেঞ্জারের (Professor Challenger) কাহিনীগুলি — শরদিন্দুবাবু তা করেননি। শরদিন্দুবাবুর সঙ্গে ডয়েলের সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের। সুতরাং উত্তমর্ণ অধমর্ণ বিবেচনার কোনও সুযোগই নেই! অবশ্যই শরদিন্দুবাবু ডয়েলের থেকে বস্তু বা ভাব সংগ্রহ করেছেন। এটাই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত, না হলেই ব্যাপারটি অসঙ্গত হত। কোনান ডয়েলের কাছে পরবর্তী সব লেখকই অল্পবিস্তর ঋণী। এমনকী আগাথা ক্রিস্টিও। সুতরাং শরদিন্দুবাবু অধমর্ণ বলে কিছু অচ্ছুৎ বা অপাঙ্‌ক্তেয় নন। কোনান ডয়েলের কাছে শরদিন্দুবাবুর ঋণের প্রকৃতির পরিচয় দেবার জন্য কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হল। শরদিন্দুবাবুর 'চোরাবালি' গল্পের চোরাবালি দি হাউন্ড অফ্ বাস্কারভিল্‌সের (The Hound of Baskervilles) গ্রিমপেন মায়ারের (Grimpen Mire) কথা মনে পড়ায়। 'সীমন্তহীরা' গল্পে নটরাজমূর্তির মধ্যে হিরা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা 'দি সিক্স নেপোলিয়ন্‌স্' (The six Napoleons) দ্বারা অবশ্যই অনুপ্রাণিত। 'এ কেস অফ আইডেন্টিটি' (A case of Identity) গল্পটি 'অদ্বিতীয়' গল্পের বীজস্বরূপ। 'ব্যোমকেশ ও বরদা' গল্পে লৌকিকরহস্য বিশেষজ্ঞ ও অলৌকিক রহস্য বিশেষজ্ঞের যুগপৎ উপস্থিতি এবং একের অন্যকে প্রভাবিত করার চেষ্টা 'দি সাসেক্স ভ্যামপায়ার' (The Sussex Vampire) গল্পের অনুসরণে লেখা। যদিও গল্প দুটির মানবিক আবেদন সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের। সবচেয়ে বড় কথা শার্লক হোমসের একটি স্বতঃসিদ্ধ (axiom) ব্যোমকেশের কার্যপ্রণালীরও মূল কথা। শার্লক হোমসের উক্তি: ''That proces'', said I, ''starts upon the supposition that when you have eliminated all which is impossible then whatever remains, however, improbable, must be the truth.''[৩] তুলনা করা যায় অজিতের মন্তব্য, "ব্যোমকেশ বলিয়াছে, কোনও বিষয়ের যুক্তিসম্মত প্রমাণ যদি থাকে অথচ তাহা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবু তাহা সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে।''[৪]

শার্লক হোমসের সঙ্গে ব্যোমকেশের কার্যপ্রণালীতে ভিন্নতা অভিন্নতা দুই-ই আছে। আগে অভিন্নতার কথা উল্লেখ করি। শার্লক হোমস পর্যবেক্ষণক্ষমতার অনুশীলন ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণীর সাহায্যে অনেক কথা বলে লোককে আশ্চর্য করে দিতেন। (এ ক্ষমতার প্রত্যক্ষ পরিচয় কোনান ডয়েল পেয়েছিলেন তাঁর অধ্যাপক এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার জোসেফ বেলের (Dr. Joseph Bell) আচরণে।)

> ''It may seem very foolish in your eyes,'' I added, ''but really I do not know how you deduced it.''
> Holmes chuckled to himself.
> I have advantage of knowing your habits..... As I perceive that your boots although used, are by no means dirty, I cannot doubt that you are at present busy enough to justify the hansom.[৫]

এর সঙ্গে সহজেই তুলনা করা যায়,

ব্যোমকেশ উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া বলিল, — "অপরিচিত ব্যক্তি — প্রৌঢ় — মোটাসোটা — নাদুসনুদুস বললেও অত্যুক্তি হবে না — হাতে লাঠি আছে — কে ইনি?....''[৬]

দু'জনের মধ্যে মৌলিক ও গভীর পার্থক্য হচ্ছে প্রয়োজনে ব্যোমকেশ রিভলভর বের করে ('সত্যান্বেষী'), হোমসের প্রধান অস্ত্র মোটা বেতের লাঠি। পিস্তল থাকে পুলিশের হাতে অথবা সেনাবিভাগের প্রাক্তন ডাক্তার ওয়াটসনের কাছে। হোমস একজন সাধারণ নাগরিক। আর এইটাই সঙ্গত।

এতক্ষণ যা লিখেছি তার থেকে এ-কথা মনে করবার কোনও কারণ নেই যে শরদিন্দুবাবু কোনান ডয়েলের অগণ্য অনুকারীর একজন। সাহিত্যিক বিশেষ করে সৎ ও প্রতিভাশালী ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করে সাহিত্যকর্মে ব্রতী হন। আর এই ঐতিহ্য তার দেশ ও কালের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের গণ্ডিকে অতিক্রম করে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য ও ইংরেজি সাহিত্য এবং ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। লৌকিক রহস্যসাহিত্যের উৎস ইউরোপে। লালন ও পোষণ ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায়। আর কোনান ডয়েল এই সাহিত্যাকাশে দীপ্তনক্ষত্র। সুতরাং ওই ঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছাড়া শরদিন্দুবাবুর পক্ষে ভাল লৌকিক রহস্য সৃষ্টিকরা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। এ-কথা অলৌকিক রহস্য সম্পর্কেও খাটে। তবে এখানে এ-কথা বলা দরকার যে শরদিন্দুবাবু কখনও 'চন্দ্ররেণু' বৃত্তি (plagiarism) গ্রহণ করেননি। তিনি একটি ভাব (idea) নিয়েছেন। গল্পটি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব।

আর ভাব (idea) ধার নেওয়াটা এমন কিছু দোষের নয়। স্বয়ং শেক্সপীয়র এ কাজ করে গেছেন। কেবলমাত্র হিরাটি লুকিয়ে রাখার বিশেষ কৌশলটি ছাড়া 'সীমন্তহীরা' গল্পটির সঙ্গে The Six Napoleons-এর আর কোনও মিল নেই। এ প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কথা মনে পড়ে। হেমেন্দ্রকুমার কোনও বিদেশি গল্প গ্রহণ করলে তা সর্বদা গল্পের শেষে পাদটীকা সংযোজন করে উল্লেখ করতেন।

শরদিন্দুবাবুর রচিত লৌকিক রহস্যসাহিত্য সংখ্যায় প্রচুর। মোট সংখ্যা তেত্রিশ। তিনটি উপন্যাস, বাকি ত্রিশটি ছোট ও বড় গল্প বা উপন্যাসিকা (যেমন 'দুর্গরহস্য')। 'লোহার বিস্কুট' (১৯৬৯) ও অসমাপ্ত 'বিশুপাল বধ' (১৯৭০) লেখকের তিরোধানের পর 'ব্যোমকেশ অমনিবাসে'র দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৭১) সংকলিত। 'ব্যোমকেশের কাণ্ডকারখানা'র প্রথম সংগ্রহ 'ব্যোমকেশের ডায়েরী' (১৩৪০)। ওই বৎসরই প্রকাশিত হয় 'ব্যোমকেশের কাহিনী'। তারপর 'ব্যোমকেশের গল্প' (১৩৪৪)। বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানে বেরোয় 'দুর্গরহস্য' (১৩৫৯)। 'দুর্গরহস্য'-এর উৎসর্গপত্রটি কৌতূহলোদ্দীপক:

> আধুনিক কালের যে সকল তরুণ-তরুণীর নির্বন্ধে সতেরো বছর পরে আবার ব্যোমকেশের গল্প লিখলাম বইখানি তাদের হাতে উৎসর্গ করা হল।

কৌতূহলের কারণ সতেরো বছরের হিসাবটা ঠিক হয় যদি উৎসর্গপত্রটি তৃতীয় প্রকাশে (১৩৭১) সংযোজিত হয়ে থাকে। 'ব্যোমকেশ সমগ্র' (মে, ১৯৯৫) গ্রন্থের 'ব্যোমকেশের কথা' অংশ পড়ে ঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। অতঃপর প্রায় নিয়মিত ভাবে ব্যোমকেশের গল্প বেরতে থাকে। লৌকিক — অলৌকিক-রহস্যকাহিনীর সঙ্গে প্রায় সমানভাবে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন তিনি। এই ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ বনফুল। বনফুল অবশ্য লৌকিক রহস্য কাহিনী লেখেননি।[৭]

প্রত্যেক শিল্পেরই নিজস্ব কিছু কিছু প্রকরণ থাকে। প্রত্যেক কর্মিককেই সেই প্রকরণ আয়ত্ত করতে হয়। লৌকিক রহস্য কাহিনীর রচয়িতাকেও ওই প্রকরণসমূহ আয়ত্ত করে এবং কিছু কিছু সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে — কাজ করতে হয়। সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গে পরে আসব আগে প্রকরণের কথাটা আলোচনা করা যেতে পারে। সাধারণ গল্প উপন্যাসে কাহিনীর গতিকে সব সময়েই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও কাহিনীর সংঘাত হতে পারে। লেখকের জীবনদর্শন, সমাজচিন্তা, রাজনৈতিকভাবনা কাহিনীর পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। অর্থাৎ কাহিনীর আরম্ভ মধ্য এবং শেষ তাদের নিজস্ব পরম্পরায় আসে। লৌকিক রহস্যকাহিনীর ক্ষেত্রে লেখককে কাহিনীর শুরু ও শেষ, মুড়ো ও ল্যাজা, আরম্ভ ও সমাপ্তি সবই এক সঙ্গে ভেবে নিতে হয়। অর্থাৎ কাহিনীর শুরুতে যদি হত্যাকাণ্ড বর্ণিত হয়ে থাকে তো শেষকালে সেটিকে হত্যাকাণ্ড বলেই প্রমাণ করতে হয়, আত্মহত্যা বলে নয়। (এই হত্যা সচেতন হতেও পারে আবার নাও পারে, এ প্রসঙ্গে পাঠকের কোনান ডয়েলের 'The Silver Blaze' গল্পটির কথা মনে পড়ে।) যে সমস্যাটি প্রথম অধ্যায়ে উপস্থিত শেষের অধ্যায়ে সেই সমস্যার সমাধান করতে হয়। আর সেই সমাধানের বিশ্বাসযোগ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য সমাধানের সূত্র বা হদিশ দেওয়া থাকে কাহিনীর মাঝ অংশে। (মনে করুন The Silver Blaze গল্পের ভেড়ার হঠাৎ অসুস্থতার এবং রাত্রিবেলায় কুকুরটির চিৎকার না করার ব্যাপারটা।) এই হদিশগুলি এলোমেলোভাবে ছড়ানো থাকে। অনেক তথ্যের মধ্যে পড়ে পাঠক (এবং গোয়েন্দার সহকারী) বিভ্রান্ত হয়। এই সমস্ত তথ্যের মধ্যে red-herring গুলি বাদ দিয়ে গোয়েন্দা ঠিক সূত্রগুলি বেছে নিয়ে সমস্ত ঘটনাটি মনে মনে পুনর্গঠন করে সমস্যার সমাধন করে। গোয়েন্দা বা লৌকিক রহস্যকাহিনী অনেকটা দু' একটা টুকরো লুকিয়ে রাখা বা হারিয়ে যাওয়া Jigsaw puzzle। অন্য টুকরোগুলিকে সাজিয়ে সাজিয়ে ছবিটি সম্পূর্ণ করা। আর গোয়েন্দা বা হুনুর তাঁর আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতার সাহায্যে সব কিছু ঠিক ঠিক করতে পারেন। আর এইখানেই গোয়েন্দা বা হুনুরের সহকারীর প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা।

ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলার দরকার। লৌকিক রহস্যকাহিনীতে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক স্তরে বুদ্ধির দ্বন্দ্ব চলে। একটি প্রকাশ্য, অন্যটি অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল গোয়েন্দার সঙ্গে অপরাধীর। আর অপ্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেখকের সঙ্গে পাঠকের। প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে গোয়েন্দার জিত এবং অপরাধীর হার পাঠকের মনে গোয়েন্দার সম্পর্কে সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জাগায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার অপ্রকাশ্য দ্বন্দ্বে লেখকের কাছে বারবার পরাজিত হয়েও পাঠক হীনমন্যতা বা আত্মগ্লানিতে ভোগে না। তার বারবার বোকা বনেও বিরক্তি বা বিরাগ হয় না। সে বলে না, 'ধুত্তোর আর এই বই পড়ব না।' পাঠকের মনে মানসিক eqilibrium বজায় রাখতে সহকারীর চরিত্র। পাঠকের মনে হয় যে অকুস্থলে থেকে এবং গোয়েন্দার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর সহকারী যদি আসল ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে থাকে তবে তার পক্ষে না বুঝতে পারাটা মোটেই বোকামি হয়নি। সবটা না হলেও অনেকাংশেই পাঠকের সান্ত্বনার জন্য গোয়েন্দার সহকারী চরিত্রের সংযোজন। এই জন্যই ওয়াটসন, হেস্টিংস, অজিত ইত্যাদির সৃষ্টি। অবশ্য এঁদের অন্য একটি ভূমিকাও আছে। এরা সকলেই বসওয়েল। এই প্রথা থেকে সরে এলেন রেক্স স্টাউট। তাঁর গোয়েন্দা নিরো উল্‌ফের (Nero Walfe), সহকারী আর্চি গুডউইন (Archie Goodwin) নিজেই সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। কাহিনীগুলিতে

আর্চির ভূমিকা অনেক বেশি প্রত্যক্ষও প্রগাঢ়। আর্চি নিরো উল্‌ফের আরেক সত্তা যেন।

লৌকিক রহস্যকাহিনীর সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে আসি। জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যার বহুরকম না হলেও একাধিক ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব। ধরা যাক এক রাত্রে বাড়ির পোষা কুকুর ডাকল না। কুকুরের না ডাকার কারণ কী? এর একাধিক কারণ হতে পারে। কিন্তু কোনও একটি বিশেষ গল্পের পরিসরে এই ঘটনাটি গোয়েন্দা যেভাবে ব্যাখ্যা করেন সেইভাবেই গ্রহণ করতে হয় পাঠককে। পাঠক কোনও প্রশ্ন করতে পারেন না। এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতাকে তুলে ধরে একটি সুন্দর লৌকিক রহস্যকাহিনী লিখেছেন লিও ব্রুস (Leo Bruce) বইটির নাম 'এ কেস ফর থ্রি ডিটেকটিভস' (A Case for Three Detectives)। উপন্যাসটি ভারি চমৎকার। তিন ডিটেকটিভের (একজন হোমসের, একজন পোয়ারো (Porot) আর একজন লর্ড পিটার উইমজির (Lord Peter Wimsey) আদলে গড়া) আর একজন বেঁটে মোটা প্রায়নির্বোধ অত্যন্ত সাধারণ পুলিশ অফিসারের গল্প। (ভবিষ্যতে বইটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল। ডিটেকটিভ গল্পের ইতিহাসে বইটি অভিনব।)

লৌকিক রহস্য বা গোয়েন্দা কাহিনীর প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এই ধরনের লেখকের দুটি বিষয়ে বিশেষ অধিকার থাকা প্রয়োজন। প্রথম, নানা বিষয়ে জ্ঞান, বিশেষ করে মনস্তত্ত্বে এবং খুঁটিনাটি (details) সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা। যাকে বলতে পারি বাস্তববোধ। মার্ডার অর্থাৎ খুন যদি রাগের মাথায় না হয় তো তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকে। এই মানসিক প্রস্তুতিকে কাজে রূপান্তরিত করবার ক্ষমতা সকলের থাকে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে — অর্থাৎ বিশেষ মানসিক অবস্থায় — কোনও কোনও লোক কাজটা করে ফেলতে পারে আর অনেকেই পারে না। যে পারে তার মনস্তাত্ত্বিক গঠন অন্য সকলের থেকে আলাদা। লেখককে অনেক চরিত্রের মধ্যে বিশেষ ওই চরিত্রটিকে কৌশলে বিশ্বাসযোগ্যভাবে গড়ে তুলতে হয়। কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় একজন খুন পর্যন্ত করতে পারে তাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। এইখানেই লেখকের কৃতিত্ব। শরদিন্দুবাবুর 'শজারুর কাঁটা' উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে। চরিত্রগুলি শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত যুবক। সকলেই প্রায় একই অবস্থার তথাপি দেবাশিসের আর প্রবালের মধ্যে তফাত আছে। একজন শিক্ষিত, সহৃদয় আর অন্যজন শিক্ষিত কিন্তু হৃদয়হীন। তার হৃদয়হীনতাই তাকে খুনি করে তুলেছে। প্রবালের psychology গল্পটির প্রাথমিক দুর্বলতা সত্ত্বেও — শজারুর কাঁটা অত সহজে মানবদেহে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না — গল্পটি সুখপাঠ্য। বইটি পড়েই আমার মনে হয়েছিল যে শরদিন্দুবাবু blowpipe ব্যবহার করলে ভাল করতেন। শরদিন্দুবাবুর চরিত্রগুলি সবই হয় নাগরিক না হয় মফস্বলের বাঙালি বা বিহারি। অর্থাৎ যে-সমাজ বা সামাজিক মনস্তত্ত্বকে তিনি ভালভাবে জানতেন তার বাইরে তিনি কখনও যাননি। আর এই কারণে তিনি কখনও থ্রিলার রচনা করেননি। 'লালপাঞ্জা' থ্রিলার নয়।

শরদিন্দুবাবু অনেক লৌকিক রহস্যকাহিনী লিখেছেন। আমাকে যদি তাঁর রচনা থেকে তিনটি গল্প এবং যে কোনও একটি উপন্যাসকে বেছে নিতে বলা হয় তো আমার পছন্দ হল 'চোরাবালি,' 'চিত্রচোর', আর 'অচিনপাখি' এই তিনটি গল্প আর 'চিড়িয়াখানা' উপন্যাস।

আগেই বলেছি যে লৌকিক রহস্যকাহিনীর একটা সাধারণ নকশা বা ছক থাকে। সেটা এই রকম। একটা অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে। গোয়েন্দা বা হুনুর তদন্ত করতে আসে। কাহিনীর বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেখক এলোমেলো কিছু সূত্র ছড়িয়ে দেন। এই সূত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় এবং ভুল তথ্য (red herring) থাকে। সাধারণ পাঠক এবং গোয়েন্দার সহকারী ভুল তথ্য থেকে ঠিকগুলিকে আলাদা করে নিতে পারে না। গোয়েন্দা তাঁর উৎকৃষ্ট পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তি, চুলচেরা বিচারবুদ্ধি অপরাধ-মনস্তত্ত্বে সম্যকজ্ঞানের দ্বারা সঠিক সূত্রগুলিকে ঠিক মতো বেছে নিয়ে সেইগুলিকে কার্যকারণ পরম্পরায় সাজিয়ে রহস্যের উন্মোচন করেন। শরদিন্দুবাবুর 'চিড়িয়াখানা' উপন্যাসটির কাহিনী সুপরিচিত। সুতরাং কাহিনীর সার সংক্ষেপ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং কয়েকটি সূত্রের আকারে আমার বক্তব্য পেশ করি। পটভূমি হিসাবে জানা দরকার নিশানাথ সেন ব্যোমকেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ব্যোমকেশ অজিত ও রমেন মল্লিককে নিয়ে গোলাপ কলোনি পরিদর্শনে যায়। তার অল্পদিন পরেই নিশানাথ খুন হন। বিভিন্ন সূত্রগুলি এই ভাবে ছড়ানো:

ক. নিশানাথ সেন ভাঙা মোটর টুকরো পেতেন কেন?

খ. নিশানাথের সঙ্গে সুনয়নীর সম্পর্ক কী?

গ. নিশানাথ blackmail শব্দের প্রতিশব্দ জানতে চাইলেন কেন? পরে তিনি অনুসন্ধান বন্ধ করতে বললেন কেন?

ঘ. নিশানাথবাবুর খুন হওয়ার সঙ্গে ব্যোমকেশের গোলাপ কলোনি পরিদর্শনের সম্পর্ক কী?

ঙ. বনলক্ষ্মী, মুকুল ও বিজয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিশানাথের হত্যার সঙ্গে কতটা সম্পৃক্ত?

চ. গোলাপ কলোনির টাকা পয়সার হিসাবে মস্ত গোলমাল। মুশকিল মিয়ার কথায় লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়। পিঁপড়েটি কে?

ছ. নেপালবাবু নিশানাথের কোনও গোপন কথা জানতেন কি?

জ. দময়ন্তীর কোনও অতীত ইতিহাস ছিল কি?

ঝ. ব্লাড প্রেসারের রুগি নিশানাথ মোজা পরে শুতেন কেন?

ঞ. পানুগোপাল কী বলতে চেয়েছিল?

ট. ব্রজদাস পালাল কেন?

এই সূত্রগুলিকে গল্পের মধ্যে ছড়ানো আছে। প্রধান প্রশ্ন দুটি। নিশানাথবাবুর ব্ল্যাকমেলারই খুনি? কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে তা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যোমকেশের পরিদর্শনের অব্যবহিত পরেই নিশানাথ নিহত হলেন। তবে কি ব্ল্যাকমেলার আন্দাজ করেছিল নিশানাথ ব্যোমকেশের সাহায্যে তাকে শনাক্ত করেছিল। ব্ল্যাকমেলার গাড়ির টুকরো পাঠাত কেন? এইসব জটিল প্রশ্নের মধ্যে রমেন মল্লিকের ভূমিকা চোখের আড়ালে চলে যায়। পাঠক কদাপি অনুমান করতে পারেন না যে রমেন মল্লিকের উপস্থিতিই নিশানাথের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। উপন্যাসটিতে ঘটনার ঘনঘটা নেই। মানুষের আদিমতম দুই প্রবৃত্তি — লোভ এবং রিরংসা কাহিনীর মূল (pivot)। নিশানাথ হত্যা এবং তৎপরে পানুগোপালের মৃত্যু ঘটনাকে পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। তবে এই দুই হত্যার বীজই খুনির ব্যক্তিত্বের মধ্যে উপ্ত। কাহিনীটি পাঠককে বিভ্রান্ত করে বনলক্ষ্মী, দময়ন্তী, মুকুল ও অজানা সুনয়নীকে কেন্দ্র করে। গল্পটির শুরু হলেও শেষ cherchez la femme-এ হয় নি।

'চোরাবালি' গল্পে কাহিনীর পটভূমিতে চোরাবালি ডয়েলের দি হাউন্ড অফ্ বাস্কারভিলের জলাভূমির কথা মনে করায়। শব্দভেদী বাণের ধারণাটি (idea) ভারি সুপ্রযুক্ত। গল্পটির মূল প্রশ্ন মাস্টারমশাই চশমা ফেলে রেখে গেলেন কেন? মূল সূত্র অপরাধী হরবোলা। দুটোর মধ্যে যোগাযোগ ধরা পড়ে ব্যোমকেশ দেখিয়ে দেবার পরে। 'চিত্রচোর' গল্পটিতে অল্প কয়েকটি চরিত্র। চরিত্রগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ বিকর্ষণের টানাপোড়েনে আলোকচিত্র চুরি যাওয়ার মূলসূত্রটিতে চোখ পড়ে না পাঠকের। (গল্পটির একমাত্র দুর্বলতা গল্পের নামটি। একথা শরদিন্দুবাবুর অনেক কাহিনীর সম্বন্ধেই খাটে) 'অচিন পাখি' অসামান্য গল্প। যে কোনও প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দা কাহিনীর সংকলনে স্থান পাবার উপযুক্ত। পুলিশি পাঠ্যপুস্তকে বলে যে খুনি সামান্য ভুলের খেসারত দেয় ধরা পড়ে। এ যেন গ্রিক পৌরাণিক চরিত্র একিলিসের গোড়ালি বা লখিন্দরের লৌহবাসরে একটি কেশ-পরিধি ছিদ্র। নীলমণিবাবুর ভুল 'হাসি' নামটি উচ্চারণ করা। গল্পটি গল্পের মধ্যে গল্প। মূল ঘটনাটি অনেক দিনের পুরনো। অপরাধীর দুটি ভুল: এক, আত্মম্ভরিতা আর দুই, অনবধানতা। 'বহ্নি পতঙ্গ' ছবিতে মুখের সাদৃশ্য হোমসের অনুমানের (দি হাউন্ড অফ বাস্কারভিল) কথা মনে পড়ালেও কাহিনীটি সুখপাঠ্য। পুলিশ অফিসারকে ধীর স্থির খুনী করা অভিনব। 'মাকড়সার রস,' 'পথের কাঁটা,' 'আদিম রিপু,' 'দুষ্টচক্র' ইত্যাদি কাহিনী শুধু সুখপাঠ্যই নয় সুগঠিত লৌকিক রহস্যকাহিনী।

লৌকিক রহস্যকাহিনীতে বৈচিত্র্য ফোটানোর সুযোগ কম। আমাদের দেশে আরও কম। খুনের মোটিভ (motive) হয় লোভ নয় রিরংসা। অনেক কাহিনী রচনা করলে স্বাভাবিকভাবে পুনরাবৃত্তি থাকবেই। শরদিন্দুবাবুর রচনাতেও আছে। ছেড়ে ছেড়ে পড়লে নজরে পড়ে না। তবে এ সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে বাংলাসাহিত্যে তাঁর আগে ও পরে ডিটেকটিভ বা লৌকিক রহস্যকাহিনী রচনার কৌশল তাঁর যতটা অধিগত ছিল এমন আর কারও ছিল না বা নেই। লৌকিক রহস্য কাহিনীর ছকটা তিনি খুব ভাল বুঝতেন। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর প্রায় সব গল্পই বাঙালি জীবনে প্রোথিত। ব্যোমকেশ বক্সী আদ্যন্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি। পাঠক হয়ত ব্যোমকেশের মধ্যে কিছুটা নিজের ইচ্ছার প্রতিবিম্বন দেখে তৃপ্ত হয়। আর এই কারণেই তিনি ব্যোমকেশকে স্ত্রী পুত্র নিয়ে নিটোল সামাজিক মানুষ করেছেন। এ বিষয়ে Michael Innes-এর Appleby-এর কথা মনে পড়ে যায় সঙ্গতভাবেই। ব্যোমকেশের বিবাহ সম্বন্ধে সুকুমার সেনের মন্তব্য স্মর্তব্য।[1]

৩. অলৌকিক রহস্য:

সাহিত্যে অলৌকিকের প্রসার ও বিস্তার বহুদূর বিস্তৃত। এর একটা কারণ মানবমনের গভীরে নিহিত। আদিযুগে প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে মানুষ অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিকের প্রভাব লক্ষ করেছে। সভ্যতার ও জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আজ-কাল-পরশুর অতিচেনা জগতের বাইরে একটি স্বতন্ত্র রহস্যময় জগতের অস্তিত্ব কল্পনা করেছে সুদূরের ও অচেনার পরিচয়অন্বেষী মানুষের মন। এই অন্বেষণ একদিকে প্রতিফলিত হয়েছে বিজ্ঞানের সাধনায়, অভিযাত্রীদের অদম্য প্রচেষ্টায়, অন্য দিকে কবিতায়, নাটকে, গল্পে-উপন্যাসে। বাংলাসাহিত্যে, বিশেষ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অলৌকিকের সন্ধান পাচ্ছি উনবিংশ শতাব্দী থেকে। প্রথম যেসব কাহিনী পাওয়া যায় সেগুলি সব ঘটনার বিবরণ। উল্লেখযোগ্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা কার্তিকেয় চন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনে এই রকম একটি অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন তাঁর পৌত্র দিব্যেন্দুসুন্দর চট্টোপাধ্যায়। রাজনারায়ণ বসু একটি ঘটনার সত্যতাকে স্বীকার করেছেন। অনেক কিছুর মতোই অলৌকিক সাহিত্যের রোমাঞ্চক ধারার ভাল কাহিনী প্রথম রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং অলৌকিক সাহিত্যের উৎকল্পনা বা উদ্ভট কল্পনার ধারার প্রবর্তন করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। (সুকুমার রায়ের রচনা

প্রধানত শিশু ও কিশোরদের জন্য।) রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে অলৌকিক রহস্যরসের বড় যোগানদার দু'জন। দু'জনই শতবর্ষে পা রেখেছেন: বনফুল ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের দু'জনের রচনায় বিচিত্রতা আছে, আছে সুখপাঠ্যতা। বনফুলের অলৌকিক রহস্যসাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করেছি। শরদিন্দুবাবুর অলৌকিক ও অতিলৌকিক গল্পের আলোচনাও করেছি। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা লিখি।

যাকে আমি লৌকিক রহস্যকাহিনী বলেছি তার সঙ্গে অলৌকিক রহস্যকাহিনীর বয়নে খুব পরিষ্কার সুনির্দিষ্ট পার্থক্য আছে। লৌকিককাহিনীতে লেখক সমস্ত তথ্যই যথাসম্ভব ব্যক্ত করেন। কিন্তু তথ্যগুলি এমন এলোমেলো ভাবে ইতস্তত ছড়ানো থাকে যে সহসা পাঠকের নজরে পড়ে না। অলৌকিক রহস্যকাহিনীর অনেকটাই অব্যক্ত, অস্ফুট, অস্বচ্ছ থেকে যায়। সহজ করে বলতে গেলে অলৌকিক কাহিনীর আর্ট বা শিল্পকৌশল কলাবউয়ের মতো। তার সৌন্দর্য ওই ঘোমটায়। কলাবউয়ের ঘোমটার আবরণ সরাতে চাওয়াটা যেমন অযৌক্তিক তেমনই অশোভন। অলৌকিককাহিনীর বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা চাওয়াটা অরসিকের পরিচয়। লৌকিক রহস্যকাহিনী যেন ঘরের নতুন বউটি যার ঘোমটা তুলে দেখায় কোনও দোষ নেই। বউটিকে খুঁচিয়ে দেখে তার সম্বন্ধে মন্তব্য করা যায়। তার হাবভাব চালচলনের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অলৌকিক কাহিনীর প্রাণভোমরা হল The benefit of the doubt অর্থাৎ পাঠকের মনে হতে পারে ব্যাপারটি হলেও হতে পারে। বিশেষ করে কোনও এক নাটকের এক নায়কের এই উক্তি তার মনে পড়তে পারে: হে বন্ধু দর্শনে যত কিছু কথা বলা হয়েছে তার অতিরিক্ত অনেক কিছু দ্যুলোকে ভূলোকে ছড়িয়ে আছে। এই 'হলেও হতে পারে' ধারণার সন্দেহ পাঠক মনে জাগিয়ে তুলতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুড়ি নেই। এই প্রসঙ্গে 'কালো মোরগ' গল্পটি type হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

গোকুলবাবু লজিকের অধ্যাপক। তিনি আচারেবিচারে অত্যন্ত বুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠ। তাঁর একমাত্র শখ শিকার। তিনি মোটেই ভাবপ্রবণ নন; স্নায়বিক দুর্বলতাও তাঁর নেই। এক শীতের অপরাহ্নে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে একটি সংকীর্ণ বনভূমি। গোকুলবাবুর পরিচিত জায়গা। প্রায়ই পাখি শিকার করতে তিনি এখানে আসেন। সুতরাং নিরুদ্বেগে তিনি শিকারের খোঁজ করতে লাগলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও শিকারের দেখা মিলল না। কিছুটা বিশ্রাম নেবার জন্য তিনি এক জায়গায় দাঁড়ালেন। তারপর আবার এগোতে যাবেন এমন সময় তাঁর মনে হল কে যেন তাঁর জামা ধরে টানল। পরিচিত হলেও নির্জন বনভূমিতে এই ধরনের অভিজ্ঞতা হলে সাধারণলোকের ভয় হয়। গোকুলবাবুর কিঞ্চিৎ চিত্তবিক্ষেপ হল। তিনি পিছন পানে তাকিয়ে দেখলেন কাঁটালতার ঝাড়ে কাপড় আটকেছে। গোকুলবাবু শান্তচিত্তে এগিয়ে চললেন। শিকারপ্রবৃত্তি তখন তাঁর মন জুড়ে রয়েছে। হঠাৎ তাঁর সামনে পড়ল একটা বিরাট গাছ আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল যে এই গাছেরই পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক ফেরারি খুনিকে তিনি পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। বহুদিন পরে আসামি আবদুল্লার কথা তাঁর মনে পড়ল। সে কথা হয়ত তার অবচেতনে প্রচ্ছন্ন রয়ে গেল। তিনি ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে পাখির খোঁজ করতে লাগলেন। শেষকালে যখন হতাশ হয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন তখন হঠাৎ নজরে পড়ল এক গাছের ওপরে বড় একটা কালো মোরগ। গোকুলবাবু মোরগটির দিকে এগিয়ে চললেন। তিনি কাছাকাছি এলেই মোরগটি সরে সরে যেতে লাগল। এদিকে বেলা পড়ে এসেছে। মাঠের ওপর বনের মধ্যে কুয়াশা ক্রমেই ঘনতর হয়ে উঠছে। সময় ও পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অনবহিত হয়ে গোকুলবাবু মোরগটিকে ধাওয়া করে চলেছেন। শেষকালে মোরগটি একটা কবরের ওপরে বসল। কবরের পাশেই ফণীমনসার ঝোপ। অব্যর্থ টিপ করার জন্য গোকুলবাবু এগিয়ে চললেন। হঠাৎ একটা সর সর শব্দ গোকুলবাবুর কানে এল। তিনি সেই দিকে তাকালেন। ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে আসছে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। মনে পড়ল ধরা পড়বার পর ওই রকম প্রতিহিংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে আবদুল্লা তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য গোকুলবাবু গুলি ছুঁড়লেন। কিন্তু কিছুই হল না। গোকুলবাবুর মনে পড়ল আবদুল্লার ফাঁসি হয়ে গেছে। গল্পের শেষ লাইন দুটি চমৎকার—

> "গোকুলবাবুর হৃৎপিণ্ডটা একবার উন্মত্তভাবে লাফাইয়া উঠিল। তাঁহার যুক্তিনিষ্ঠ মনে শেষবারের মতো চিন্তার ছাপ পড়িল—মানে হয় না।"

গল্পটি বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যাবে গোকুলবাবুর বিভ্রান্তি কেন হয়েছিল। ঘটনাগুলিকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে—জামায় টানলাগা—সেই বিশেষ গাছটি দেখা—আবদুল্লাকাহিনী স্মরণ—শীতের কুয়াশা ছড়ানো সন্ধ্যা—কবরখানা—এবং মোরগটির রঙে আবদুল্লার লুঙ্গির রঙের সাদৃশ্য। এইভাবে ঘটনাটিকে স্নায়বিক উত্তেজনা (কেন না গোকুলবাবু তখন শিকারের নেশায় উত্তেজিত) ও অবচেতন মনের কারসাজি বলে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু মনের মধ্যে একটা অস্ফুট প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। সবই কি অবচেতনের ও চেতনার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া? না কি আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের বাইরে আরও অন্য ধরনের জগৎ আছে যেখানে এ রকম ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। পাঠকমনে এই যে ঘটলে-ঘটতে-পারে সন্দেহ এতেই অলৌকিককাহিনীর শিল্পসিদ্ধি।

এই ধরনের বহু শিল্পসিদ্ধ অলৌকিককাহিনী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'দেখা হবে', 'নীলকর', 'দেহান্তর', 'বহুরূপী' ইত্যাদি। প্রচলিত গল্পকে নতুনভাবে লিখেছেন 'কামিনী'। ভূতের গল্পে স্নিগ্ধরস সঞ্চার করেছেন 'ছোট কর্তা'। এই গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লক্ষ্মী' গল্পটির কথা মনে পড়ায়।

অলৌকিক রহস্যকাহিনী রচনার ক্ষেত্রে শরদিন্দুবাবুর একটি বিশেষ কৃতিত্ব হল একটি বিশেষ চরিত্রকে বারবার নায়ক-কথক রূপে হাজির করা। বরদা আসর জমাতে পারে, ভাল কথক। বন্ধুরা তার গল্পগুলির সম্বন্ধে শুরুতে আস্থাবান না হলেও শেষকালে কেমন থ মেরে যায়। ওই যে benefit of the doubt-এর কথা আগে বলেছি এই বোধ তাদের মনে কাজ করে। কোনও তুলনা চলে না তবে বরদা অ্যালগারনন ব্ল্যাকউডের (Algernon Blackwood) ড. জন সাইলেন্সকে (Dr. John Silence) মনে পড়ায়। বরদার গল্প শেষ হয় এই ভাবে—

> বরদা তখন কতকটা নিজ মনেই বলিল, "যদি তাই হয় তা হলে প্রমথর আত্মাটা কি হলো? কোথায় গেল সে?" অকস্মাৎ আকাশে একটা দীর্ঘ আর্ত কর্কশ চিৎকার ধ্বনি হইল। আমরা চমকিয়া ঊর্দ্ধে চাহিলাম, দেখিলাম বাদুড়ের মতো একটা পাখি চাঁদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে—কালো ত্রিকোণ পাখা মেলিয়া ক্রমে পাখিটা দূরে চলিয়া গেল।
>
> কন্টকিত দেহে আমরা চাহিয়া রহিলাম।

কাহিনী যে রকম হোক না কেন তার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে পাঠযোগ্যতার উপরে। কথক গল্প বলেন লেখক লেখেন। কথকের গল্প শ্রোতা শোনে। পাঠক গল্প পড়ে। কথকের বলার ঢং ভাল না হলে শ্রোতা অমনোযোগী হবে। লেখকের ভাষা আকর্ষক না হলে পাঠক পড়তে অনাগ্রহী হবে। লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় সম্পদ তাঁর ভাষা। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মন্তব্য দিয়েই শেষ করি—

> কাহিনীকে ভাসিয়ে তাঁর ভাষা যেন তর্ তর্ করে বয়ে গেছে সমাপ্তির সাগরসঙ্গমে। সে ভাষা সাধু না চলিত বলা মুশকিল.....শরদিন্দুবাবুর স্টাইল তাঁর নিজেরই—স্বচ্ছ, পরিমিত, অনায়াস সুন্দর।[১০] □

সূত্রনির্দেশ:

১. উপচ্ছায়া: সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন।
২. ক্রাইমকাহিনীর কালক্রান্তি: সুকুমার সেন।
৩. লৌকিক রহস্যকাহিনীকে প্রথম জনপ্রিয় করে তোলেন কোনান ডয়েল। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে দি স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন (The Strand Magazine)-এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। সিডনি প্যাজেটের (Sydney Paget) আঁকা ছবিসহ শার্লক হোমসের কাণ্ডকারখানার কাহিনী নিয়মিত এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত।
৪. 'The Blanched Soldier' দ্রষ্টব্য।
৫. 'মাকড়সার রস'।
৬. The Crooked Man' দ্রষ্টব্য।
৭. 'পথের কাঁটা' দ্রষ্টব্য
৮. বনফুল দৌহিত্রী শ্রীমতী তিস্তা মুখোপাধ্যায় 'হরগোপালের মৃত্যু রহস্য' (তন্বী) গল্পটির কথা মনে করিয়েছেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।
৯. 'ব্যোমকেশ সমগ্র'র 'ব্যোমকেশ উপন্যাস' অংশ দ্রষ্টব্য।
১০. পূর্বোক্ত।

ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ নিয়মিত প্রকাশ করার আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। এই কারণে চতুরঙ্গের পাঠক-গ্রাহক এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমরা মার্জনা প্রার্থী। এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশ বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কতখানি কষ্টসাধ্য আশা করি সে-কথা তাঁরা বুঝবেন। ডাকখরচার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে এরপর গ্রাহক চাঁদাও কিছুটা না বাড়িয়ে উপায় থাকছে না। এখন থেকে প্রতিটি সংখ্যার মূল্যের সঙ্গে বাড়তি ডাকখরচ যোগ করে গ্রাহক চাঁদা গৃহীত হবে। সেই হিসাবে ৪টি, ৮টি বা ১২টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা হবে যথাক্রমে ৭২ টাকা, ১৪৪ টাকা এবং ২১৬ টাকা। যাঁদের গ্রাহক চাঁদার মেয়াদ ফুরিয়েছে তাঁদের নতুন হারে চাঁদা পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রবন্ধ

তুঙ্গভদ্রার তীরে—'গোধূলিসন্ধির নৃত্য'

বিজিতকুমার দত্ত

পড়ে অথবা না পড়ে দ্বিধাহীনচিত্তে পাঠক এবং না-পাঠক বলে দেবেন বঙ্কিমচন্দ্র এখনও উপন্যাসের আদর্শ, তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারেননি। সামাজিক, ঐতিহ্যাশ্রিক গল্প উপন্যাসে তিনি এখনও অপ্রতিদ্বন্দী—এ রকম মন্তব্যে আমরা অভ্যস্ত। বলা বাহুল্য এসব কথায় কেউ কান না দিতেও পারেন, কেউ কেউ অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। তাঁর মৃত্যুর পর একশো বছর পেরিয়ে গিয়ে উত্তর-আধুনিক চিন্তাভাবনার সরণিতে এসে এখনও বঙ্কিমচন্দ্রকে এভাবে স্মরণ করাকে কেউ কেউ অজ্ঞতার পরিচয়ও ভাবতে পারেন।

প্রচলিত মতে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্স রচয়িতা। রোমান্স সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কথা বলেছেন। নতুন করে কিছু বলা যায় হয়ত, কিন্তু আপাতত সে বিষয়ে কিছু বলতে চাইছি না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে রোমান্সকে দেখেছেন তা উনিশ শতকের মাহিত্যপাঠ থেকেই গ্রহণ করেছেন। এক কথায়, তিনি কল্পনাপ্রবণতার সাধারণ বিকাশকেই রোমান্স বলে ধরে নিয়েছিলেন।

এই কল্পনাপ্রবণতা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিচারে বড় মূল্য পাবে, সন্দেহ নেই, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে এরও শেকড়বাকড় আছে এবং তা না জানলে ওই কল্পনাকে রূপকথা বলেই মনে হতে পারে। রূপকথাও সাহিত্য, এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসে সে ঢুকেও পড়ে কিন্তু ছেলে-ভুলানো মনোভাব নিয়ে সে প্রবেশ করে না। বঙ্কিমের কল্পনাপ্রবণতা কখনও চরিত্রের আকৃতিকে মেনে নিয়ে ধীরে ধীরে মহত্ত্বের চূড়া ছুঁয়ে যেতে চায়, কখনও বিষয়ের সামান্যতাকে ঘিরে দ্বিতীয় আর একটি জগৎ রচনা করে যা আমাদের চৈতন্যকে স্পর্শ করে। প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, জীবানন্দ, সত্যানন্দ, সীতারাম, রাজসিংহ আমাদের সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্য দিকে সম্ন্যাসী বিদ্রোহ অথবা ফকির বিদ্রোহ বঙ্কিমের কল্পনায় নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে সে নতুন জগতের দিকে ইঙ্গিত করে। ক্ষুদ্র রানাও তখন আওরঙ্গজেবের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দী রূপে ভারতের ঐক্যবিধাতা, ধর্মের শাস্তা।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের শতবর্ষ পরে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় আগ্রহ বোধ করেন। এবং এই শতকের সত্তরের দশকেও তাঁর সে আগ্রহ সক্রীয় ছিল। শরদিন্দুর ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেন বঙ্কিমি কেতা আবার ফিরে এল। রূপ, রঙ নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হয়েছিল, কল্পনাও একটা ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল (শ্রী-র সিংহবাহিনী রূপ কি আর দেখা যাবে?) কিন্তু শরদিন্দুর সামনে বঙ্কিমচন্দ্র রয়েছেন সেটা তাঁর উপন্যাস পড়লেই বোঝা যায়। বর্ণনা বিবৃতিতেও বঙ্কিমচন্দ্র শরদিন্দুর হাত চেপে ধরেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন মূলত সাহিত্যপ্রেরণা থেকে, কিন্তু তাঁর চিত্তের বেদনা হর্ষ উদ্গাসকে তিনি স্পষ্টত প্রায় ঘোষণা করেছেন তাঁর রচনায়। মৃণালিনীতে তিনি বাংলার দুর্দশার জন্য দায়ী করেছেন ষড়যন্ত্রকে যা কতকটা পলাশীর প্রান্তরের মতোই। ক্রী লিখেছিলেন গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম এবং তার কথিত অনুশীলন ধর্মের ফল দেখানোর জন্য। রাজসিংহে তিনি অনুশীলন ধর্মের আদর্শকে যেন গিয়েছিলেন রাজসিংহের মধ্যে। রাজসিংহের চরিত্রে শ্রীকৃষ্ণের ছায়া আছে।

শরদিন্দু 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' উপন্যাসে বলেছেন 'রাজা জয়চাঁদ তাঁহার কন্যা সংযুক্তার স্বয়ংবর সভায় পৃথ্বীরাজকে অপদস্থ করবার ফন্দি এঁটেছিলেন। আরও বলেছেন, সে সময়ের রাজাদের এই রকম নষ্টবুদ্ধি ছিল। তারপরে শেষ অনুচ্ছেদে এসে তিনি

বললেন 'যে লঘুচিত্ততা অপরিণামদর্শিতা স্বজাতিদ্রোহিতা ও আত্মকলহের ফলে ভারতের সংস্কৃতি নয়শত বৎসরের জন্য অস্তমিত হইয়াছিল তাহারই চিত্র আমাদের কাহিনীর পটভূমিকা।' ভারতের অবস্থা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বলেন বাহুবল প্রতিষ্ঠাই আমার উদ্দেশ্য (রাজসিংহ) তখন শরদিন্দুর কথাগুলি আবার বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'কালের মন্দিরা' উপন্যাসেও ভারতবর্ষ যে সব-জাতির মানুষের মিলন কেন্দ্র রূপে একদা প্রতিভাত হয়েছিল তার গল্পই শরদিন্দু লিখেছেন। একটু স্পষ্ট করে বলেছেন 'যাহারা মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি চিরস্থায়ী করিতে চাহে তাহারা ইতিহাসের অমোঘ ধর্ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে, তাহারা শুধু বিচারবিমূঢ় নয়—মিথ্যাচারী।' 'গৌড়মল্লার' উপন্যাসে শরদিন্দু হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতি, মাৎস্যন্যায় ইত্যাদির কথা বলেছেন। বাংলার গৌরবের ও অগৌরবের কথা ঐতিহাসিকদের মতো করে বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তার যে উক্তিটি আমাদের মুগ্ধ করে তা হল 'এই সময়ে বাঙালীর চরিত্র সংস্কৃতি গ্রাম্য জীবন নাগরিক জীবন কিরূপ ছিল তাহা, অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।' অবশ্যই তা পটভূমিকা রূপে। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' আলোচনায় যাবার আগে শরদিন্দুর উপন্যাসের সংরূপ (genre) কীরকম মোড় নেয় তা বলার জন্যই ওই উদ্ধৃতিটির প্রয়োজন আছে। সে কথা পরে বলছি। এমন ঔপন্যাসিকের কাছ থেকেই আমরা 'কুমারসম্ভবের কবি'র মতো ঐতিহাসিক উপন্যাস পেতে পারি। সেকালের কিছু তথ্য আর কালিদাসের কিছু রচনার সাক্ষ্যকে অবলম্বন করে শরদিন্দু প্রায় অসাধ্যসাধন করেছেন ওই উপন্যাস। শরদিন্দুর উপন্যাসের 'ভূমিকা' থেকে বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ মোটামুটিভাবে তিনি মেনেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শকে উনিশ এবং বিশ শতকের প্রায় সকল ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকই মানা করেছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বিষয়ে সাফল্যের চিহ্ন খুবই কম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে ডিঙিয়ে যাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঐতিহাসিক উপন্যাসের চেষ্টারাটা কিছুটা পালটে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'বেনের মেয়ে' বঙ্কিমি আদর্শ থেকে সরে এসেছিল। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালির যে কাহিনীচিত্র তিনি তাঁর উপন্যাসে তুলে এনেছেন তার অনেকটাই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন 'সাহিত্যিক' উপাদান থেকে। কোনও বড় আদর্শের কথা হরপ্রসাদ চিন্তা করেননি। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালির সমাজ ইতিহাসের পরিচয় দিতে তাঁর উপন্যাসে। রূপা রাজা, লুইপাদ, বেনের মেয়ে প্রভৃতি চরিত্র এঁকেছিলেন। সেকালের বাণিজ্যাত্রার মনোরম চিত্র অঙ্কন করেছেন। বৌদ্ধ-হিন্দু ধর্মের সংঘাত এবং এই দুই ধর্মের স্বরূপ এই উপন্যাসে আমরা পাই। বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাস এই উপন্যাসে লভ্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের উপন্যাস সে সময়ে কতটা খ্যাতি পেয়েছিল জানি না, কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই এই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের গতানুগতিকতা ভেঙে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষের সরল জটিল রূপই মুখ্য স্থান নিয়েছে 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে।

শরদিন্দু যখন ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন তখন ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়েছে। রাখালদাস ছিলেন ঐতিহাসিক। এই কারণেই উপন্যাসে তিনি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে যত্ন নিয়েছিলেন। ফলে কল্পনা তাঁর উপন্যাসে প্রায় নির্বাসিত। উপন্যাসের শিল্পরূপ বঞ্চিত তাঁর রচনাগুলি। শরদিন্দু বোধকরি এই সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সেজন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে যেমন গুরু বলে মানা করেছেন তেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিনব উপন্যাসের ধারাটিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। হরপ্রসাদ রূপা রাজার দবদবার কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি 'দবদবার' কাহিনীকে বিস্তৃত করেননি। তাঁর উপন্যাস রাজকাহিনী নয়।

তা ছাড়া পাঠকের রুচিও তখন পালটে গেছে কিছুটা। অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী' সত্ত্বেও রাজরাজড়ার কাহিনী শোনার আগ্রহ অনেকটাই কমে গেছে। রাজসিংহের কাহিনী আর ক'জনকে উদ্দীপ্ত করে? সাধারণ মানুষ বাংলা উপন্যাসে জায়গা করে নিয়েছে। ছোটগল্প এবং উপন্যাসে নিম্নকোটির মানুষেরা ভিড় করতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বড় মাপের চরিত্র অন্তর্হিত, পরিবর্তে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 'বাঙালি' (ভীমচন্দ্র মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি) চরিত্র। ঐতিহাসিক উপন্যাসেও এই 'বাঙালি' চরিত্রের প্রত্যাশা জেগেছে। কিন্তু অতীত যদি সুদূর হয়? সময় যদি কালের ব্যবধানে অনেকটাই ধূসর থাকে? তখন সাক্ষীগোপালকে আশ্রয় করা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। রাজারা এসেই পড়েন। আর তাঁরা আসেন ইন্দ্রের ঐরাবতের মতোই। জাঁকজমক, যুদ্ধবিগ্রহ, বীরত্ব, ঐশ্বর্যও সেই সঙ্গে উঠে আসে। মাঝে মাঝে আমরা পাই মানিকলালকে—এই পর্যন্ত। শরদিন্দু এই টানাপোড়েনে ছিলেন। যে অতীতকে তিনি স্পর্শ করতে চাইছেন তা বেশ খানিকটা দূরের। আমরা যে উপন্যাসের আলোচনা করতে চাইছি তারও ঘটনাকাল অনেকটাই দূরের। বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হরিহর ও বুক্ক। তারপরে কয়েকজন সম্রাটের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় দেবরায় বিজয়নগরের অধিপতি হন। চতুর্দশ শতাব্দের প্রথমার্ধের সময় সেটা। তখন বিজয়নগর রাজ্য মোটামুটি সুরক্ষিত এবং শান্তিতে ছিল। শরদিন্দু এই দ্বিতীয় দেবরায়ের কাহিনী উপন্যাসে উপস্থাপনা করেছেন। দেবরায়ের কাহিনী বটে কিন্তু শরদিন্দুর উপন্যাসে সাধারণ মানুষও উপেক্ষিত হয়নি। বরং উপন্যাসে জনতার কোলাহল কিঞ্চিৎ

বেশি। সেজন্যই বোধকরি শরদিন্দুকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যগা পথ অবলম্বন করতে হয়েছিল। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রীতির 'চল'কে তিনি সমন্বয় করতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। কিন্তু তার আগে বিজয়নগরের উত্থান এবং তার ভৌগোলিক পরিবেশের সামান্য পরিচয় নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

সঙ্গম বংশের হরিহর ও বুক্ক প্রভাবশালী ভূস্বামী, ছোট একটি অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। তারা উত্তর ভারতের মুসলমান সম্রাট আহমেদ শা'র অভিযানের সময় বন্দি হন। দক্ষিণাত্যের এই দুই বীরকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। এদের দু'জনকে পরে দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হরিহর ও বুক্ক ফিরে এলে কিছু দিনের মধ্যে তাদের আবার হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা হয়। এ কাজ দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ্য শাসন প্রবল ছিল। বিদ্যারণ্য নামে এক ব্রাহ্মণ এই কাজটি সমাধা করেন। তাঁর অনুমোদন পেয়ে হরিহর ও বুক্ক বিজয়নগর নামে দাক্ষিণাত্যে নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

বিজয়নগরের আগে দাক্ষিণাত্যে ছোট ছোট কতকগুলি রাজ্য ছিল। সেগুলিকে বিজয়নগরের অন্তর্গত করেন হরিহর ও বুক্ক। এই বংশেরই রাজা দ্বিতীয় দেবরায়। দ্বিতীয় দেবরায়ের আরও ভাই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দেবরায়ের কম্পনদেব নামে কোনও ভাই ছিল কি না রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই। শরদিন্দুর উপন্যাসে কম্পনদেব মুখ্য চরিত্র না হলেও তাঁর কাহিনী অনেকটাই স্থান পেয়েছে। বহুবিবাহ, সহমরণ প্রথায় বিজয়নগরে ধর্মীয় অনুমোদন ছিল। অতএব দেবরায়ের তিন স্ত্রী ও পরে উড়িষ্যার রাজা ভানুদেবের কন্যা বিদ্যুন্মালার 'চতুর্থী' হবার দিক থেকে কোনও বাধা ছিল না। এমনকী বিদ্যুন্মালার সহচরী মণিকঙ্কণারও দেবরায়ের স্ত্রী হতে বাধা নেই। শরদিন্দুর উপন্যাসে বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার কাহিনী রাগবিরাগের পটভূমিতে ধীরে ধীরে বিকশিত। এ দুটি অবশ্যই অনৈতিহাসিক চরিত্র। বিদ্যুন্মালার সহযাত্রী উড়িষ্যার ত্রিপিটক এবং মন্দোদরীর কল্পনাও শরদিন্দুর নিজস্ব। দেবরায় উড়িষ্যার রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন কি না জানা নেই। তবে পরবর্তী বিজয়নগরের সম্রাট উড়িষ্যা পর্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন এই সংবাদ পাই। সুতরাং শরদিন্দুর এই কাহিনীতে বর্ণিত উড়িষ্যা-রাজার পরাজয় এবং বাধ্য হয়ে কন্যাপ্রদান সম্ভাব্য ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে। পুরুষোত্তমের 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্যগ্রন্থে এক সময়ে কাঞ্চীরাজকন্যাকে উড়িষ্যার রাজার কাছে বিবাহ দিতে বাধ্য করার কাহিনী আছে। এখানে বিষয়টি বিপরীত। এই কাহিনী পরিকল্পনায় শরদিন্দুর প্রতিভার পরিচয় পাই। রাজরাজড়ার কাহিনীতে শরদিন্দু উড়িষ্যা থেকে বিজয়নগর পর্যন্ত নৌকাযাত্রায় গার্হস্থ্যজীবনের তিক্ত মধুর রেখাসম্পাত করেছেন।

দ্বিতীয় দেবরায়ের কাহিনীর অনুপুঙ্খ বিবরণ ইতিহাসে নেই। শরদিন্দু এই রাজার কাহিনী নির্মাণ করেছেন ইতিহাসের আধারেই। তাঁর উড়িষ্যাবিজয়ের কাহিনী উপন্যাসে নেই। কিন্তু তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন, পরাজিত উড়িষ্যারাজ ভানুদেব 'দেবরায়ের হস্তে নিজ কন্যাকে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে' সম্মত হলেন। আরও একটি শর্ত ছিল 'কন্যাকে বিজয়নগর পাঠাইতে হইবে, সেখানে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।' এই শর্তের সূত্রে শরদিন্দু বিজয়নগররাজের-রাজ্যশাসন প্রণালীর সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন 'তৎকালে নিজ রাজ্য ছাড়িয়া বহু দূরে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। চারিদিকে শত্রু ওত পাতিয়া আছে, সিংহাসন শূন্য দেখিলেই ঝাঁপাইয়া পড়িবে।' ঘরের শত্রু তো আছেই। বিজয়নগর রাজ্যের উত্তরে বহমনি রাজ্য। বহমনি রাজ্যের সুলতান মাঝে মাঝেই বিজয়নগরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিজয়নগররাজকে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হত। তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণার সঙ্গমস্থলে রায়চুর দোয়াব ছিল অত্যন্ত উর্বর। বিশেষ করে খনিজ সম্পদের জন্যও প্রত্যেক সম্রাটেরই এর উপর নজর ছিল। বিজয়নগররাজকে সদাসর্বদা এর জন্য তীক্ষ্ম নজরদারি করতে হত। তা ছাড়া হায়সালা রাজের পতনের পরও বিজয়নগরকে দাক্ষিণাত্যের ছোট ছোট রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হত। ঘরের শত্রু বলতে দ্বিতীয় দেবরায়ের ভ্রাতারা। ইতিহাসে এ সম্বন্ধে ডিটেল কিছু না থাকলেও দ্বিতীয় দেবরায় যে অকর্মণ্য পিতা ও পিতৃব্যকে ডিঙিয়ে রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সে কথা ইতিহাসে আছে। সেই সূত্রে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কম্পনদেবের অবতারণা সম্ভব হয়েছে উপন্যাসের গল্পকথনে। অন্য ভ্রাতা বিজয়রায় সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত থাকতেন। কে জানে শরদিন্দুর এই কল্পনা দ্বিতীয় দেবরায়ের কূটকৌশলের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য কি না। দেবরায়ের পিতা বিজয়রায় রাজকার্যে মনোযোগী ছিলেন না বটে, 'প্রৌঢ় বয়সে রাজপ্রাসাদে বসিয়া তিনি দুষ্ট শিশুর ন্যায় বিচিত্র খেলা খেলিতেছেন'। দেবরায় অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন — উপন্যাসে পাই। তাঁর দাম্পত্য জীবন ছিমছাম। তিন পত্নী। এক পুত্র মল্লিকার্জুন। সকলকেই তিনি ভালবাসতেন। মধ্যম ভ্রাতা বিজয় রায়ের প্রতি তার প্রীতির কথা উচ্চারিত হয়েছে উপন্যাসে। শত্রু কেবল কনিষ্ঠ কম্পনদেব। দেবরায়ের নিরাপত্তার জন্য মন্ত্রী সর্বদা সতর্ক থাকতেন। দেবরায়ের মন্ত্রণাগৃহে মন্ত্রীর সর্বদাই যাতায়াত।

শরদিন্দু ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন আর একদিক থেকে। এই রাজার অন্তঃপুর এবং বহির্ভবনে নারীপ্রাধান্যের ব্যাপারটি প্রথমে খাপছাড়া বলে মনে হয়। বাঙালি ঐতিহাসিক উপন্যাসের পাঠক মোগল অন্তঃপুরের অথবা পাঠান অন্তঃপুরের প্রহরী

রূপে যোদ্ধাদের কথাই জানে। কিন্তু বিজয়নগরের সর্বত্রই যেন নারীনিয়ন্ত্রণে। রাজার প্রধান বিশ্বাসভাজন পিঙ্গলা রাজার পরিচারিকা, দেহরক্ষী, মন্ত্রণাদাতা। রাজপুরীকে পাহারা দিচ্ছে নারীবৃন্দ। গুপ্তপথ নারীদের জানা। উপন্যাসে শরদিন্দু যেন এক নারী আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে সেকালের এই বর্ণনা ঠিকঠাক কি না। কিন্তু শরদিন্দু ইতিহাস থেকেই পেয়েছিলেন এই বিষয়টি। আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্য উদ্ধার করি 'Women in general occupied a high position in society and instances of the active part they took in the political, social and literary life on the country are not rare. Besides, being trained in wrestling, handling swords and shields, music and other fine arts, some of them at any rate received a fair amount of literary education. Nuniz writes, 'He (the king of Vijaynagar) has also women who wrestle, and others who are astrolodgers and soothsayers, and he has women who write all the accounts of expenses that are incurred inside the gates, and others whose duty it is to write all the affairs of the kingdom and compare their books and those of the writers outside, he has women also for music, who play instruments and sing. Even the wives of the king are well versed in music.......It is said that he has judges, as well as bailiffs and watchmen who every night guard the palace, and these are women. (An advanced History of India, R.C. Majumdar, H.C. Raychowdhury, Kalikinkar Datta, 1953) আগেই বলেছি মোগল অন্তঃপুরের সদৃশ বিজয়নগরের অন্তঃপুর নয়। সেই অন্তঃপুরে জেবউন্নিসা, উদিপুরী, খোজা এবং রাজপুরীর ষড়যন্ত্রের নানা অলিগলির সাক্ষাৎ পাই। সেখানে দরিয়া মোবারক ঢুকে পড়ে। অথবা চঞ্চলকুমারীর সহচরীদের সঙ্গে হাস্যপরিহাস এবং ঘটনা ঘটে বটে কিন্তু তা যেন রোমান্টিক বর্ণনার বাতাবরণ, বঙ্কিমের কল্পনার উঁচু সুরে বাঁধা জীবন। শরদিন্দুর কল্পনায় প্রেমের অভিসার নেই এমন নয়, কিন্তু তার চাইতে প্রাধান্য নারীর — যেখানে পুরুষের মতোই স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা নারীর। শরদিন্দু নারী মিছিলকে বর্ণাঢ্য করে তুলেছেন। বিদ্যুন্মালা আর মণিকঙ্কণাকে নিয়ে পাল্কি অন্তঃপুরে ঢুকছে 'রাজপুরীর সাত শত প্রতিহারিণী ও পরিচারিকা সভাগৃহের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের বাম হস্তে চর্ম, দক্ষিণ হস্তে মুক্ততরবারি। সকলেই দৃঢ়াঙ্গী যুবতী, সুদর্শনা। তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক তাতারী যুবতী আছে, পিঙ্গল কেশ ও নীল চক্ষু দেখিয়া চেনা যায়। রাজপুরীতে, সভাগৃহ ব্যতীত অন্যত্র, পুরুষের নিষেধ, এই নারীবাহিনী পুরী রক্ষণ করে।' রাজার মন্ত্রী লক্ষ্মণমল্লপ উপস্থিত ছিলেন এখানে। ইনি বিজয়নগরে 'লক্কন' (লক্ষ্মণ) নামে পরিচিত। ইতিহাসে দেবরায়ের এই মন্ত্রীর উল্লেখ আছে। শরদিন্দু প্রায়ই দেবরায়ের কাছে টেনে এনেছেন। তিনি সুপুরি কাটতেন। কাটতে কাটতেই রাজার সঙ্গে শলাপরামর্শ করতেন। শরদিন্দু তার হাতে জাতি দিয়ে এবং সুপুরি কাটার চিত্র সংযোগ করে লক্ষ্মণের আটপৌরে দিকটি ফুটিয়েছেন। শিল্পীর এই সামান্য উদ্ভাবনে লক্ষ্মণ দূর থেকে কাছে চলে আসে। অতীত হৃদয় দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে ওঠে। পরিচারিকাদের প্রধান পিঙ্গলার দায়িত্ব অনেক বেশি। 'ইত্যবসরে রাজপুরী হইতে একটি শক্তসমর্থ দাসী স্বর্ণকলসে জল আনিয়া রাজকুমারীদের পায়ের কাছে ঢালিয়া দিয়াছিল। এই দাসী বিপুল রাজপুরীর গৃহিণী, সাত শত প্রহরিণীর প্রধানা নায়িকা, নাম পিঙ্গলা।'

ঐতিহাসিক উপন্যাসে মাঝে মাঝে খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখে অতীত সজীব হয়ে ওঠে। এই সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য এই উপন্যাসে সঞ্চারিত হয়েছে। অতীতের অস্পষ্টতা কেটে যায় অনেকটাই। সরে যায় এই বিবরণে: 'অতিথিরা অধিকাংশই আমিশাষী, বহুবিধ মৎস্য ও মাংসাদি (ইতিহাসে পাই বিজয়নগরের অধিবাসীরা গরু ছাড়া প্রায় সব জন্তু আর পাখির মাংস খেত) সহযোগে জবারের রোটিকা ও ঘৃতপক্ক তন্ডুল গ্রহণ করিলেন।' রসরাজের নিরামিষ আহার। খাদ্যবস্তু দধিমণ্ড ক্ষীর ফলমূল ও মিষ্টান্ন। অর্জুন বর্মা দেবরায়ের ডাকে রওনা দিয়ে দেখলেন কিছুদূর গিয়েই প্রহরিণীর এলাকা 'সোপান-মুখে শস্ত্রহস্তা দুইটি তরুণী প্রহরিণী দাঁড়াইয়া আছে। পুরুষ প্রহরীর অধিকার শেষ হইয়া এখান হইতে স্ত্রী-প্রহরীর এলাকা আরম্ভ হইয়াছে। প্রহরিণীদ্বয় অর্জুন বর্মাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিল, রক্ষীকে প্রশ্ন করিল, তারপর পথ ছাড়িয়া দিল।' কিছুটা দূরে আর একজন প্রহরিণী। দোতলায় গিয়েই অর্জুন দেখল দু'জন প্রহরিণী। তারা রাজার কাছে অর্জুনকে পৌঁছে দিল। পিঙ্গলা অর্জুনের সংবাদ দিল। সোনার তাম্বুলকরঙ্কে পান দিয়ে গেল। রাজা একটি পান নিয়ে বললেন 'তুমি পান নাও, আর্য লক্ষ্মণকেও দাও।' কেন যে শরদিন্দু পিঙ্গলাকে গৃহিণী বলছেন রাজার আচরণে তা বোঝা যায়। শরদিন্দু পিঙ্গলার পরিচর্যার বিবরণ যেমন দিয়েছেন, তেমনই সতর্কতার সঙ্গে রাজাকে ঘিরে ছিলেন পিঙ্গলা তারও দৃষ্টান্ত উপন্যাসে তুলে এনেছেন। আমরা তো দেবরায়ের তিন স্ত্রীর মধ্যে দুই স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাই। মধ্যম স্ত্রীর কিছু সংবাদ অন্যের মারফত পেয়েছি। প্রথম স্ত্রীর পুত্র মল্লিকার্জুনের উপস্থিতিতে স্নেহবৎসলা মাতা এবং স্নেহবৎসল পিতার পরিচয় পাই। দ্বিতীয় স্ত্রী অসূর্যম্পশ্যা। একটিও দাঁত

ছিল না তাঁর। তৃতীয় স্ত্রী কিঞ্চিৎ সরব এবং হাসিখুশি। এঁদের দেখা গেছে খুব কম। শরদিন্দু প্রায় উপেক্ষাই করেছেন। রাজা কোন দিন কার ঘরে রাত্রিযাপন করবেন, তা ঘোষণা করা হত ঘুমোতে যাবার কিছু আগে। কেননা রাজার রাত্রিকালীন অবস্থান কোথায় জানতে পারলে ঘরের শত্রু রাজার প্রাণ নিয়ে নিতে পারে। পিঙ্গলাই রানিদের জানিয়ে দিত রাজার সংবাদ। রাজার আহারের পরিচর্যা পিঙ্গলাই করত। পিঙ্গলার সঙ্গে রাজা রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে পরামর্শও করতেন। ইতিহাস নীরব হলেও শরদিন্দু তাঁর নিজের মতো করে রাজার পারিবারিক জীবনটিত্র ফুটিয়েছেন। অবশ্যই ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতাকে এখানে মানতে দ্বিধা নেই।

বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই অষ্টম শতাব্দী থেকে ভারতে দাক্ষিণাত্যের সমুদ্র উপকূলে আরবদেশীয় বণিকের আনাগোনা ছিল। ভারত থেকে হিরেজহরত, কাপড়, মসলাপাতি আরব বণিকেরা কিনে নিত। অন্যদিকে আরবদেশ প্রধানত সরবরাহ করত ঘোড়া, এই ঘোড়া রাজাদের যুদ্ধের অন্যতম যুদ্ধসম্ভার। আরব বণিকেরা অবশ্যই সমুদ্র উপকূলে এবং দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত বন্দরগুলিতে বসতি স্থাপন করছিল। ইসলাম ধর্মও সেইভাবে দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হতে থাকে। দাক্ষিণাত্যের রাজবৃন্দ ব্যবসার দিকে লক্ষ রেখে আরব বণিকদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখেই চলতেন। পরে পরে ইউরোপীয় পর্যটকরা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করতে এলেন। তাঁরা দেশে গিয়ে দাক্ষিণাত্যের ব্যবসার বাজারের সুযোগ-সুবিধার কথা বলেছিলেন নিশ্চয়ই। ইউরোপীয় বণিকেরা পরে (প্রথম দিকে পর্তুগাল) দাক্ষিণাত্যে আরবদের মাধ্যমে ব্যবসা না করে নিজেরাই নেমে পড়লেন বাণিজ্যে। এই সঙ্গে ধর্মপ্রচারও আরম্ভ হয়েছিল। বিজয়নগরের হিন্দু রাজারা অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন না বোধ করি। কিন্তু নিজের রাজ্যে বিরূপতাও করেননি। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচণ্ড প্রভাব ছিল সেখানে। শরদিন্দু তার উদাহরণ দিয়েছেন। পম্পাপতির মন্দিরের কথা তো বারবার উল্লিখিত হয়েছে। রসরাজ, রাজবৈদ্য দামোদরের কথা উল্লিখিত হয়েছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের গান উড়িষ্যা থেকে বিজয়নগরে পৌঁছে গেছে। অর্জুন বর্মার পিতা রাম বর্মা পুত্রকে বিজয়নগর রাজ্যে পালিয়ে যেতে বলেছেন। বহমনি রাজ্যের সম্রাটের হিন্দুবিদ্বেষের কথা বলা হয়েছে। বিজয়নগরই হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে পারে এই বোধ ঐতিহাসিক, শরদিন্দু তাকে পুরোমাত্রায় ব্যবহার করেছেন।

শরদিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এখানে মিল দেখি শরদিন্দুর। বিশ্বাসকে উপন্যাসে নানাভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করেছেন। বড় বড় ঘটনার উৎস জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বঙ্কিম-উপন্যাসে। এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই। সীতারামের কথা আমাদের মনে পড়বে। মবারক-দরিয়ার কথাও মনে পড়বে। শরদিন্দু দেখিয়েছেন বিজয়নগর রাজ্যের অশুভ ইঙ্গিত কীভাবে হরিহর এবং বুক্কর দেখা দেওয়ার মধ্য দিয়ে জানা যাচ্ছে। এটা অবশ্য জ্যোতিষগণনার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু তিথি নক্ষত্রের প্রভাব যে মানবজীবনে অমোঘ এ বিশ্বাস বিজয়নগরবাসীর মধ্যে দৃঢ়মূল ছিল। শুরু বুক্ক-র প্রেতাত্মায় বিশ্বাসকে দেশবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়েছিল। এরা দেখা দিলে কী বিপদ ঘটতে পারে দেশের? চতুর্ভুজ বলেছিল 'রাজ্যে যখন কোনও গুরুতর বিপদ উপস্থিত হয় তখন ওঁরা দেখা দেন।' উপন্যাসে পাই 'গুরুতর বিপদ! কী বিপদ! তুঙ্গভদ্রার পরপারে, মূর্তিমান বিপদ বৃভুক্ষু শার্দুলের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই বিপদ।' আমরা দেখি কম্পনদেবের দ্বারা দেবরায়ের হত্যাপ্রচেষ্টা সেই বিপদের ইঙ্গিত করেছিল। চতুর্ভুজ, অর্জুন বর্মা এবং বলরামের সংলাপে আর আশঙ্কার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে বিজয়নগর বহমনি রাজ্যের চিরবিবাদের প্রসঙ্গ। বামনদেবের অর্জুনবর্মা ও বলরামের করকোষ্ঠীর বিচারের দৃষ্টান্তটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। বামনদেবের চেহারার বর্ণনা নিখুঁত। বামনদেব 'বহিঃচত্বরে অজিনাসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি, স্কন্ধে উপবীত, মুণ্ডিত মুখে তীক্ষ্ণায়ত চক্ষু, মাথার চারিপাশ ক্ষৌরিত, মাঝখানে সমস্তটাই শিখা।' ষাঁটি ব্রাহ্মণের চেহারা। রমেশচন্দ্র, রমিলা থাপার (History of India–Vol I) সকলেই বলেছেন বিজয়নগর রাজ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই সচ্চরিত্রের। তাঁরা বিজয়নগরের সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন। ব্রাহ্মণদের আচার আচরণে, কঠোর সংযমে সকলেই তাঁদের অনুগত ছিল। শরদিন্দু সেকালের ব্রাহ্মণদের এই অপ্রতিহত প্রভাব দেখিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। মুসলমান অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ শরদিন্দু দেননি। তার উপন্যাসে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার গুরুত্বহীন নয়। কিন্তু সে গুরুত্ব সাধারণ মানুষের বিবরণে অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে। বলরামের কাহিনীর কথাই ধরা যাক। সে বঙ্গদেশীয়। জাতিতে কামার। এক সময়ে সুখে শান্তিতেই ছিল। বিবাহ করে জাতীয় কর্মে সে বেশ পয়সা করেছিল। সুখ শান্তি তার ঘরে বিরাজ করত। কিন্তু উত্তরাপথে মুসলমান অধিকার স্থাপনের পর মুসলমানরা হয় হিন্দু হত্যা করেছে, নয় ধর্মান্তরিত করেছে। বলরামের স্ত্রী-কে নিয়ে মুসলমানরা পালিয়েছে। বলরামও সেদিন বাংলা দেশ ছেড়ে উড়িষ্যায় চলে যায়। সেখানে তখন হিন্দু রাজা। আবার মুসলমানদের ভয়ে সাত আট বছরের হিন্দু মেয়েকেই বিবাহ দেওয়া হত এ কথাও শরদিন্দু উল্লেখ করেছেন। অর্জুন বর্মার কথা তো আগেই বলেছি। বিজয়নগরের উত্তরে বহমনি রাজ্যের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ আগেই বলেছি বিজয়নগর রাজ্যের রক্ষার জন্য মুসলমানদের সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত করতে রাজারা উৎসাহী ছিলেন। দিল্লির

পাঠানদের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের মুসলমানদের বৈরিতা ছিল। মোগল আমলে যেমন হিন্দুরা সম্রাটের চাকরি গ্রহণ করেছে এবং খাতির পেয়েছে, কখনও বাধ্য হয়ে কখনও আত্মরক্ষার তাগিদে রাজানুকূল্য যেমন হিন্দুরা করেছে, বিজয়নগরে তার বিপরীত রূপ আমরা দেখতে পাই কি? ধর্ম কেন্দ্রে ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু রাজশাসনে ধর্ম অপেক্ষা দেশরক্ষাই বড় ছিল। বলতে ভুলে গেছি, দেবরায় স্পষ্ট বলেছেন ধর্মযুদ্ধ বলে কিছু নেই, যুদ্ধের সময় শত্রু শত্রুই সে হিন্দু অথবা মুসলমান যাই হোক না কেন। শরদিন্দু সত্য গোপন করেননি। একালের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সেকালের মানসিকতাকে মেলাতে চেয়েছিলেন, এই মাত্র।

অন্যদিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঘনতা দেবার জন্য শরদিন্দু দাক্ষিণাত্যের বিবাহপ্রণালীর কিঞ্চিৎ বর্ণনা দিয়েছেন। এই যেমন, 'দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট আর্য জাতির মধ্যে— সম্ভবত দ্রাবিড় জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে— একটি বিশেষ সামাজিক নীতি প্রচলিত হইয়াছে; তাহা এই যে মাতুলের সহিত ভাগিনেয়ীর বিবাহ পরম স্পৃহনীয় ও বাঞ্ছিত বিবাহ। উত্তরাপথে যাঁহারা ওই বিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহারাও দাক্ষিণাত্যে গিয়া দেশাচার ও লোকাচার বরণ করিয়া লইতেন।' শরদিন্দু চিপিটক চরিত্রটি সৃষ্ট করেছিলেন হাস্যরস পরিবেশনের জন্য। চিপিটকের ইচ্ছে ছিল রাজার ঘরে এক ভগিনীর যখন বিবাহ হয়েছে তখন একদিন বোনাঁকে বিয়ে করে রাজজামাতা হবেন। উড়িষ্যা ইত্যাদি রাজ্যে এই বিবাহকে সুনজরে দেখত না, আবার মেনে নিতেও দ্বিধা করত না। হরি আল্লা ওরফে কৃষ্ণমূর্তি চিপিটক (যেহেতু সে ত্রিপিটক বিলোপের দায়িত্ব পেয়েছিল) প্রত্যাখ্যাত হল। কিন্তু আশা ছাড়ল না। সেও ভাগিনেয়ী বিদ্যুন্মালার সঙ্গী হয়েছিল।

বিজয়নগর রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বলেছি। আর একটু বলতে হবে। বিজয়নগরের উপকণ্ঠে ছোট ছোট পাহাড়ের অবস্থান ছিল। এই পাহাড়গুলি পাথরের। এই পাথরের পাহাড় রাজাকে কিছুটা নিরাপত্তা দিয়েছিল সন্দেহ নেই। আমরা দেখি অর্জুন বর্মা এবং বলরাম পাথরের গুহার গোলোকধাঁধা পেরিয়ে শত্রুসৈন্যের বিজয়নগর আক্রমণের সংবাদ পেয়েছিল। পাথরের গুহার রহস্য প্রায় ডিটেকটিভ উপাখ্যানের রহস্যজাল বিছিয়ে দিয়েছে। শরদিন্দুর 'ঝিন্দের বন্দী' উপন্যাসের কথা আমাদের মনে পড়বে। 'ঝিন্দের বন্দী'উপন্যাসে ঘোড়সওয়ার, তরবারিশেলা ইত্যাদির মধ্যেও আমরা ওই ক্ষুদ্ররাজ্যটি ঘিরে যে প্রকৃতি ও ভূগোল সীমারেখার মেপামেপি দেখি সেকথা পাঠকমাত্রকেই রোমাঞ্চিত করবে। বিশেষত বলরাম ও অর্জুন বর্মার দুঃসাহস, এক পা এক পা করে ধৃর্ত বিড়ালের মতো অগ্রসর হওয়া, অন্ধকারে আত্মগোপন, প্রয়োজনে বলরামের ক্ষুদ্র পিস্তল জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার গোয়েন্দাকাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পাথরের গুহাগুলি বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করা হত তা চিপিটক ও মন্দোদরীর, অর্জুন বর্মার ও বলরামের বাসস্থান থেকেই বুঝতে পারি। কমলাসাগর; পম্পাপতির মন্দিরের কথা বলা হয়েছে। রমিলা থাপার বলেছেন, বৃহৎ জলাশয় নির্মাণ করে রাজারা জলকষ্ট দূর করেছিলেন। মন্দিরনির্মাণ তো দাক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির একটি বড় অধ্যায়।

কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর এবং বহমনি রাজ্যের সীমান্তে বড় প্রহরী তার নদী সম্পদ। তুঙ্গা ও ভদ্রা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণা এই নদীগুলির মধ্যে কৃষ্ণানদী দুই রাজ্যকে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে নিশ্চয়ই। বাংলাকে আমরা বলি নদীমাতৃক দেশ। দাক্ষিণাত্যও অন্যদিক থেকে নদীমাতৃক দেশই। গঙ্গাস্নান আর তুঙ্গার জলপান দুই-ই পুণ্যার্জনের উপায়। শরদিন্দু তুঙ্গার জলকে বলেছেন পীযূষতুল্য, মৃতসঞ্জীবন। বলা বাহুল্য, ঔপন্যাসিকের কল্পনাকেও উত্তেজিত করেছে এই নদী। তুঙ্গা এবং ভদ্রা মিলে নদী বয়ে চলেছে তারপরে তুঙ্গভদ্রা এসে মিশেছে কৃষ্ণানদীতে। নদী এখানে খরস্রোতা, উত্তাল আর মুখর। তুঙ্গা এবং ভদ্রা দুই নদী একত্র হয়ে তুঙ্গভদ্রা নাম পেল। এবার তার যাত্রাপথ সমুদ্রের দিকে। বহুদূরের পথ। 'পথ জটিল ও শিলা-সঙ্কুল, সঙ্গীসাথী নাই। কদাচিৎ দুই একটি ক্ষীণা তটিনী আসিয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তুঙ্গভদ্রা তরঙ্গের মঞ্জীর বাজাইয়া দুর্গম পথে একাকিনী চলিয়াছে।' এ যেন দক্ষিণ ভারতের কোনও নৃত্যপটীয়সীর গোপন অভিসার। আবার শরদিন্দুর ভাষায় শোনা যাক 'অর্ধকেরও অধিক পথ অতিক্রম করিবার পর তুঙ্গভদ্রার সঙ্গিনী মিলিল। তথু সঙ্গিনী নয়, ভগিনী। কৃষ্ণা নদীও, সহ্যাদ্রির কন্যা, কিন্তু তাহার জন্মস্থান তুঙ্গভদ্রা হইতে অনেক উত্তরে। দুই বোন একই সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল; পথে দেখা। দুই বোন গলা জড়াজড়ি করিয়া একসঙ্গে চলিল।' এই বর্ণনাই যথার্থ সমাসোক্তি উদাহরণ। অচেতনে চেতনের আরোপ। শরদিন্দু উপন্যাসে যে গার্হস্থ্যরসের প্রচুর নিদর্শন পাই তার ভূমিকা উপন্যাসের প্রথমেই শুরু। দুই ভগিনীর গল্প, দুই সখীর গল্পকে বিছিয়ে দিয়েছেন শরদিন্দু তাঁর কাহিনীর বাতাবরণে।

নদী যখন আছে তখন নিশ্চয়ই নদীপথের বহিত্র, নৌকা, ঝড়, ঊর্মিমুখরতা থাকবে। উড়িষ্যারাজের নৌকার খুঁটিনাটি বর্ণনা (বই ঘর, ছোটো সোপান, নৌকার আকৃতি ইত্যাদির বর্ণনা), বিজয়নগরের বেতে বোনা চাঙারির উপরে চামড়া মোড়া নৌকার বিবরণ শরদিন্দু তুলে আনেন। 'লোকাল কালার' এই ভাবেই কাহিনীটিকে বাস্তব করে তোলে। বিজয়নগরের একেবারে কাছে এসে টর্নেডোর মতো যে ঝড় এল এবং তার ফলে কিছু যাত্রী ছিটকে নদীতে পড়ে গেল তার আশঙ্কিকতা দুরু দুরু বক্ষে পাঠক শুনতে পায়। শরদিন্দুর কল্পনা এখানে বাস্তবতার

সঙ্গে রোমান্টিকতার যুগ্মবেণী রচনা করেছে। প্রায় নির্জন দ্বীপে উৎক্ষিপ্ত দুটি মানুষের একরাত্রি বাস, তাদের সংলাপ, তাদের শ্রান্তি-ক্লান্তি এবং গোপন ভালবাসার উৎসার রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি উপন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আগে বলেছি মোগল অন্তঃপুর আর বিজয়নগরের অন্তঃপুর চরিত্রে একই জাতের নয়। কিন্তু কখনও কখনও মোগল অন্তঃপুরের খোজা প্রহরীর সতর্কতা এড়িয়ে যে অ্যাডভেঞ্চার সংঘটিত হত শরদিন্দুর উপন্যাসে তারও কিছু নিদর্শন আছে। অর্জুন বর্মার ও বিদ্যুন্মালার প্রেম কিছুটা বহির্ভবনে ঘটে গেছে। কিন্তু রাজঅন্তঃপুরে বারে বারে মিলনদৃশ্যের ইশারা ইঙ্গিতগুলি শরদিন্দু গোপন করেননি। বিশেষত শেষ প্রেমদৃশ্যে পিঙ্গলার আবিষ্কার ও রাজার গোচরে অর্জুন বর্মা ও বিদ্যুন্মালার গোপন মিলনদৃশ্যটি আনার কৌশলে শরদিন্দু অ্যাডভেঞ্চারমূলক উপন্যাসের বর্ণনারীতি আশ্রয় করেছেন। রাজার শাস্তি প্রদান যথোচিত। বিদ্যুন্মালার অর্জুনের প্রতি প্রেম নিবেদন এবং রাজার কাছে স্বীকৃতি আয়েষার 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'-এর মতো উচ্চকিতা কিন্তু বিদ্যুন্মালার স্বীকারোক্তি আয়েষার মতো উঁচুস্বরে বাঁধা নয়। শরদিন্দুর উপন্যাসের নম্র সুর খুব উচ্চগ্রামে ওঠে না, যুদ্ধের দুন্দুভিধ্বনি সত্ত্বেও। আসলে এই উপন্যাসের শিল্পরূপের অন্যতম আবেদন ভিন্ন একটি মাত্রায় সরে গেছে। সরে গেছে না বলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের তাৎপর্য যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই এই মাত্রাযোজনার প্রয়োজন সেইটি বিচার করা প্রয়োজন। শরদিন্দু দেবরায়ের চরিত্র বর্ণনা করবার সময় বলেছেন রাজা সবাইকে ভালবাসতেন, তবে সব চাইতে বেশি ভালবাসতেন বিজয়নগরকে। এই দেশপ্রীতি 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসে বিস্তৃত হয়েছে বর্ণনা, বিবরণ, সংলাপে। উপন্যাসটির কাঠামোও তৈরি হয়েছে সেইভাবে। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের নায়ক দেবরায় নন, যথার্থ নায়ক অর্জুন বর্মা। লুকাচ তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনায় বলেছিলেন ইতিহাসের জানা চরিত্রগুলি লেখকের কল্পনাকে উত্তেজিত করতে পারে কিন্তু এদের বিকাশকে লেখক নিজের মতো করে দেখাতে পারেন না। কিছু ফাঁকপূরণ করতে পারেন মাত্র। ঐতিহাসিক উপন্যাসটি কেবলমাত্র ফাঁকপূরণের জন্যই নয়, গল্পের মর্মকে অঙ্কুরিত বিকশিত করার জন্য কিছু অনৈতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রের সৃষ্টি করতে হয়। অর্জুন বর্মা সেই জাতীয় চরিত্র। দেবরায়ের বিজয়নগরের প্রতি ভালবাসার প্রসঙ্গটি অর্জুনের মধ্য দিয়েই উদ্ঘাটিত।

পিতার আদেশে অর্জুন বহমনি রাজ্য ছেড়েছিল। মুসলমানধর্মের প্রতি তার বিরূপতা স্বাভাবিক। মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করাও তার রক্তের মধ্যে আছে। তার কিছু কিছু বীরত্বের প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে শরদিন্দু দেখিয়েছেন। অর্জুনের সাঁতরে নদী পার হওয়ার মধ্যে অসম সাহসিকতা আছে। তার দুটি লাঠির সাহায্যে যত্রতত্র গমন সম্ভব। এবং প্রয়োজনে ওই লাঠি দুটির সাহায্যে সে ঘোড়ার থেকেও বেগে চলতে পারত। রাজদূতের চাইতে অর্জুন লাঠির সাহায্যে বিজয়রায়ের সংবাদ দেবরায়কে পৌঁছে দিতে পেরেছিল। রাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে সে সর্বদা প্রস্তুত ছিল। রাজ্য থেকে সে যখন বিতাড়িত হল তখন সে কোনও প্রতিবাদ করেনি। বিদ্যুন্মালার প্রতি তার গভীর প্রেম সত্ত্বেও সে রাজাদেশ পালনে দেশত্যাগী হল। অথচ রাজভ্রাতা যখন একে একে বারোজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা করল (এই হত্যাকাণ্ডেও ডিটেকটিভ উপন্যাসের উপাদান আছে) এবং পিতাকে মেরে যখন দেবরায়কে আঘাত করল তখন অর্জুন বর্মাই রাজাকে বাঁচিয়েছিল। দেশব্রতে ত্যাগকে মধ্যবিত্ত বাঙালি একদা বড় স্থান দিয়েছিল। এ আদর্শ কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। বিশ শতকের দশকগুলি ধরে এ আদর্শ গৌরবের শিখর স্পর্শ করেছিল। শরদিন্দু দেশব্রতের সেই আদর্শ তুলে আনলেন অর্জুন বর্মার চরিত্রে। বলরাম আর অর্জুন পাথরের গুহার মধ্য দিয়ে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল তখন মৃত্যুর শীতল স্পর্শ তারা পেয়েছিল। কিন্তু অর্জুন ভ্রূক্ষেপ করেনি, বলরামও না। বললামের কাছে অস্ত্র তার উদ্ভাবিত কামান, আর অর্জুনের কাছে ছিল লাঠি। সে সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে, নিজের মৃত্যু-পরোয়ানা হাতে করে দণ্ডদাতার কাছে ছুটে গিয়েছে দেশের স্বার্থে। শরদিন্দু দেখিয়েছেন শেষে তার লাঠিও ভেঙে গেছে। অর্জুন তখন নিজের বলে দেশনায়ক হয়ে উঠেছে। অর্জুন বর্মার সহচর রূপে বলরামের ত্যাগব্রতকেও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হবে।

শরদিন্দু বোম্বাই প্রবাসী বাঙালি। দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজ্যের প্রতি প্রীতিপক্ষপাত সেই সময়ে দেখা দিয়েছিল নিশ্চয়ই। বোম্বাই (মুম্বই) প্রবাসী হওয়ায় শরদিন্দুর পক্ষে বিজয়নগরকে কেন্দ্র করে যেসব কিংবদন্তি গড়ে উঠেছিল তা জানা সম্ভব হয়েছিল। কে জানে উপন্যাসের চরিত্র বলরামের মতো তাঁরও দ্বিতীয় জন্মভূমি দাক্ষিণাত্য ছিল কি না। তিনি স্বকপোলকল্পিত ইতিবৃত্ত নয়, ইতিহাসকেই গল্পের আকার দিয়েছেন। তুঙ্গ আর ভদ্রা, তুঙ্গভদ্রা ওই নদীগুলি এবং নদীতীরের কোলাহল, মানববসতি এবং মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা শরদিন্দুকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তা না হলে তিনি বলবেন কেন ওই নদীরই এক গণ্ডূষ জল পান করেছেন তিনি। পাঠককে ওই জলের তৃষ্ণাহর তৃপ্তির কথা বলেছেন শরদিন্দু 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' গ্রন্থে। রমিলা থাপার বিজয়নগরের সাংস্কৃতিক জাগরণকে হিন্দু পুনরুত্থানের পর্ব বলতে চাননি। সামন্ততান্ত্রিক বাতাবরণে উত্তরভারতে যেমন ভাবে সংস্কৃতিক জীবনের গঠন দেখা দিয়েছিল বিজয়নগর রাজ্যেও সেই প্যাটার্নের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সকল

ঐতিহাসিকই বিজয়নগরকে glorious kingdom বলেছেন। ব্যবসায় বাণিজ্যে, অভ্যন্তরীণ এবং বর্হির্বিশ্বের বাণিজ্যসম্পদে এই রাজ্য ছিল সমৃদ্ধ এবং ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। প্রাচুর্য এই রাজ্যের সর্বত্র। শরদিন্দু বাজার, লোকের আহার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা যতবার বলেছেন ততবারই প্রাচুর্যের স্রোতের দিকে লক্ষ রেখেছেন। শরদিন্দুর কাছে সোনার বাংলা আর সোনার বিজয়নগর (সেই সময়ের) সমার্থক। তিনি বলেছেন 'কোনও এক স্তব্ধ সন্ধ্যায় আকাশে সূর্য যখন অস্ত গিয়াছে কিন্তু নক্ষত্র পরিস্ফুট হয় নাই, সেই সন্ধিক্ষণে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থলে ত্রিকোণ ভূমির উপর দাঁড়াও। কান পাতিয়া শোনো। শুনিতে পাইবে তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার কানে কানে কথা বলিতেছে: নিজের অতীত সৌভাগ্যের দিনের গল্প বলিতেছে। কত নাম—হরিহর বুক্ক কুমার কম্পন দেবরাজ মল্লিকার্জুন—তোমার কানে আসিবে। কত জটিল রহস্য, কত বীরত্বের কাহিনী, কত কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রেম বিদ্বেষ, কৌতুক কৌতূহল, জন্মমৃত্যুর বৃত্তান্ত শুনিতে পাইবে। তুঙ্গভদ্রার এই উর্মিমর্মর ইতিহাস নয়, স্মৃতিকথা। কিন্তু ইতিহাসের পিছনেই স্মৃতিকথা লুকাইয়া আছে। যেখানে স্মৃতি নাই সেখানে ইতিহাস নাই।' ঠিকই বলেছেন লেখক। ইতিহাস তো কেবল একটা রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো নয়, তার অবয়বে মানুষের কোলাহল, চাঞ্চল্য, হৃৎস্পন্দন। এই স্মৃতিকে শরদিন্দু টেনে এনেছেন উপন্যাসে। আগেই বলেছি এই উপন্যাস অর্জুন বর্মার কাহিনী। সে কাহিনীতে বিদ্যুন্মালা রাজার চতুর্থী হতে চায়নি। সে রামচন্দ্রের সীতার মতো এক স্বামীকেই চায়। মণিকঙ্কণার বহুবিবাহে আপত্তি নাই। কিন্তু বিদ্যুন্মালার এই সঙ্কল্প কীভাবে অর্জুন বর্মার প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছিল সেই গল্পই শরদিন্দু রচনা করেছেন। শরদিন্দু 'রসোল্লাসে'র কথা বলেছেন। জয়দেবের কথা আগে বলেছি, তিনি একের পর এক গীত রচনা করেছেন। 'গীতগোবিন্দ' তাঁর উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে বিদ্যুন্মালা-অর্জুন, বলরাম-মঞ্জীরা, চিপিটক-মন্দোদরী, মণিকঙ্কণা-দেবরায় প্রেমের কাহিনীতে আর নারীর লাস্য, তার দেহবিভঙ্গে। এক এক সময় মনে হয় শরদিন্দু যেন প্রেমের কতকগুলি উপকাহিনী রচনা একসঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন। আর এ প্রেমের কাহিনীতে সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণের সূর্যাস্তের আকাশে বারবার রঙের পরিবর্তন। এই সব প্রেমকাহিনীতে অভিনবত্ব নেই, কিন্তু জীবলীলার এই স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিবরণ উপন্যাসটিতে সাধারণ-অসাধারণ প্রেমের কাহিনীর মাধুর্য বিস্তার করেছে। একেই শরদিন্দু উর্মিমর্মর বলেছেন। এই প্রেম উত্তাল নয়, মর্মর। এর পদসঞ্চারে অভিসারিকার গোপনতা আর দুঃসাহসিকতা। বিজয়নগরের কাছে এসে উড়িষ্যার বহিত্রগুলি পৌঁছলে বিদ্যুন্মালা আর মণিকঙ্কণা নৌকার ছাদে চলে এল। আর পশ্চিমাকাশে দেখতে পেল একটি অগ্নিপিণ্ড। 'আলোকপিণ্ডটি কখনও বাড়িতেছে কখনও কমিতেছে কখনও ঊর্ধ্বে শিখা নিক্ষেপ করিতেছে।' এই আলোর পিণ্ড-ই বিজয়নগরের সৌভাগ্যদীপ্ত। এই উপন্যাসে সেই দীপ্তি। আমরা বলেছি এই উপন্যাসে প্রেমকাহিনীতে অভিনবত্ব নেই। নিজেই এখন প্রতিবাদ করি। চিপিটক মন্দোদরী ঝড়ে এমনই জায়গায় নিক্ষিপ্ত হন যেখান থেকে রাজধানীতে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের পেয়ে পর্বতবাসীরা খুব খুশি হয়েছিল। মন্দোদরীকে তারা চিপিটকের স্ত্রী মনে করেছিল। চিপিটক প্রথমে মেনে নিতে পারেনি। নিজ বাসভূমের জন্য তার মন পড়ে আছে। মন্দোদরী কিন্তু খুশি। স্বামী পেয়েছে, পাহাড়ি মানুষগুলি রেঁধেবেড়ে খাওয়ায়। গ্রামের ভাষাও সে শিখেছে। 'আর কী চাই? গ্রামে তাহার মন বসিয়া গিয়াছে, সারা জীবন এই গ্রামে কাটাইতে পারিলে সে আর কিছু চায় না।' চিপিটক ছাগল চরায়। রাজশ্যালকের এই বৃত্তি সে ঘৃণার যোগ্য মনে করে। সে মন্দোদরীকে বলে যায় রোজ নদীর ধারে যেতে। যদি উড়িষ্যাগামী নৌকাগুলি সে দেখতে পায়। মন্দোদরী যায়, ফিরে আসে। একদিন সে দেখতে পেল নদীর বুকে তিনটি উড়িষ্যাগামী বহিত্র। চিনে ফেলল সে। নৌকা তিনটি যেন অচিনপাখি। কিন্তু মন্দোদরীর মধ্যে কবিত্ব নেই। কেবল 'মন্দোদরীর বুকের মধ্যে দুম দুম শব্দ হইতে লাগিল। সে ক্ষণকাল ব্যায়ত চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া মুখে আঁচল ঢাকা দিয়া আবার শুইয়া পড়িল। কী আপদ! নৌকাগুলি এতদিন বিজয়নগরেই ছিল। এতদিন ধরিয়া কী করিতেছিল। ভাগ্যে গ্রামের অন্য কেহ দেখিয়া ফেলে নাই। জয় দারুব্রহ্ম!' জল ভরতি কলসি নিয়ে সে গুহায় ফিরে এল। চিপিটক আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল স্বদেশের বহিত্রের দেখা মিলল কি না। মন্দোদরীর উত্তর 'কোথায় নৌকো। মিছিমিছি ভূতের বেগার।' চিপিটক 'আকাশের পানে' তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

শরদিন্দু প্রেমের কাহিনীকে পাঠকের বোধের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌঁছে দিলেন সহজ সরল ভঙ্গিতে। বিপরীতের মধ্যে মিলনসম্ভাবনাতে সার্থকতা ঘনিয়ে এল এই উপন্যাসে। বিজয়নগরের অভিভাবক দেবতা বিরূপাক্ষ আর উড়িষ্যার অভিভাবক দেবতা দারুব্রহ্মের সেতুবন্ধ রচিত হল যেন। □

'সত্যান্বেষী' শরদিন্দু

তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়

"শরদিন্দু high-brow (অভিজাত শ্রেণীর) লেখক নহেন—তিনি সর্বজনীন লেখক; তাই তাঁহার রচনা পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিচারে সকলকেই স্পর্শ করে। problem লইয়া তিনি কখনও মাথা ঘামান নাই—তাঁহার একমাত্র সমস্যা মানুষ—মনুষ্য প্রকৃতি। তাঁহার গল্পের মধ্যে মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্য যেরূপ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে মানুষগুলিও তেমনি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

উপরের উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে একটা ছোট পরিবর্তন করা হয়েছে। শরদিন্দু-র জায়গায় বসবে বিশ্ববরেণ্য গল্পকার ও-হেনরির নামটি। আসলে উপরিউক্ত মূল্যায়নটি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অন্যতম প্রিয় গল্পকার ও-হেনরি সম্বন্ধে একটা ছোট লেখায় উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে দেখা যাচ্ছে, কথাগুলো স্বয়ং শরদিন্দু সম্পর্কেও সুপ্রযুক্ত হতে পারে। সত্যি বলতে কি, তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়াল বাঙালি পাঠক এবং ঔন্নাসিক গবেষকের কাছে শরদিন্দু তেমন কোনও বহু আলোচিত লেখক নন। সে অর্থে তিনি নিশ্চয় 'high-brow' স্রষ্টা নন। তবে শরদিন্দু-অমনিবাসের নিয়মিত বিজ্ঞাপন ও ক্রমবর্ধমান সংস্করণসংখ্যা তাঁর সর্বজনীনতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের অবকাশ রাখে না। শতবর্ষ পরে বাতায়ন পাশে কোনও মনোযোগী পাঠিকার কোলে আপন সৃষ্টিকে আবিষ্কার করার আকাঙ্ক্ষা বোধহয় সব স্রষ্টাই মনের গহনে লালন করেন। শরদিন্দুও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। ১৯৫০-এর জন্মদিনে তাই লিখছেন:

"আজ জীবনের একান্নটা বছর পরিপূর্ণ হইল। ভাবিতেছি, আজ হইতে পঞ্চাশ বছর পরে আমার নাম কি কেহ স্মরণ করিয়া রাখিবে?...একান্ন বছর ধরিয়া যে কর্ম করিয়াছি যে চিন্তা করিয়াছি কালের তুলাদণ্ডে তাহার ওজন কতটুক?"

এমত সংশয়ের পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসী লেখকসত্তা একথাও ব্যক্ত করে ধিধাহীনভাবে—

"কিন্তু আমি যতই তুচ্ছ হই, আমার মধ্যে যে চিন্তার ক্রিয়া হইয়াছে, যে সৌন্দর্যের স্বপ্ন রূপায়িত হইয়াছে তাহা তুচ্ছ না হইতে পারে। বাঙালীর মনে সেই চিন্তা ও স্বপ্নের ছাপ নিশ্চয় পড়িয়াছে; কারণ বাঙালী আমার লেখা পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়তো সব কথা বুঝিয়া পড়ে না, তবু পড়ে।"

যথার্থই বাঙালি পাঠকের কাছে শরদিন্দু শতবর্ষ পরেও আদরণীয়। কিন্তু কী কারণে? অবশ্যই ব্যোমকেশ আর বরদার স্রষ্টা হিসাবে। আরও একটু রসিক কুতূহলী পাঠকের কাছে ঐতিহাসিক গল্প আর উপন্যাসের লেখক শরদিন্দু বরণীয়। এমনকী বাংলা ছোটগল্পের একশো বছর পূরণে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যপত্রিকায় বিদগ্ধ সমালোচকের লেখনীতে বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিক পরিচিতিতে শরদিন্দু কেবলই ডিটেকটিভ আর ঐতিহাসিক গল্পকার হিসাবেই আলোচিত হন। বস্তুত শরদিন্দু-সৃষ্টির সব কথা বোধহয় এখনও বোঝা হয়নি। তা না-হলে শতাব্দী শেষেও বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে শরদিন্দু মুখ্যত ডিটেকটিভ ও ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসাবেই বিধৃত। বড়জোর তাঁর ভূতের গল্প আর কয়েকটি অলৌকিক কিংবা হাসির গল্প সেসব আলোচনায় ছুঁয়ে যাওয়া হয়। গল্পকার শরদিন্দুকে তেমন করে আমরা ক'জন পাঠক জানি বা বুঝি! অথচ বৈচিত্রে ও গভীরতায় গল্পকার শরদিন্দু তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তাকে বোধহয় অনেকখানি অতিক্রম করে যান।

শরদিন্দু যখন সাহিত্যের জগতে এলেন, সময় তখন বড় জটিল। ১৯২৯-এ শরদিন্দুর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জাতিস্মর' প্রকাশিত হয়। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন ঢাকা-কলকাতার সাহিত্যানুরাগী সমাজ তখন আলোড়িত কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির তারুণ্যে। বাংলা ছোটগল্পের যে-ধ্রুবপদটি বেঁধে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শুরু হল তা থেকে স্বতন্ত্র হবার আপ্রাণ চেষ্টা। রবীন্দ্র-বিদ্রোহের ঝোঁকে তখন শরৎচন্দ্রই গুরুস্থানীয়। শরদিন্দুও স্বীকার করেন বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁর তৃতীয় গুরু শরৎচন্দ্র। মার্কসের আর্থ-সামাজিক তত্ত্বজ্ঞান, ফ্রয়েডের যৌনমনস্তত্ত্বের ব্যবচ্ছেদ, জীবনমন্থন করা বিশ্বসাহিত্যের ঢেউ তখন আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যকে কঠিন বাস্তবের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। লেখকগোষ্ঠীর কাছে তখন অনুসরণযোগ্য বোয়ার্স, হুইটম্যান, গোর্কি। ধর্ম-সমাজ-পারিবারিক সম্পর্কগুলোকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে পুরনোকে অবজ্ঞা করার প্রবণতা প্রকট। যদিও সামন্ততান্ত্রিক ঔপনিবেশিক পরিবেশে প্রগাঢ় ধারণার আমূল পরিবর্তন তখনই সম্ভব ছিল না, তবু নতুন ভাবনা, নতুন তত্ত্বের ঝাঁঝে সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের মনোভূমি উত্তাল। কল্লোলে প্রথম সারির গল্পকার শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, মণীন্দ্রলাল বসু প্রমুখ। আর প্রায়-সমকালেই একটু স্বাতন্ত্র্য রেখে এলেন তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এলেন আরও দুই মুখোপাধ্যায়—বলাইচাঁদ ও বিভূতিভূষণ। সত্যকারের রক্তমাংসের বেদনায়, শ্রেণীসংঘাত, আঞ্চলিকতার তত্ত্বভারে জর্জরিত ক্লান্ত পাঠকমন সে-সময় বোধহয় একটু নিরিবিলি রোমান্স আর শান্ত জীবনরসের ছায়ার আশ্রয় খুঁজছিল। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালে চতুর্থ বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দুর তখনই আবির্ভাব। স্রষ্টা মাত্রেই সত্যদ্রষ্টা। কিন্তু সে সত্য "অধিকতর সত্য"—কাব্যসত্য। একমাত্র এই তত্ত্বকথাটি স্মরণে রেখেই বাস্তবের কাঠিন্যকে নিয়েই সাহিত্যজগতে প্রবিষ্ট হলেন শরদিন্দু কিন্তু বাস্তবের মালিন্যকে চৌকাঠের বাইরে রেখে এলেন। তিনি যে এই গড্ডলিকায় গা ভাসাতে একান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন তা সমকালীন সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তাঁর নানা বিচ্ছিন্ন মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়। যদিও তারাশঙ্কর তাঁর 'অমিতাভ' গল্পটি পড়ে যে কেঁদেছিলেন তা চিঠিতে নিঃসঙ্কোচে জানান, বনফুলের শরদিন্দুর 'তুঙ্গভদ্রার তীরে" পাঠের মুগ্ধতা উচ্ছ্বসিতভাবে স্বীকার করেন, তখন বনফুল 'স্থাবর' লিখছেন। কিন্তু শরদিন্দু কুণ্ঠাহীনভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিহিত করেন "খাঁটি সাহিত্যিক নয়, 'Commercial artist' হিসাবে, বনফুলের সৃষ্টিপ্রেরণায় বিজ্ঞানবুদ্ধি মিশে এক জগাখিচুড়ি সৃষ্টি করেছে মনে করেন। বিভূতি এবং তারাশঙ্কর বিকৃত বৌদ্ধ দুঃখবাদকে বাংলাসাহিত্যে টানিয়া আনিয়াছে।" "বুদ্ধদেব বসু বিদেশীর মত বাংলা লেখেন।" অচিন্ত্য সেনগুপ্তের বস্তুজ্ঞান ও রসজ্ঞান থাকলেও—"উভয়কে সংযুক্ত করিয়া রসবস্তু সৃষ্টির শক্তি নাই।" প্রেমেন্দ্র মিত্র 'শক্তিমান লেখক' কিন্তু ধৈর্যের অভাবে "তাঁহার প্রতিভা থাকিয়াও নাই।" সতীর্থদের সম্বন্ধে যেমন তাঁর এজাতীয় স্পষ্ট অভিব্যক্তি, নিজের সম্পর্কেও তিনি সমান স্পষ্টবাদী। সে কারণে নিজের লেখকসত্তার মূলধর্মকে ব্যাখ্যা করে লেখেন:

"আমি সাহিত্যিক, কোনও ism-এর ধার ধারি না। Realism, Romanticism প্রভৃতি বাক্য আমার কাছে সমান নিরর্থক। আমি গল্প রচনা করে পাঠককে আনন্দ দিতে চাই, রসসৃষ্টি করাই আমার স্বধর্ম। .....গল্প লেখার ব্যাপদেশে Socialism, Marxism প্রভৃতি মতবাদ প্রচার করাও আমার কাজ নয়। আমি জীবনকে যতটুকু বুঝেছি, জীবন থেকে যতটুকু রস আহরণ করেছি সেইটুকুই আমার পাঠকদের পরিবেশন করেছি। .....মানুষের সমাজ, তার রাজনীতি, তার জ্ঞানবিজ্ঞান আমার কাছে মানুষের পরিবেশ মাত্র। মানুষের চেয়ে মানুষের পরিবেশকে আমি কোনও দিন বড় করে দেখতে পারিনি।"

এমনকী শরৎচন্দ্র তত্ত্বভারাক্রান্ত শেষ প্রশ্ন লিখেছিলেন বলে শরদিন্দু গুরুর প্রতি যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন। জীবনের শত দুঃখ ক্লেদাক্ত অভিজ্ঞতার মাঝেও মধ্যযুগের কবিকঙ্কন মুকুন্দের মতোই শরদিন্দু ছিলেন জীবনরসিক শিল্পী। সুতরাং প্রচলিত গণ্ডির মধ্যেই নিজেকে স্বতন্ত্র সীমায় অভিষিক্ত করার জন্য তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল ভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতকে বেছে নেওয়ার। বর্তমানের অভিজ্ঞতায় জারিত করে অতীত ইতিহাসকে উপস্থাপিত করার। অলৌকিক অতিপ্রাকৃতের কৌতূহলময় অদেখা জগতে আকর্ষণ করেছিলেন পাঠককে। আবার কখনও গোয়েন্দাগল্পের আধারে মানবমনের প্রচ্ছন্ন অবচেতনে অবগাহনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। জীবনঅভিজ্ঞতাকে সহনীয় উপভোগ্য করে তোলার জন্য হাস্যরসের পরিবেশন আবশ্যক মনে করেছিলেন। সেই সঙ্গে চলতিজীবনের পরিচিত অভিজ্ঞতাও কখনও ইতিহাস স্যাটায়ারে সিক্ত হয়ে, কখনও বা উপযুক্ত গাত্তীর্যসহই উপস্থাপিত হয়েছে। আসলে বহুবার দেখা, চেনা জগতকেই শরদিন্দু কেবল সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে ভিন্ন কৌণিক আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল করতে চেয়েছিলেন এবং ব্যর্থও হননি। গভীর সমাজবোধ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণী ক্ষমতা শরদিন্দুকে যে-কোনও বিষয়ের গল্পে সাফল্য এনে দিয়েছিল। এমনকী তাঁর রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যান কিংবা ঐতিহাসিক রোমান্সও সামাজিক ও পারিবারিকবোধ বহির্ভূত নয়।

উত্তরপ্রদেশে জাত, মুঙ্গেরের অধিবাসী শরদিন্দুর যৌবনের মূল্যবান দিনগুলো কাটে মধ্য কলকাতায়। পরে মুম্বাইপ্রবাসী এই লেখক মনুষ্যজীবনের অপার বৈচিত্রে মুগ্ধ হয়েছেন। নিরন্তর খুঁজে ফিরেছেন মানবজীবনের রহস্য। বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর্শস্থানীয়

করে যিনি লেখার জগতে এসেছিলেন, কমলাকান্তরূপী গুরুর এ জীবন লইয়া কী করিব এই মহৎ প্রশ্নটির তুল্য তাঁরও 'প্রিয়চরিত্র' ব্যোমকেশ উচ্চারণ করেছে "এ জীবনের রহস্য কিভাবে ভেদ করব?" নানা রসের, বহুবিধ শৈলীর গল্পে শরদিন্দু কেবল এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজেছেন।

সুতরাং শরদিন্দুর নানা স্বাদের যে বিপুল সংখ্যক ছোট গল্পের সম্ভার রয়েছে প্রায় আট-নয়টি গল্প সংকলনে, সেই গল্পগুলোকে কয়েকটি বিষয়ভিত্তিক সারণীতে সাজিয়ে নিলে গল্পকারের সত্যসন্ধানী দৃষ্টিকে খুঁজে নিতে সুবিধে হবে। ভারতের নানা প্রান্তে জীবনের একাধিক পর্ব অতিবাহিত করেও আদ্যন্ত বাঙালি এই লেখক তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এক আদর্শবাদী স্রষ্টা সত্তাকে তুলে ধরেছেন। —লেখক সহজেই ঘোষণা করতে পারেন।

"আমি আদর্শবাদী idealist। মানুষের জীবনে যে দোষ ত্রুটি আছে তা আমাকে ক্লেশ দেয়, কিন্তু তাই বলে ছিদ্রান্বেষিতাই সাহিত্যের স্বধর্মরূপে ভাবতে পারি না। মানুষের জীবন বস্তুত কেমন বিশ্রী তার চিত্র না এঁকে মানুষের জীবন কেমন হলে ভাল হত সেই চিত্রই আঁকবার চেষ্টা করি।"

শরদিন্দুর মানবপ্রেমিক জীবনরহস্য-সন্ধানী লেখকসত্তাই এ প্রবন্ধের মূল অনুসন্ধেয়। ঐতিহাসিক ও ডিটেকটিভ গল্পকারের ব্যাজস্তুতি ভূষিত শরদিন্দু তাঁর ঐতিহাসিক রোমান্সেও নিজের তুচ্ছ সামাজিক সত্তাকে অস্বীকার না করতে পেরে ঠাট্টা করেছিলেন এই ভাবে—

"আমি রেলের কেরাণী, বিদ্যা এন্ট্রান্স্ পর্যন্ত। তের বৎসর একাদিক্রমে চাকরি করিবার পর আজ ছিয়াত্তর টাকা মাসিক বেতন পাইতেছি—আমি জাতিস্মর! হাসির কথা নয় কি?"

শরদিন্দুর ঐতিহাসিক গল্পগুলোর জনপ্রিয়তার মূল কারণই হল, কাহিনী বুননে কখনও ঐতিহাসিক তথ্য বা তত্ত্বের কর্কশতা পাঠকমনকে বিমুখ করে না। বরং ঐতিহাসিক পটভূমিতে সেই অজানা অতীতের সামাজিক পরিবেশ, বিচিত্র মানবসম্পর্কের চলমান মিছিল মনকে পরম স্বাদুতায় ভরিয়ে দেয়।

শরদিন্দুর গোয়েন্দা গল্পগুলোতেও এর অন্যথা দেখি না। ব্যোমকেশ অজিত এবং তাদের হ্যারিসন রোডের বাসা, পুঁটিরামের মতো পরিচারক কিংবা পরবর্তী সময়ে ব্যোমকেশ সত্যবতীর দাম্পত্য সবই বাঙালি মধ্যবিত্তের চেনা গণ্ডিভুক্ত। শরদিন্দুই সম্ভবত এই শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বাংলা ডিকটেকটিভ গল্পকে অন্ত্যজ পর্যায় থেকে জাতে তুলেছিলেন। মনস্তত্ত্ব, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্বকে কিন্তু এসব গল্পে সাধারণ শহরে বা গ্রামীণ মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের আধারে পরিবেশিত করা হয়েছে। শুধু রহস্যের জট তৈরি আর খোলার মধ্যে কখনওই এ লেখাগুলি সীমাবদ্ধ থাকেনি। পরিচিত সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা কিংবা ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্নিহিত মনোবিকলনের ব্যাখ্যাই এসব গল্পের উপজীব্য।

এমনকী বরদা-কথিত ভূতের গল্পগুলো কিংবা অতিপ্রাকৃত-অলৌকিক বিষয়ের কাহিনীগুলিতেও কল্পনাকে যেখানে বাস্তবের মাটিতে কিছুতেই ধরে রাখা সম্ভব নয়, সেখানেও মুঙ্গেরের বাঙালি পাড়ায় বরদার আড্ডাস্থল ক্লাবটির পরিবেশ আমাদের তিরিশ-চল্লিশের দশকের পশ্চিমে প্রবাসী বাঙালির জীবনযাত্রার নির্ঝঞ্ঝাট শান্ত জীবনস্রোতের সঙ্গে পরিচিত করে। লৌকিক না হলেও গল্পের বিষয়বয়নে কখনও লেখক দেশজ ধরাছোঁয়ার বাইরে পা রাখেন না। আর এই কারণেই বরদার গল্পের ভূতেরাও সামাজিক ভূত, কখনও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় ক্ষতবিক্ষত অলৌকিক সত্তা। সুতরাং এভাবেও শরদিন্দুর ভূতের গল্পগুলির শ্রেণীবিন্যাস করা যেতে পারে। যেমন,

সামাজিক বা অসামাজিক ভূতের গল্প: মধু-মালতী, শূন্য শুধু শূন্য নয়, নীলকর, ছোট কর্তা, ভূত-ভবিষ্যৎ গল্পের ভূতেরা কখনও ঘোরতর সামাজিক আবার কখনও সমাজকে অস্বীকার করে প্রবল অপরাধপ্রবণ। 'মধু-মালতী' গল্পের মহারাষ্ট্রের কলেজ পড়ুয়া প্রেমিকযুগল মধু আর মালতী কেবল নিজেদের বংশানুক্রমিক শত্রুতার জন্য এ পৃথিবীতে মিলিত জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত হয়। প্রেতের শরীরে তাদের নিত্যদিনের যুগল সাইকেল ভ্রমণ কখনওই ভয়ের কাঁটা জাগায় না বরং বংশগত শত্রুতার জেরে দুটি কিশোরপ্রাণের মৃত্যু মনে ব্যথার ঢেউ তোলে। 'শূন্য শুধু শূন্য নয়'-তে অবশ্য লেখক ত্রৈলোক্যনাথপন্থী হয়ে একটু বাড়াবাড়িই করেছেন। প্রেতিনী প্রেমিকা নায়কের জন্য লুচি বেলে, চাকাচাকা করে আলু ভেজে যখন বধূর মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয় তখন এমন শাড়ী-গয়নার-খরচহীন স্ত্রী ভাগ্যের জন্য অনেকেই হয়ত একটু ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করেন কিন্তু সেই সঙ্গে 'ভূশণ্ডীর মাঠ'-এর স্রষ্টার মতো চিন্তান্বিতও হতে পারেন এই অভিনব দাম্পত্যের ফল সন্তান-সন্ততির কথা ভেবে। 'ভূত-ভবিষ্যৎ' কিংবা 'ছোট কর্তা'-র ভূতেরা নিতান্তই গৃহস্থভূত। সংসারেই তাঁরা থাকেন, সংসারের উপকারও করেন, এমনকী প্রয়োজনে ঘটকালিও। 'ভূত ভবিষ্যৎ'-এর পিতামহভূত আকবরি মোহর দিয়ে কন্যা-দায়গ্রস্ত পুত্রকে উদ্ধার করেন, অনূঢ়া নাতনিকে পাত্রস্থ করে সামাজিক সম্মান রক্ষা করেন। অন্যদিকে স্ত্রী-ধন যোগে ভাগ্যহীন ঔপন্যাসিকের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলেন।

তবে অসামাজিক ভূত কখনওই এমন প্রীতিবৎসল নয়। অবদমিত কামনার শিকার প্রেতাত্মা নীলকর সাহেব যুবতীশরীরের স্বাদ ভোলেনি। 'নীলকর' গল্পে ধর্ষকামী সাহেব আত্মার প্রভাবেই যেন নীলকুঠির বৃদ্ধ নায়েব, যুবক মানিক, যুবতী কবুতরী সকলেই

যৌন মনোবিকলনের বশীভূত। এ গল্প কি কেবল ভূতের লাম্পট্যের বিবরণ? না কি মনের আদিম-পাপ প্রেতের মতোই নীলকুঠির মানুষগুলোকে আক্রমণ করেছিল? এমন অসামাজিক ভূত এখনকার ভূতের গল্পেও পাওয়া যায় না। বরং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পে এখন ছোটকর্তাজাতীয় domestic ghost-র প্রায়শই গতায়াত চোখে পড়ে।

অতিপ্রাকৃতের ছায়া, না মনের ঘূর্ণি: শরদিন্দুর এমন কিছু অলৌকিক রসের গল্প আছে যার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের রহস্যের থেকে অবচেতনের অন্ধকারকে ভেদ করার চেষ্টা ধরা পড়ে। যেমন, 'মরণ-ভোমরা', 'কালো মোরগ' বা 'অশরীরী'। ডায়রির মতো লেখা 'অশরীরী' প্রাথমিকভাবে ক্ষুধিত পাষাণের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। যদিও এখানে মেহের আলির হুঁশিয়ারি চিৎকার নেই, তবু মনে হয়, প্রেত প্রণয়িনীর অস্তিত্ব আবিষ্কার নিঃসঙ্গ মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া। রোমান্টিক পরিবেশে নারীসঙ্গের অভাববোধের মানসিক তাড়নাই ঐ অশরীরিণী। এ ধরনের গল্পগুলো অবচেতন মনোবিকলনের প্রতিক্রিয়াই মনে হয়।

একদা শরদিন্দুর শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় যশস্বী সমালোচক লিখেছিলেন, 'কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে, তাঁর চলতি জীবনের গল্পগুলো প্রাচীন যুগের গল্পের তুলনায় নিষ্প্রভ।' বস্তুত তা বোধহয় নয়, কেননা শরদিন্দুর এ ধরনের গল্পগুলো বেশির ভাগ দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। এই চলতি জীবন কথা নির্ভর তাঁর প্রায় কমবেশি চুয়াত্তরটি গল্প বিভিন্ন সংকলনগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। হালকা রোমান্টিক আবার সিরিয়াস মনোবিশ্লেষণী দু'ধরনের গল্পেই তিনি সাবলীল, ছোট গল্পের উদ্যত তর্জনীকে স্পর্শ করেন।

সরস সামাজিক-পারিবারিক গল্প: শরদিন্দুর সব কাহিনীরই আশ্রয় মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার। কখনও কলকাতাবাসী অথবা মুঙ্গের বা বম্বে পুণা প্রবাসী। পুরুষেরা বেশির ভাগ পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায়ী কিংবা উকিল অথবা ডাক্তার। চাকুরিজীবী চরিত্র তুলনামূলকভাবে কম। সাহিত্যব্যবসায়ী দু'একজন অবশ্য আছেন। ওকালতির প্রসঙ্গ তাঁর বেশির ভাগ লেখায় একটু তীর্যকভঙ্গিতে আঁকা। বোধহয় ব্যক্তিগত জীবনে পেশাটির প্রতি বীতস্পৃহাই এর কারণ। তিরিশ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত মেয়েদের যে আইডেনটিটি, শরদিন্দু খুব বেশি তার বাইরে যাননি। তাঁর গল্পের নায়িকারা কেউই তেমন ডানাকাটা পরী নয়, চলনসই সুশ্রী। অল্প শিক্ষিত, অন্তঃপুরিকা। দু'একজন চাকুরিজীবী নায়িকাও আছেন কিন্তু তাদের প্রতি স্রষ্টা যথেষ্ট সন্তুষ্ট নন। এমন ব্যতিক্রমী নায়িকা 'স্ত্রী-ভাগ্য'-র ঊষা পাঠক। সে জীবনবিমার দালালি করে। কিন্তু দালালিটা তার ছুতো, ধনী পুরুষের সঙ্গে মেলামেশাই প্রধান উদ্দেশ্য। স্বামী ধীরাজকে ত্যাগ করে সে যদিও বম্বেবাসী হয় কিন্তু ধীরাজের জীবনবিমার পঞ্চাশ হাজার টাকা উদ্ধার করতে দ্বিধা করে না। তবে সাধারণত শরদিন্দুর নায়িকারা প্রথম যৌবনেই স্ত্রী অথবা প্রেমিকা। কুড়ির ঊর্ধ্বে শরদিন্দুর বর্ণনায় সেই সব নায়িকারা 'ভারিভুরি গড়নের' হয়ে যান। তখন তো জীবনটা শুরুই হত বড় তাড়াতাড়ি, মেয়েদের ১৮ হবার, বি.এ., এম.এ. পাশ করার, কেরিয়ার গড়ার দায় ছিল না, তাই কুড়িতেই বুড়ি। তবু তারই মধ্যে আবার 'সেকালিনী'-র শৈল আছে। ষোল বছরের কুমারী শৈলকে ভাললাগা যুবক-ডাক্তার অজয়কে পাবার জন্য কখনও পায়ের বুড়ো আঙুল ভাঙতে হয়, কখনও হাত পোড়াতে হয়—শুধু অ্যালোপ্যাথি-ডাক্তারদের প্রতি বীতরাগ কবিরাজ পিতার চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। 'কর্তার কীর্তি', 'ভেনডেটা,' 'ভল্লু-সর্দার', 'সন্ধি-বিগ্রহ' এসব গল্পে তখনও পর্যন্ত টিকে যাওয়া বাঙালি যৌথ পরিবারের একটি উপভোগ্য ছবি পাওয়া যায়। 'কর্তার কীর্তি'তে প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত পুত্রদ্বয়ের ওপর পিতার আধিপত্য আজকের ইউনিট পারিবারিক ডিজাইনে একেবারে বিদেশি আসবাব। 'ভল্লু-সর্দার'এ ছ'বছরের ভল্লুর সৈনাপত্যে নববিবাহিত কাকা-কাকিমার মিলিত হওয়ার একটি সরস পারিবারিক চলচ্ছবি। কনিষ্ঠার বেণি কেটে নেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত 'সন্ধিবিগ্রহ'-এর বালক নিতাইবাবুকে সারা পরিবার যেভাবে শাস্তি দিতে উদ্যোগী তা যৌথ পরিবারের পজিটিভ দিকটাকেই তুলে ধরে।

তীর্যক সমাজ দৃষ্টি: শরদিন্দু কখনও কখনও সমাজকে বাঁকা চোখে দেখেছেন কিন্তু সে দৃষ্টিতে হুল নেই। বরং একটা মুচকিহাসির মজা পাওয়ার ভঙ্গি রয়েছে। তাঁর এ ধরনের গল্পগুলোর পটভূমি অনেক সময়েই বম্বে বা পুণা। 'যস্মিন দেশে'-র তপেশ সে-সময়ের বম্বের মফস্বল বা গ্রেটার বম্বের প্রবাসী বাঙালি। পাড়াবেড়ানি বউয়ের জ্বালায় সে একদা দেশত্যাগ করেছিল যদিও তার এখানকার মারাঠি স্ত্রী বেলাগড়িয়ে বাজার করে ফেরেন তাতে অবশ্য তপেশ বলে—"তাড়া তো কিছু নেই, বাজার করে একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে ফিরবে—" আবার মারাঠি দেহাতি বালিকা গোদাবরী কেবল বাঙালি রান্নায় হাত পাকিয়ে মধ্যবয়স্ক প্রবাসী রামকানাইবাবুর জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠল। দেশকে ছাড়লেও পুণায় একঘরে হয়েও রামকানাই দেশাচারকে ছাড়তে পারেন না।

চলতি সময়ের ছোট-বড় কোনও সামাজিকে সমস্যাই শরদিন্দুর চোখ এড়িয়ে যায়নি, হয়ত তাকে তত্ত্বের ঘেরাটোপে কোণঠাসা করেননি কিন্তু মূল জায়গাটা ছোট গল্পকারের মুনশিয়ানার চোরা লণ্ঠনের আলোয় তুলে ধরেছেন। 'শাপে বর' গল্পে যেমন প্রথম মহাযুদ্ধকালীন কলকাতায় বাড়ি ভাড়া পাওয়ার এবং দেওয়ার সুযোগসুবিধের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই রকম 'ভালবাসা' গল্পে বম্বের মফস্বলে কীরকম বম্বে চৌল বা ভদ্রসমাজের বস্তি গড়ে উঠেছে তারও উপভোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন। সেই তিরিশের

দশকেও বম্বে গিয়ে 'খোলি' জোগাড় করা যে কী দুষ্কর ছিল তা খোলি অনুসন্ধানী ঘেঁচুর দুর্দশার থেকেই জানা যায়। তবে তখনও ঘেঁচুর বাঙালি রান্নার জন্য 'মন কেমন করা' ছিল, বোম্বাই প্রবাসী দাদাটিও তাকে নিজ বাসায় বাড়তি ঘরখানিতে আশ্রয় দেওয়ার আশ্বাস দিতে পারতেন। যার কোনওটারই মুখোমুখি হওয়া আজকের বোম্বাইগামী যুবকের পক্ষে সম্ভব নয়। 'ঝি' গল্পে বিপত্নীক বস্ ঘনশ্যামবাবুর মেজাজ তরিবত থাকে কন্যার আয়া কাজে এলে, নতুবা তাঁর অন্যমূর্তি—সারা অফিস তটস্থ। আয়া বিষয়ে ঘনশ্যামের বিশেষ মনোভাবটি ব্যতিক্রমী হলেও সমস্যাটি এখনও সমানভাবে গৃহস্থকে কণ্টকিত করে। পঞ্চাশ বছর পরেও সমস্যা একই জায়গায় রয়ে গেছে, কেবল ঘনশ্যামের পরিবর্তে এখন তাঁর চাকুরিরতা পত্নীটিকেও বাংলা গল্পে জায়গা দেওয়া হয়েছে। 'নাইট ক্লাব'-এর মতো গল্পে লেখক যেমন সমাজের হিতকারী রক্ষণশীলতা অটুট রাখার সমর্থক হয়ে ওঠেন, তেমনই আবার "আরব সাগরের রসিকতা"-য় শাড়ি-পরিহিতা গিন্নির সমুদ্রস্নানের দুর্দশায় সুইমিং-কস্ট্যুম আবৃতা তথাকথিত 'বেহায়া' মেয়ের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া দেখে বাঁকা হাসি হাসেন। কোনও কিছুর বাড়াবাড়িই যে সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকারী তা শরদিন্দুর বহু গল্পে এভাবে ছড়িয়ে আছে।

সিরিয়াস সমাজ-দর্শন: সব সময় যে হাসির ফিল্টারে সমস্যার গুরুভারকে শরদিন্দু হালকা করতে চেয়েছেন এমনও নয়। প্রয়োজন অনুযায়ী ভঙ্গি পাল্টেছেন। নিখুঁত মেদহীন প্লটের বাঁধুনিতে উপহার দিয়েছেন 'ভাইভাই', 'একূল ওকূল', 'মানবী'-র মতো গল্প। যৌথ পরিবারের শুধু সরস উপভোগ্যতাই নয়, তা ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণাও পাঠককে বিদ্ধ করে 'ভাই ভাই' গল্পে। তবে বড় ভাই দুর্গাদাস ছোট ভাইয়ের সন্তানকে দত্তক নিয়ে যেভাবে সেই ভাঙা সংসার জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করে তা পঞ্চাশ বছর আগে সম্ভব হলেও এখন যে বাতুলের কল্পনা তা বলাই বাহুল্য। 'একূল ওকূল'-এ লেখক একটি গ্রাম্য মধ্যবিত্ত পরিবারকে বেছে নিয়েছেন। সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া সাধুচরণের অকস্মাৎ প্রত্যাবর্তন পরিবারের গৃহী মানুষগুলিকে বড়ই বিব্রত করে। অধুনা পরিবারের কর্তা যুবক পুত্র নিমাইয়ের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। গ্রাম-সমাজ তাতে অগ্নিসংযোগ করে। তারাশঙ্করের ঘরানার এ গল্পে শেষ পর্যন্ত সাধুচরণের বউ, নিমাইয়ের মা সৌদামিনী সংসারের ধারয়িত্রী, রাতের অন্ধকারে সাধুচরণকে বিদায় করে। সৌদামিনী দু'কূলেরই ধাত্রী কিন্তু সাংসারিক শান্তির জন্য এক কূল বেছে নেয়, আর একটি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। 'মানবী' একটু দীর্ঘ বৃত্তান্তধর্মী গল্প। নিষ্পাপ দেবীপ্রতিমা-তুল্য কিশোরী 'দেবী' সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে কীভাবে 'মানবী'তে পরিণত হল তার গল্প। গল্পটি চরিত্রনির্ভর হলেও আসলে একটি সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের শ্রেণীবিচ্যুতির কাহিনী। অর্থনৈতিক স্খলনের প্রতিক্রিয়ায় 'দেবী' মানবী তথা জননীতে রূপান্তরিত হয়। সংসারকে দু'হাত মেলে সমস্ত আঘাত থেকে রক্ষা করার যে আমরণ প্রয়াস এ গল্পের নায়িকার মধ্যে দেখা যায় তা মনে পড়িয়ে দেয় সমকালীন কিন্তু বিপরীত মেরুর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী'-কে।

রোমান্টিক মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী: মানুষের মনের গহনে ডুব দিতে গিয়ে শরদিন্দু যখন সরস রোমান্টিক ভঙ্গিতে লেখেন তখন বেছে নিয়েছেন দাম্পত্যের প্রেক্ষিত অথবা প্রেমের পূর্বরাগ। 'মনে মনে' এমনই এক সর্বকালীন দাম্পত্য মহিমার স্বাক্ষর। স্বামী-স্ত্রীর আত্মকথনে বর্ণিত নিতান্ত আটপৌরে দাম্পত্যের নিয়মমাফিক মান অভিমানের কয়েক ঘণ্টার ছবি। রাতের অন্ধকারে মিটমাটটুকুও অতি পুরাতন। তবু পরিবেশনের গুণে জীবনের এসব বেরঙা মুহূর্তগুলিও রঙিন হয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঝাঁপিতে উঁকি দিতে উৎসাহিত করে। অফিস-ফেরত স্বামীর আবাহনে পান থেকে চুন খসার ভয়ে কণ্টকিত মিনতির অবস্থান একবিংশের দোরগোড়াতেও আদ্যিকালের মতোই থেকে গেছে। 'এমন দিনে' এক বর্ষণক্লান্ত রাতের নিবিড়তায় ইরা-সমীর বিবাহপূর্ব সম্পর্ককে পরস্পরের কাছে অকপটে স্বীকার করে—ভালবাসায় সততায় পাঠক মুগ্ধ হয়। শুধু শেষে সমীর গল্পের পয়েন্টেড ফিংগারটি তুলে ধরে—"কিন্তু ইরা, সত্যি যদি একটা নোংরা ব্যাপার হত? তুমি আমাকে বলতে পারতে?" শরদিন্দু যেখানে শেষ করেছেন, আজকের ছোটগল্প সেইসব ক্লেদাক্ত জটিল মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়। এ সব ভুল যাতে না হয়, তাই 'পরীক্ষা'-র মণিকা বিয়ের আগেই বিনায়ককে যাচাই করে নিতে চেয়েছে। বিনায়কও সসম্মানে উত্তীর্ণ সে 'পরীক্ষা'য়। কিন্তু এমন পরীক্ষার সুযোগ অথবা তার প্রত্যাশিত ফলপ্রাপ্তি তো নাও হতে পারে—তখন জীবন কতখানি বিষবহ হয়ে ওঠে? তার উত্তরও দিয়েছেন শরদিন্দু তাঁর একেবারে ভিন্নধারার গল্পগুলিতে।

অবদমিত বাসনা রিরংসা কণ্টকিত জটিল মনোবিশ্লেষণী গল্প: আদিরসকে শরদিন্দু রসরাজ হিসাবে বরণ করেছিলেন। প্রেমের মধ্যে লালসা থাকা অন্যায় মনে করলেও সকাম প্রেমকে তুচ্ছ ভাবতে পারেননি। বরং তাঁর মনে হয়েছে "সুন্দর মুখে কালো টিপ যেমন মুখের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেয় তেমনি প্রেমের তুষারশুভ্র পবিত্রতার উপর কামনার একটু ছিটাও বেশ চমৎকার মানায়। কামনা যেন প্রেমের নিমক।" শরদিন্দুর সব ধরনের গল্পেই তাই প্রেম কখনওই আকাশচারী নয়—নীতিবাগীশদের মুখে ছাই দিয়ে যথেষ্ট শরীরী। কিন্তু শরদিন্দু একথাও মনে রেখেছেন যে, realism-এর দোহাই দিয়ে শরীরীকামনার অকারণ নগ্নতা

কোনও সৃষ্টিকে সার্থক করতে পারে না। প্রকাশের মুনশিয়ানা করায়ত্ত থাকলে মানুষের মনের বিষ কত সূক্ষ্মতায় উন্মোচিত হতে পারে—পাঠকমন সেই বিষের ছোঁয়ায় নীল হয়ে যায়। 'আংটি', 'মন্দ লোক', 'সাক্ষী' পড়লে এমনই অভিজ্ঞতা হয়। রাতের অন্ধকারে ক্ষেত্র যে 'আংটি' চুরি করতে যায়, বিফল হয়ে ফিরে এসে বউ চপলার আঙুলে সেই হিরের ঝিকিমিকিতে সূচিবিদ্ধ হয়। শরদিন্দু কেবল এটুকুই বলেন। মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বেশ্যা কন্যাটিকে তার 'মন্দলোক' পতিতা মা চিকিৎসকের কাছেই প্রথম নিবেদন করে কন্যার জীবিকার শুভ উদ্বোধন করতে চায়। এ গল্প মনে পড়িয়ে দেয় জগদীশ গুপ্তের ক্লেদাক্ত রূঢ়তাকে। এই 'মন্দলোক'টি রাজলক্ষ্মী-চন্দ্রমুখীর মতো ছদ্মবেশী দেবী নয়। দেবতার আসনে না বসিয়েও বাস্তব সমাজ আদর্শ থেকেই শ্রেণীচরিত্রের মহত্ত্বকে তুলে ধরতে পারেন এই লেখক। তথাকথিত 'মন্দ' মেয়েমানুষটি সম্পর্কে তাই সেই চিকিৎসকের মূল্যায়ন হল: "আদর্শের মাপকাঠি সকলের সমান নয়; বৈষ্ণবের কাছে যাহা মহাপাপ, শাক্তের কাছে তাহা পুণ্য। শ্বশুর মাতা আমাকে পাপ পথে প্রলুব্ধ করিতে আসে নাই, বরং তাহার পরিপূর্ণ প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ লইয়া আসিয়াছিল।"

প্রত্যেক গল্পের তলরেখায় যে নিরুচ্চার চূড়ান্ত প্রশ্নটি আন্ডারলাইন করা থাকে তাকে স্বল্পতম স্বতঃস্ফূর্ত চেষ্টায় তুলে ধরে সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য দরকার স্রষ্টার নির্ভুল নাড়ি জ্ঞান, উপযুক্ত স্টাইল আর অভিব্যক্তির সংযম। শরদিন্দুর এই সব ক'টি গুণ ছিল বলেই তিনি 'স্মরগরল', 'বড় ঘরের কথা', 'সুত-মিত-রমণী', 'পতিতার পত্র', 'ট্রেনে আধঘণ্টা', 'কালকূট', 'পিছু ডাক'-এর মতো গল্পের স্রষ্টা।

'স্মরগরল'-এর শশী সাবিত্রী-ঝি নয়, বয়ঃসন্ধির রতনের শরীরকে সে প্রথম সুযোগেই বিষিয়ে দেয়—এ কি তার শ্রেণীগত আক্রোশ? রতনের শরীরের লাল চাকা চাকা দাগ যেন সমাজের ক্ষত। মধ্য-বয়স্ক মামা সদ্য বিবাহিত নবযুবতী স্ত্রীকে নিয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য—বয়সের অক্ষমতাকে ঢাকার তাগিদে অতিরিক্ত প্রেমের প্রদর্শনী একদিকে, অন্যদিকে নবোঢ়া মামিমার রতনের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা রতনের রক্তে আগুন ধরায়। তাতে ইন্ধন যোগায় শশীর কালো উদ্ধত শরীর। জগৎ জোড়া কামের লীলায় রতন দিকভ্রান্ত হয়। বয়ঃসন্ধির অবদমিত কামনা লাভার মতো উৎসারিত হয়। কামনার সেই দাহিকা স্রোত ভাসিয়ে দেয় পুরুষত্বহীন স্বামীর নিষ্ঠাবতী স্ত্রী প্রভাবতীরও সমস্ত ধৈর্য। রাতের নৈঃশব্দে ময়নাঝির ছদ্মবেশে চাকর মোহনের দরজায় আঘাত করে প্রভাবতী; শুধুই কি সন্তান কামনায়? না কি ঝি ময়নার যা আছে, তা প্রভাবতীরও আছে সে কথাই প্রমাণের জন্য? অথবা সারাজীবনের নারীত্বের অপমানকে একটি রাতের জন্যও সম্মানিত করতে চেয়েছিল প্রভাবতী? এ সবই 'বড় ঘরের কথা'। কিন্তু অতি-ছাপোষা গুরুচরণ, যে ছেলের পাঁচ বছর বয়সে জানতে পারে ছেলের বাবা তারই পরম মিত্র। তবু বিচিত্র বৎসল্যের মোহে যে ছেলে ত্যাগ করতে পারে না, তেমন মানুষই বোধহয় মৃত্যুশয্যায় সেই বন্ধুর হাতে স্ত্রী-পুত্রের দায়িত্ব দিয়ে ইষ্টচরণে নিবেদন করতে পারে—"অবতারণ ভার তোহারা।" শরদিন্দুর গল্পে স্বৈরিণী নারীর প্রতি পুরুষের এজাতীয় ঔদার্য একাধিকবার দেখা গেছে। 'কালস্রোত' কিংবা 'ট্রেনে আধঘণ্টা' এ ধরনের পুরুষের মহত্ত্বব্যঞ্জক গল্প। অন্যদিকে পদস্খলিতা নারীর বেদনা-বিক্ষোভ অনেক বেশি তীব্র 'কালকূট', 'পিছুডাক'-এ। বিবাহ-পূর্ব জীবনের পুরুষসংসর্গের স্মৃতি একজনের স্ত্রী, সন্তানের মা কমলা কালকূটের বিষের মতোই সারাজীবন বহন করে চলে। 'পিছু ডাক'-এর কেশরবাঈ মনে পড়িয়ে দেয় 'আঁধারে আলো'-র কথা। কেশর অবশ্য একদা স্বামীর গৃহে মুজরো গাইতে যায় না, কিন্তু মনের গোপন কন্দরে লুকিয়ে থাকা স্বামী সংসারের 'পিছু ডাক' তার অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

শরদিন্দু কখনও সমাজের অন্ত্যজের পরিচিতিকে তত্ত্বকথায় ভারাক্রান্ত করেন না, অকারণে আদর্শায়িতও করেন না। অত্যন্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে তিনি তাঁর চরিত্রদের শ্রেণীসীমায় আটক রাখেন কিন্তু শ্রেণীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সাতকাহন করেন না।

শরদিন্দু জানতেন আদিরসের সঙ্গে হাস্যরসের সঠিক অনুপাতে মিশ্রণ অম্লমধুর রসের স্বাদুতা সৃষ্টি করে। 'ঝি', 'ঘড়ি দাসের গুপ্তকথা'-য় তাঁর সেই নিপুণতা ধরা পড়ে। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন ট্র্যাজিকরসের সঙ্গে হাস্যরস সরলভাবে মিশ খায় না। কিন্তু মেশাতে পারলে "উহা অতি উপাদেয় হইয়া ওঠে।" সেই বিরল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন শরদিন্দু। 'লম্পট', 'মুখোশ' গল্পে শরীরী বিলাস সূক্ষ্ম হাস্যরসে জারিত হয়ে শেষ পর্যন্ত দুটি অশ্রুর মুক্তাবিন্দু ফুটিয়ে তোলে। শরদিন্দুর মনস্তাত্ত্বিক গল্পগুলি সবই করুণরসার্দ্র। তবে লেখক জানেন, "করুণরস ফেনাইতে নাই—সংক্ষিপ্ততাই করুণরসের প্রাণ।"

শরদিন্দুর গল্পে অবদমিত কামনার আর এক ভয়ঙ্কর রূপ দেখা যায় 'ছুরি', 'পূর্ণিমা'-র মতো রচনায়। 'ছুরি'-র দাম্পত্য সুখ-বঞ্চিত নগেন রাতের আঁধারে মানুষের নরম শরীরে ছুরির উপর্যুপরি আঘাত করার মধ্যে পরকীয়া প্রেমের নিষিদ্ধ আনন্দ উপভোগ করে। 'পূর্ণিমা'-য় মনোবিকারের রোগী জীবুর রক্তে পূর্ণিমা তিথিতে হত্যার বীজাণু ছোটাছুটি করে। 'কল্পনা'-র লেখক চিরযৌবন বাবুর মনের বয়স বাড়ে না তাই শরীরের বয়োবৃদ্ধিও মেনে নিতে পারেন না। আমরা সকলেই ভাবের ঘরে চুরি করে এভাবেই মনকে চোখ ঠারি কিন্তু কানের কাছে যখন শুনিয়ে দিয়ে যায় "ওই বুড়োটা"—তখন কী দুর্বিসহ বিড়ম্বনা!

বিচিত্র মানুষের মিছিল : বঙ্কিমশিষ্য শরদিন্দু উত্তর প্রজন্মকে উপদেশ দিয়েছিলেন : "যে চরিত্রটি আঁকিবে তাহাকে উলঙ্গ করিয়া দেখিয়া লইবে। হয়তো সে চরিত্র সম্বন্ধে সব কথা লেখার প্রয়োজন নাই, তবু তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিয়া লওয়া চাই।" এই সমগ্রতার আভাসটুকু স্রষ্টার করায়ত্ত বলেই সৃষ্টি হয় 'ব্রজলাট', 'ভূপৎ সিং', 'কিস্টোলাল', 'মটরমাস্টার', 'রূপদমন', 'মংলু' চরিত্র। 'ব্রজলাট'-এর ব্রজেন বড় মানুষের মতো চলাফেরা করে, পরিচিত মহলে তাই সে ব্রজলাট। অথচ পথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে জানা যায় গত এক মাস সে অনাহারে কাটিয়েছে। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, ব্রজলাট শেষ হয়েছে ও-হেনরির দক্ষতায়। ব্রজেনের জীবনযাপন কি শুধুই বড়লোকি চালিয়াতি না কি মনের ধন-বিলাস? 'অপদার্থ' ভূপৎ সিং অতি নিষ্কর্মা অথচ বৈদ্যুতিক কারিগরি বিদ্যার আকর্ষণ তার চরিত্রেই পাল্টে দিল। যন্ত্র আর মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক গল্পটির প্রতিপাদ্য। পঞ্চাশ বছর আগেও কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় মস্তান ছিল, তখন বলা হত 'গুন্ডা।' মটর মাস্টার এমনই একজন গুন্ডা। কিন্তু একদা তার প্রাণরক্ষাকারীর সন্ধান বাঁচানোর জন্য সে খুন করে ফেরারি হতেও দ্বিধা করে না। তখন হয়ত গুন্ডাদের মধ্যেও আদর্শবাদের ছিটেফোঁটা ছিল। 'অষ্টমে মঙ্গল'-এর অত্যন্ত হতদরিদ্র মংলুর একটিই চরিত্রধর্ম— বউকে আত্যন্তিক ভালবাসা। প্রথমবারের রুমা বৌটি মারা গেলে একই অধ্যবসায়ে দ্বিতীয় পক্ষের রুমা স্ত্রীকেও আক্ষরিক অর্থে সে বহন করে চলে। অথচ দিল্লির টান্ডাওয়ালা 'কিস্টোলাল' উচ্চবিত্ত শিক্ষিত প্রবাসী বাঙালি পরিবারের একমাত্র সন্তান হয়েও, ঘরে শিক্ষিতা সুন্দরী সুশীলা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও টান্ডাওয়ালার জীবনযাপন করে। ইয়ার বক্সদের নিয়ে হল্লা করে। বহু সৎ চরিত্রহরণের অধিকারী কিস্টোলাল ধনী বাবার কাছে কোনও অন্যায় সুযোগ নেয় না, স্ত্রীকে অসম্মান করে না কিন্তু বস্তিবাসী নটখটি যুবতীকে নিয়েই মত্ত থাকে। কিস্টোলাল যেন তথাকথিত ভদ্রসমাজের অতিথি। কোথায় যেন মিল 'অতিথি'র তারাপদর সঙ্গে। 'বাঘিনী'-র রূপদমনের প্রেম বাঘিনীর সঙ্গে। শিকারির গুলিতে বাঘিনীর মৃত্যু হলে সে খোলা মনে মানবী বউকে গ্রহণ করতে পারে। বাঘিনীর অবদমিত কামনা তাকে নারীঘাতিনী করে তোলে। কী বিচিত্র এই সম্পর্কের ব্যাপ্তি। 'বাঘিনী' লেখা হয়েছে ১৩৫২-তে, আর ১৩৪১-এর শারদীয়া দেশে প্রকাশিত হয়েছে তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী।' সাপুড়ের নাগিনী 'বিবি' আর রূপদমনের প্রেমিকা 'বাঘিনী'-র দূরত্ব খুব বেশি নয়।

শরদিন্দুর কয়েকটি কবিতার মতো গল্প আছে, যেখানে এক ধরনের নস্ট্যালজিক— স্মৃতিমেদুর মনোবিশ্লেষণ ধরা দেয়। যেমন, 'গোপন কথা', বা 'রোমান্স' গল্প দু'টি। দুটিরই প্রেক্ষাপট চলার পথে কোনও রেলস্টেশন। প্রথমটিতে রেলের কামরায় হঠাৎ দেখা চেনামুখ আর দ্বিতীয়টিতে ট্রেনের জানলায় দেখা পাওয়া কল্পনার মানসপ্রতিমার। দু'টি গল্পেরই উৎস মনে হয় 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'হঠাৎ দেখা' কবিতাটি। বিশেষ করে 'গোপনকথা'-য় যখন ট্রেনের জানলায় হঠাৎ দেখা পাওয়া প্রৌঢ়া—"মুখ বাড়াইয়া হাসিলেন, তারপর সঙ্কেত-ভরা একটি তর্জনী তুলিয়া ঠোঁটের উপর রাখিলেন। পঁচিশ বছরের পুরানো একটি দিন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।" এমন গোপন কোনও স্মৃতি আমাদের প্রত্যেকেরই মনের মণিকোঠায় তোলা থাকে। এ গল্প সেই স্মৃতির বেদনাকে জাগিয়ে দেয়। কবির ভাষায় বলতে হয় "রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা / ভাবিনি সম্ভব হবে কোনদিন।... বুঝিয়ে দিলে হাতের অস্থিরতায় / কেন এসব কথা / এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ করে থাকা।" ('হঠাৎ দেখা' —রবীন্দ্রনাথ)

ক্ষুদ্র সীমায় বৃহত্তর সমাজ-দর্শন : শরদিন্দু সম্পর্কে একটা প্রচলিত ধারণা হল তিনি বড় কোনও সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যাকে এড়িয়ে গেছেন। কোনও কিছুর অতিরেক হল শরদিন্দুর লেখক-স্বভাব বহির্ভূত। এড়িয়ে তিনি কিছুই যাননি। সাম্প্রদায়িক সমস্যা, পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের শঙ্কা এমনকী আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার আভাস সবই তাঁর রচনার সীমায় ধরা দিয়েছে কিন্তু ভঙ্গিটি কখনও চিৎকৃত নয়। পৃথিবীর "গভীরতর অসুখ"-এর কথা তাঁর অজানা ছিল না। স্বাধীনতা পাওয়ার একবছর পরে দিনলিপিতে লিখছেন : 'আজ যে সংঘাত আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহা জাতিতে জাতিতে স্বার্থসংঘাতের দ্বন্দ্ব নয়— আজ দ্বন্দ্ব জীবনের আদর্শ লইয়া। ধনবাদ আর গণবাদের যুদ্ধে দুই পক্ষই মরিবে— যে জিতিবে সে বিজয় সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারিবে না। আণবিক বোমা মানুষকে অণুতে পরিণত করিয়া ছাড়িবে। বানরের হাতে ক্ষুর পড়িয়াছে আর কি রক্ষা আছে?' এই ভাবনাচিই গল্পের আকার নিয়েছে 'সাদা পৃথিবী'-তে। প্রথমটায় পরশুরামের 'উল্টু পুরাণে'র মিল পাওয়া গেলেও এ গল্প সত্যিই ভয়ানক। বিজ্ঞানী সার জন ডারউইনের 'সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট'-এর তত্ত্বকে আণবিক নির্বাচনের তত্ত্বে পরিণত করেন। তাঁর মতে পৃথিবীর যোগ্য অধিবাসী কেবল স্বেতবর্ণীরা। পৃথিবী ব্যাপী তাঁর তত্ত্বের প্রয়োগ সাফল্য ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীও পৃথিবীতে আনফিট প্রমাণিত হন। বর্ণবিদ্বেষের কথার পাশাপাশি এসেছে আমাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কথা 'দুই দিক' গল্পে। 'দুই দিক" কেবল প্রাণরক্ষাকারী হিন্দু ডাক্তারের প্রতি মুসলমান দাঙ্গাবাজ গুন্ডা নুর মিঞার কৃতজ্ঞতার কাহিনী নয়। কোকেনের পৈশাচিক ক্ষুধার বিরুদ্ধে নুর আর ডাক্তারের যুগপৎ সংগ্রামের গল্প। 'ভক্তিভাজন', বোম্বাই প্রবাসী লেখক আর মাতাল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মারাঠি 'প্রাগাঞ্জা'-র বন্ধুত্বের গল্প।

এযনকার মুম্বইবাসী বাঙালির অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান করতে পারে, প্রাগাঞ্জার কাহিনী। সুতরাং এসব গল্প পড়ার পরেও কি সমালোচক মোহিতলালের মতো বলা যেতে পারে যে—"আপনি বাস্তবের বাস্তবতা খুঁড়িয়া দেখিতে চান না, জীবনের কোন ব্যাখ্যা বা Philosophy আপনার মনকে চাপিয়া ধরে না— সে পিপাসা আপনার নাই।" আজ কিন্তু মনে হয় নিয়ত সেই পিপাসাই শরদিন্দুকে তাড়না করেছে। অবশ্য মোহিতলালের আর একটি মূল্যায়ন অবশ্যই সমর্থনযোগ্য— যেখানে শরদিন্দুর গল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য বলা হয়েছে রসসৃষ্টি আর পাঠকের মনোহরণ করা। শরদিন্দু স্বয়ং তাঁর রচনার immediate appeal-কে স্বীকার করেছেন। শরদিন্দুর কাছে রসবর্জিত সত্যও সাহিত্য নয়। যাঁরা কেবল সত্য উদ্ঘাটনে ব্যস্ত তাঁরা ঋষি হতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিক নন।

জীবনের সত্যান্বেষণে শরদিন্দু কোনও আরোপিত স্টাইল বহন করেন না। স্বতঃস্ফূর্ততাই তাঁর স্বাভাবিক স্টাইল। তাঁর মতে প্রত্যেক দৃশ্যকে visualise করাই সাহিত্যিকের প্রথম কর্তব্য কিন্তু তার জন্য অতিরিক্ত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। এমনকী প্রকৃতির বর্ণনাও দশপংক্তির বেশি করার দরকার নেই তাঁর মতে। কেননা "যাহা সকলেই চোখে দেখিতে পায় তাহার দীর্ঘ বর্ণনা ক্লান্তিকর।" ঐতিহাসিক গল্পগুলির বর্ণনা সৌকর্য, ভাষার মহিমা বহু আলোচিত। কিন্তু সাধারণ জীবনের চলচ্ছবি রচনাতেও তিনি কুশলী শিল্পী। প্রকৃতি শরদিন্দুর কাছে কখনও পটভূমি নয়— প্রকৃতির আয়নায় প্রতিবিম্বিত জীবনকে দেখেন এই লেখক। 'বড় ঘরের কথা'-য় তেমনই একটি বর্ণনা : "আকাশে যেমন অলক্ষিতে বাষ্প সঞ্চিত হইয়া কালবৈশাখীর ভূমিকা রচনা করে, তেমনই জমিদার পরিবারের শত কর্ম-বহুলতার অন্তরালে ধীরে ধীরে উষ্ণতার স্বচ্ছ মেঘ সঞ্চিত হইতে লাগিল।" মানুষের জীবনে বর্তমানের অস্তিত্ব যে কত ক্ষণস্থায়ী তার উপমাময় বর্ণনাটি প্রবচনতুল্য : "বর্তমান কতটুকু? স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষার মাঝখানে দ্রুত সঞ্চরমান একটি বিন্দু! তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই, এক ফোঁটা পারার মত কেবলই সে পিছলাইয়া হাতের বাহিরে চলিয়া যায়, ধাবমান ট্রেনের জানালা দিয়া দৃষ্ট নিসর্গের মত মুহূর্তে সম্মুখ হইতে পশ্চাতে অদৃশ্য হয়।" (গোপন কথা) আবার রেলগাড়ির কী অভূতপূর্ব উপমা—'লোহার খাঁচায় পোরা একটি ধাবমান মিছিল।' (রোমান্স)

সাধারণত শরদিন্দু জীবনের সত্যসন্ধানে তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতনির্ভর বৃত্তস্তধর্মী প্লটের সাহায্য নিয়েছেন। বলার ভঙ্গিতে সমকালীন সতীর্থদের অপেক্ষা একটু আগের প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র, প্রমথচৌধুরীর মজলিশিভঙ্গিটি স্থায়ী। সংক্ষিপ্ত বাগুনার আশ্রয়ও নিয়েছেন—বিশেষ করে বনফুলধর্মী 'অণু-গল্প'গুলিতে। অপ্রত্যাশিত বৈপরীত্যের চমক এ সব গল্পের সমাপ্তিকে উজ্জ্বল করেছে। যেমন 'শুক্লা একাদশী'-র প্রেমিকা বিনতা গল্প শেষে প্রেমিককে জানায়, "সত্যিই আজ সমস্ত দিন খাইনি। আজ যে একাদশী।" কিংবা 'পতিতার পত্র'-তে স্বাধীনতা সংগ্রামীকে পথভ্রষ্ট করার অভিশাপে পতিতায় পরিণত সুলোচনা বোধহয় স্বাধীন ভারতের সামনেই প্রশ্ন তুলে ধরে—"আমার সর্বনাশ না হলে কি ভারতবর্ষ স্বাধীন হত না?"

একদিকে মজলিশি আমেজ অন্যদিকে সুমার্জিত বাক্য, পরিশীলিত সংলাপ-যোজনায় বৌদ্ধিক দীপ্তি— এ দুয়ের মিলিত প্রয়াসে বাংলা ছোটগল্পে শরদিন্দু একটা বিশেষ স্টাইল তৈরি করে নিয়েছিলেন, যা আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সহজসাধ্য মনে হয়। কিন্তু সেই সাবলীলতার মূলে যে রয়েছে অনেকখানি যত্ন আর অনুশীলন, তদুপরি প্রতিভা, তা বোঝা যায় সাম্প্রতিক ছোটগল্পের আয়াসসাধ্য রূপ দেখলে। এমন মজলিশি বুদ্ধিদীপ্ত স্টাইল বোধহয় আর দু'জনের করায়ত্ত ছিল— রাজশেখর বসু আর সত্যজিৎ রায়ের।

তবে অনুশীলন-চর্চিত বাইরের দীপ্তিটাই শরদিন্দুর গল্পের একমাত্র সম্পদ নয়। শরদিন্দুর বিপুল গল্পসম্ভার যেন হিরে জহরতেপূর্ণ সিন্দুকতুল্য। সব মণিমাণিক্যের তলায় রয়েছে জীবনসত্যের প্রাণতোমরাটি। তার জন্য কৌটোর পর কৌটো খুলে যেতে হয়। গল্পের প্লটের চাকচিক্য উপমার দ্যুতি-বুদ্ধি খচিত বাক্যের, বাগুনার পরতের পর পরত সরিয়ে পাওয়া যায় সেই সত্য দর্শনের হিরের আভা। ১৯৫২-এর একটি চিঠিতে শরদিন্দু লিখেছিলেন :

"আমি যত্ন করিয়া লিখি, লেখাকে চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করি। তাই প্রথম পাঠে বোধহয় লেখার বাহ্য চাকচিক্যটাই চোখে পড়ে, চাকচিক্য ছাড়া তাহাতে যে আর কিছু আছে তাহা কেহ লক্ষ্য করেন না। অনেক পরে আবার লেখাটি পড়িলে তাহার অন্তর্নিহিত বস্তুটি চোখে পড়ে।।"

শতবর্ষ পরে বোধহয় সেই 'অন্তর্নিহিত বস্তুটির' সন্ধান যাত্রা শুরু হয়েছে। □

‘জনান্তর সৌহৃদানি’ : অপ্রাকৃত গল্পের শরদিন্দু

বিষ্ণু বসু

সাহিত্যের তথাকথিত শিষ্ট পাঠকদের কাছে অপ্রাকৃত তথা অতিলৌকিক কাহিনী তেমন কক্ষে পায় না। তা না হলে জন্মশতবার্ষিকী পালনের উন্মাদনার মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অবশ্যই উঠে আসত। একএক সময় মনে হয় গোয়েন্দা ও অতিলৌকিক কল্পকাহিনীকে সার্থকতার চূড়োয় পৌঁছে দিয়েছেন বলেই হয়ত তাঁর লেখা ‘হাসিকান্না’ ‘ভল্লু সর্দার’ ‘আংটি’ প্রভৃতি নানা স্বাদের সমর্থ ও সেরা গল্পগুলোকেও অনেকে অস্বীকার করে চলেন।

আমরা অবশ্য বর্তমান আলোচনায় শরদিন্দু-প্রতিভার ব্যাপক বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করব না। ভাষাশিল্পী হিসাবে তাঁর তুলনারহিত সিদ্ধিকেও আপাতত এড়িয়ে যাওয়া হবে যদিও বাংলাভাষার অনবদ্য স্টাইলিস্টদের অন্যতম তাঁকেই বলা যায়, আমরা এখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব তাঁর অতিলৌকিক গল্পগুলোর উপর।

প্রায় একশো বছর আগে নিউ ইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ বিভাগের তরফ থেকে এক মাসের বেশি সময় ধরে একটি সিমপোসিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে আলোচনা থেকে বেরিয়ে এসেছিল ভূতের গল্পের প্রতি পাঠকদের আন্তরিক আগ্রহের আশ্চর্য বার্তা। জানা গিয়েছিল যত বেশি রোমহর্ষক হাড় কাঁপানো কাহিনী হবে, পাঠক তাকেই পছন্দ করেন তীব্রভাবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে যখন প্রকৃতির বহু রহস্যই ছিল অবগুণ্ঠিত তখন তো বটেই এমনকী আধুনিক বিজ্ঞানের আগ্রাসী অগ্রগমনও অতিলৌকিকের প্রতি পাঠকদের আগ্রহকে বিন্দুমাত্র স্তিমিত করতে সমর্থ হয়নি। তাই গ্রফ কংকলিন ‘দা সুপারন্যাচারাল রিডার : বইটির ভূমিকায় অনায়াসে লিখতে পারেন, Supernatural literature is likely to survive long after reason and scientific knowledge penetrate all corners of the earth : গ্রফ সাহেবের মতে হাইতির মানুষেরা যখন ভুডুতে বিশ্বাস করবে না, আইরিশ কৃষক শুনতে পাবে না বনশি-র চিৎকার, জার্মানরা আস্থা হারাবে পল্টের গেইস্টদের উপর থেকে এবং অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের কাছেও বিশ্বাসযোগ্য থাকবে না তাদের নিজস্ব ভূতপেতনীর দল, তখনও কিন্তু অপ্রতিহত প্রতাপে রাজত্ব করে যাবে এসব নানাশ্রেণীর ভূতপেতনী-সম্বলিত অলৌকিক গল্প। তার উপর সেসব গল্প যদি হয় সাহিত্য, হৃদয়সংবেদী পাঠক তাদের উপভোগ করতে পারেন নিবিড় অনুরাগে, তা হলে তো কথাই নেই। শরদিন্দুর অলৌকিক গল্পও তাই এখনও তৃপ্ত করে চলে পাঠকদের।

আগ্রহী পাঠকের প্রসঙ্গত নিশ্চয়ই মনে পড়বে, শুধু শরদিন্দু কেন, স্বদেশে ও বিদেশে বহু শক্তিমান সাহিত্যিকই নবরসের অন্যতম এ রসটিকে অবহেলা করেননি। আমাদের মনে পড়বে এডগার এলান পো-র ‘দা ব্ল্যাক ক্যাট্’ ‘দা স্ট্রেঞ্জ কেস অব ভ্যালডামার’ও অন্যান্য গল্পের কথা যা বিষয়বিন্যাস ও ভাষার কারুকৃতিতে স্বচ্ছন্দে দখল করে নেয় পাঠকমন। মপাসা-র ‘লা হরলা’ নজর এড়াতে পারে না কারও। ভোলা যায় কি পুশকিনের ‘দ্য কুইন অব স্পেডস’ ও চেকভের ‘ব্ল্যাক মঙ্ক’ নামের গল্প দুটিকে? অনো পরে কা কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, ‘মণিহারা’, ‘নিশীথে’ প্রভৃতি গল্পের শিহরণ মিশ্রিত আবেদন কি পাঠকদের এখনও প্লুত করে তোলে না?

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন এগুলি কি গৃহীত হতে পারে অলৌকিক গল্প হিসাবে? উত্তর হবে — না এবং হ্যাঁ। ‘না’ — কেননা এসব গল্পে বেশির ভাগ সময়ে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার অভিক্ষেপ ঘটেছে কাহিনীর উপর এবং মনস্তত্ত্বের জটিলতম গড়নকেও অলৌকিক বলা যায় না। আবার ‘হ্যাঁ’ — এই কারণে লেখক কাহিনীর চরিত্র ও পরিবেশ নির্মাণে এমন কৌশল নিয়েছেন যাকে দৈনন্দিন চেনা বাস্তবতার সীমায় আটানো যায় না।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রনাথ নাকি একবার প্ল্যানচেটে প্রথাত এক আত্মীয়ের কাছে জানতে চেয়েছিলেন পরলোক জায়গাটা কেমন। তাতে আত্মীয়টি জবাব দিয়েছিলেন যে-অভিজ্ঞতা তিনি মরে গিয়ে লাভ করেছেন তা জীবিতদের তিনি বলবেন কেন? অলৌকিকতার এ আরেক প্রকাশ!

আসলে ভীতি, বিস্ময়, প্রসন্নতা, উচ্চকিত হাসি প্রভৃতি সব ধরনের অনুভূতির বিচিত্র প্রকাশ ঘটতে পারে এ ধরনের গল্পে এবং বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত শরদিন্দুই একমাত্র লেখক যাঁর গল্পসমূহের মধ্যে বিধৃত হয়েছে এমন বহুমুখী ঠিকানা।

গোড়াতেই একটি কথার উল্লেখ করা দরকার। শরদিন্দুর অলৌকিক কাহিনীগুলোর বেশ কয়েকটির মুখ্য চরিত্র হল বরদা। আবার তাঁর গোয়েন্দা ব্যোমকেশও পাঠকদের কাছে পরিচিত। বরদার বলা গল্পগুলো অবশ্য অমূলা বিশ্বাস করে না, এমনকী ‘বহুরূপী’র অভিজ্ঞতার পরেও, কিন্তু তার অনুরাগী শ্রোতার সংখ্যাও কম নয়। বরদা সেই হিসাবে অলৌকিকের কারবারি, ‘যুক্তি’র বাইরেই তার অবস্থান। সে হিসাবে ব্যোমকেশের অবস্থান বিপরীত বিন্দুতে। যুক্তি ছাড়া সে চলেই না। এমনকী শরদিন্দুর দাখিল করা তথ্য থেকে জানা যায় ব্যোমকেশ যুক্তির সাহায্যে মহাকবি কালিদাসকেও চিনে নিতে পেরেছিল অক্লেশে (‘প্রিয়চরিত্র’)। এহেন ব্যোমকেশ ও বরদার মধ্যে টকর হল মূঙ্গের দুর্গের ভেতর একটি বাড়িতে আবির্ভূত এক ভূতকে নিয়ে। ভূতের অস্তিত্ব যখন প্রায় প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে, অবিশ্বাসী অমূল্য পর্যন্ত খানিক দিশেহারা, যাবতীয় যুক্তি যখন ধস্ত হবার পথে, তখন ব্যোমকেশের প্রখর বুদ্ধিই ভূতের রহস্য ভেদ করে আড়ালে অবস্থিত অপরাধীকে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করল (ব্যোমকেশ ও বরদা)। বরদা অবশ্য তাতে দমে না গিয়ে বলল, ‘মৌক্তিক ন গজে গজে’। সব হাতির মাথায় মুক্তা থাকে না এবং অমূল্য এ নিয়ে তাকে ঠাট্টাও করল। কিন্তু এ গল্প পাঠকদের মনে প্রোথিত করল লেখকের পক্ষপাত কোনদিকে। ভূত বা অলৌকিক বা অপ্রাকৃত বলে কিছু নেই, বুদ্ধি খরচ করলেই তার রহস্যভেদ সম্ভব।

অবশ্য এ কথাও ঠিক ‘ব্যোমকেশ ও বরদা’ লিখলেও শরদিন্দু বরদাকে মিথ্যেবাদী ও হাস্যকর করে তোলেননি কখনও। পারিপার্শ্বিকতার গুণে অনেক সময় কঠিন বাস্তবও অপ্রাকৃত অথবা অলৌকিক প্রতীয়মান হতে পারে। রসিক পাঠক চেকভের একটি গল্প প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারেন যেখানে এক ব্যক্তি সন্ধ্যার পর নিজের ব্যাচেলার্স ঘরে ঢুকে দেখে আধো অন্ধকারে একটি বদ্ধ কফিন শায়িত। বিকট ভয়ে প্রতিবেশী বন্ধুর অনুরূপ ঘরে গেল একই ধরনের বদ্ধ কফিন। তার ভয় ক্রমশ বাড়তেই থাকে এবং তা স্বাভাবিকও বটে। এভাবে বেশ কিছু কফিন দর্শনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পরে ভদ্রলোক জানতে পারলেন বিষয়টি মোটেই ভয় পাবার ব্যাপার নয়। তার এক কফিন ব্যবসায়ী বন্ধু পুলিশের তাড়ায় জনাকতক নিকটজনের ঘরে খালি কফিন রেখে গিয়েছিল। চেকভ যেমন ব্ল্যাক মঙ্কের মতো গা শিরশির করা গল্প লিখেছেন তেমনই এমন হাস্যময় পরিণতির গল্পকেও অবহেলা করেননি।

কিন্তু গোগোলের ‘ওভার কোট’ গল্পটিকে আমরা কী বলব? গল্পের উপসংহারে যখন মৃত নায়ক জ্যান্ত মানুষের দেহ থেকে ওভার কোটটি খুলে নেয় তা কি শুধুমাত্র ভূতের গল্প হিসাবে গৃহীত হতে পারে? গোগোলের দৃষ্টিভঙ্গির তির্যকতাই এ পরাবাস্তবতার মধ্য দিয়ে যেন ঘোরতর বাস্তবতা পেয়ে যায়।

॥ ৩ ॥

শরদিন্দুর অপ্রাকৃত গল্পের বেশির ভাগই পাঠক শোনেন বরদার মুখ থেকে। পাঠকের সঙ্গে বিষয়ের একটি দূরত্ব সৃষ্টি করার জন্যই বোধ করি শরদিন্দু সাধারণত এ কৌশলটি নিয়েছেন। প্রত্যক্ষ ঘটনার অভিজ্ঞতার তুলনায় অন্যের বিবৃত কাহিনী পাঠকের মধ্যে বিবিধি নির্মাণ করতে পারে।

অবশ্য বরদাহীন অথবা বরদার বলা নয় এমন গল্পও শরদিন্দু লিখেছেন বেশ কয়েকটি। ‘মরণ ভোমরা’, ‘কালো মোরগ’ প্রভৃতি এ শ্রেণীর গল্প। ‘কালো মোরগ’-কে যদিও যুক্তিবাদী গোকুলবাবুর অবসেসড্ মনের অভিব্যক্তি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ‘মরণ ভোমরা’ সব জাগতিক যুক্তিকেই অগ্রাহ্য করেছে। পুরোপুরি বাস্তব ঘটনা হিসাবে বিবৃত ‘নশ্বদর্পণ’-এ যে ‘অবাস্তবতা’ দেখিয়েছেন লেখক তাকে অবিশ্বাস করাও তো বেশ কঠিন। ‘বহুরূপী’ গল্পে বরদার চেহারা নিয়ে ভদ্র ভূতটি বরদার বন্ধুদের সঙ্গে অত্যন্ত আতিথেয়তাপূর্ণ ভাল ব্যবহার করেও কিন্তু অপ্রাকৃতকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

শরদিন্দু আবার অপ্রাকৃতকে মাত্রাহীনতার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন কখনও কখনও এবং বর্ণনার মুনশিয়ানায় তা অসামান্য স্বাদু গল্প হয়ে উঠেছে। বজ্রপাতের ফলে কোনও মেয়ের অদৃশ্য হয়ে যাবার ঘটনাও তিনি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন কথনের গুণে। ‘আকাশবাণী’ও তো প্রায় একই স্বাদের গল্প। আসলে শরদিন্দুর কাছে ভূত শুধু ভীতিপ্রদ নয়, প্রীতিপ্রদও বটে। ‘ভূত-ভবিষ্যৎ’ গল্পটির কথাই ভাবা যাক। মুচ্ছদ্দির প্রেতাত্মার সাহায্যে গল্পের উত্তমপুরুষটির শুধু অর্থলাভই ঘটল

না, সুন্দরী পত্নীলাভও হল। তাই তার উপলব্ধি 'ভূতের কৃপায় আমার ভবিষ্যৎ এখন খুব উজ্জ্বল।' আবার 'দেখা হবে' 'মধুমালতী' 'সতী' প্রভৃতি গল্পের অলৌকিকতা একটি প্রসন্ন বাতাবরণ তৈরি করে দিয়েছে অনায়াসে। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে স্বামী ভূপতিকে দেওয়া স্ত্রী স্মৃতিকণার 'দেখা হবে' সংলাপের মধ্যে যে একটি স্নিগ্ধ ব্যঞ্জনা দ্যোতিত হয়েছে, বর্ণনার গুণে তা যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে (দেখা হবে)। 'ছোটকর্তা'ও অনুরূপ প্রসন্নতার বাহক। শরদিন্দুর বেশ কিছু 'অপ্রাকৃত' গল্প প্রীতি প্রসন্নতা হাসি ও ভয় মিলিয়ে একটি বিচিত্র 'ককটেল' সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। 'আধিদৈবিক' গল্পে পুলিন্দা (পুলিনদা'র সংক্ষিপ্ত রূপ) 'ধর্ম' মানে হাঁদাকে প্রচুর বকুতা দিয়ে যখন বুঝিয়ে ছেড়েছে 'শরীরই সর্বস্ব' মন-বুদ্ধি আত্মা সমস্তই দেহের বিকারমাত্র, সুতরাং শরীর নাশ হইলে আর কিছুই থাকে না। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনম্ কুতঃ', তখনই পুলিন্দার উপরের খালি গুদামঘরে প্রচণ্ড শব্দ শুরু হল। এ শব্দ কিসের জানতে চাওয়ায় পুলিন দ্বিধাহীনভাবে ভূতকেই এর জন্য অক্লেশে দায়ী করেছে। তা হলে পুলিনদার ভূতের অস্তিত্বহীনতার প্রমাণ আর রইল কোথায়? পুলিনদার অনায়াস উত্তর, 'প্রমাণের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্বন্ধ কি? ভূত আছে এটা ন্যায়শাস্ত্রমতে প্রমাণ করা যায় না। তাই বলে বিশ্বাস করব না? ...যুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই।'

শরদিন্দুই কি এ স্মিত সংলাপের বক্তা? তাই কি তিনি গল্পটির উপসংহার ঘটান এভাবে—'উপরে ভূতের নৃত্য চলিতে লাগিল। আমি চলিয়া আসিলাম।'

প্রমাণ ও বিশ্বাসের এ দ্বন্দ্বদীর্ণ বাতাবরণে যখন শরদিন্দু লেখেন 'নীলকর' অথবা 'প্রতিধ্বনি'-র মতো গল্প তা পাঠকের মনে একটি ভিন্নতর মাত্রার সংযোজন ঘটায়। নীলকর সাহেবের অশ্লীল প্রেতাত্মা যখন কবুতরীর উপর যৌন অত্যাচার চালায় তার যাবতীয় অসত্যতাকে অতিক্রম করে চকিতে একটি সত্যকে প্রকাশ করে যা আমাদের ঔপনিবেশিক ইতিহাসে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। নীলকর সাহেবদের অকথ্য নির্মম অত্যাচারের স্বরূপ কী ছিল তা মুহূর্তের মধ্যে যেন একটি শরীরী তাৎপর্য পেয়ে যায়। 'অশরীরীর' মধ্য দিয়ে শরীরী এ সত্যকে তখন আর অলৌকিক বা অপ্রাকৃত মনে হয় না। বিশ্বাস ও প্রমাণ যেন একই সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

'দেহান্তর' গল্পটির মধ্যে আবার শরদিন্দু ভিন্নতর অভিক্ষেপ ঘটান। প্রমথ বিধবা মিসেস সাবিত্রী দাসকে লাগামছাড়া ভালবাসে। বরদা ভারতের শৈলাবাসে শ্যালকের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে প্রমথ ও সাবিত্রীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। প্রমথ শৈলাবাসে বাস করলেও সাবিত্রী থাকত নির্জনতর স্থানে, শহর থেকে খানিক দূরে 'হর জটা'য়। সাবিত্রীর বাড়িতেই ঘটল অলৌকিক ঘটনাটি যখন প্ল্যানচেটে মৃত স্বামী মি. দাস আবির্ভূত হয়ে প্রমথর প্রতি সাবিত্রীর ভীত নিরুচ্চার অনুরাগকে ধস্ত করে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'তুমি আবার বিয়ে করতে চাও? দেব না—দেব না—তুমি আমার—'

স্বভাবতই ঘরের মধ্যে আলোড়ন পড়ে গেল—শারীরিক ও মানসিক। ব্যাপারটি বিশেষ জটিল হয়ে দাঁড়াল কেননা মি. দাসের প্রেতাত্মা আবির্ভূত হয়েছিল প্রমথর দেহের মধ্যে। অতঃপর গল্পের অন্তিমে জানা গেল প্রেতাত্মার তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও অচিরেই প্রমথ ও সাবিত্রীর বিবাহ হয়েছিল কিন্তু 'এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রমথর চেহারা নাকি অনেকখানি বদলে গেছে; সকলেই বলছে, তার চেহারা ক্রমশ গতাসু মিস্টার দাসের মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমনকি তার চিবুকের মাঝখানে একটা খাঁজ দেখা দিয়েছে—।' এ ধরনের খাঁজ মি. দাসের চিবুকে ছিল।

এ গল্পকে কী বলব? অলৌকিক না মনস্তাত্ত্বিক? প্রমথর উপর গতাসু মিস্টার দাসের আত্মার ভর হয়েছিল, না কি প্রমথর নিপীড়িত লিবিডো নিজের উপর অভিক্ষেপ ঘটায় তাকে মিস্টার দাসের চেহারায় পরিণত করেছিল। প্রমথ হয়ত অবচেতনায় জানত সাবিত্রী তাকে বিয়ে করলেও নিবিড় প্রেম তখনও অবলম্বন করে আছে মৃত স্বামীর স্মৃতিতে। তাই প্রমথ শুধু শরীর দিয়ে সাবিত্রীকে অধিকার করতে চায়নি। সত্তার গহনে তীব্র ভাঙচুর চালিয়ে নিজের উপর গতাসু মিস্টার দাসকে আরোপ করেছে। তাই গল্পটি আর শুধু 'দেহান্তর' হয়ে থাকেনি, গভীর 'মননান্তর'-ও হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাইরের অবয়বের উপর স্বচ্ছার এ অভিক্ষেপ অনেক সময়েই পরিচিত বাস্তবকে ভেদ করে কিছু অলৌকিক বাতাবরণ নির্মাণ করে নিতে পারে। তখন তাকে আর 'ভূতের গল্পো' বলে অবহেলা করা কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টিপাত রসবোধহীনতারই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। কেউ যদি মার্কেসের 'নাইট অব দ্য কারলিউস' অথবা অনুরূপ অন্য কোনও গল্পকে তথাকথিত অপ্রাকৃত বলে অপাঙক্তেয় করে রাখেন তাহলে তিনি পাঠক হিসাবে নিজের উপর অবিচার করেন না কি?

শরদিন্দুর প্রতি অমনোযোগও তাই অবিচারেরই নামান্তর। □

শিশু-সাহিত্যে শরদিন্দু

অশোককুমার মিত্র

আনন্দবাজার পত্রিকায় শব্দছক মেলাতে মেলাতে আটকে গিয়ে পুত্র এসে জিজ্ঞাসা করল, কাঁঠাল শব্দের সমার্থক তিন অক্ষরের একটা শব্দ বলো তো। হঠাৎই আমার 'পনস' শব্দটি মনে এল। সদাশৈবের আদিকাণ্ডে পড়েছিলাম, গ্রামের প্রান্তে ছোট্ট পাহাড়ি নদী, গ্রীষ্মের তাপে প্রায় শুকিয়ে এসেছে; তীরে ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল। একটা পনস গাছ নিঃঝুমভাবে দাঁড়িয়ে আছে, গাছে একটিও ফল নেই, ইঁচড় অবস্থাতেই গাঁয়ের লোক পেড়ে নিয়ে গেছে।

তখনও পনস শব্দটি আমার পরিচিত শব্দমালায় ছিল না—অভিধান থেকে অর্থ জেনে নিয়েছিলাম। শুধু পনস নয়, অনেক শব্দই জেনেছি তাঁর লেখা পড়তে গিয়ে, আর আমার শব্দের ভাণ্ডার পুষ্ট হয়েছে। এই সব নতুন শব্দের প্রয়োগ নয় সুপ্রয়োগও বটে। উল্লেখিত অংশে কাঁঠাল শব্দের বিকল্প পনস-এর প্রয়োগ কতখানি যথার্থ তা বিবেচনা করা যেতে পারে। শরদিন্দু তাঁর লেখায় তৎসম শব্দের ব্যবহারে অকুণ্ঠ—অথচ সেই সঙ্গে চলিত ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করে ভাষাকে চমৎকার স্বাদু করে তুলেছেন। সুকুমার সেন লিখেছেন: শরদিন্দুবাবুর গল্পের গুণ বহুগুণিত করেছে তাঁর ভাষা। কাহিনীকে ভাসিয়ে তাঁর ভাষা যেন তরতর করে বয়ে গেছে, সমাপ্তির সাগরসঙ্গমে। সে ভাষা সাধু না চলিত বলা মুশকিল। বলতে পারি সাধু-চলিত কিংবা চলিত-সাধু। শরদিন্দুবাবুর স্টাইল তাঁর নিজেরই—স্বচ্ছ, পরিমিত, অনায়াসসুন্দর।

ছোটদের জন্য লেখার ক্ষেত্রেও তিনি মূলত একই রীতি অনুসরণ করেছেন, ফলে তাঁর লেখা সুন্দর গতি পেয়েছে। সুকুমার সেনের মতোই বাংলা সাহিত্যের দিকপাল সাহিত্যিক রাজশেখর বসু (পরশুরাম) একখানি পত্রে লেখককে লিখেছিলেন— বিশুদ্ধ বাঙলা লিখতে পারেন এমন লেখক আজকাল বিরল হয়ে পড়েছেন। আপনি ভাষার উচ্চ আদর্শ বজায় রেখেছেন।

সন্দেহ নেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার অন্যতম শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে চলচ্চিত্রের ডাকে বোম্বাই পাড়ি সাহিত্যজগতে তাঁর পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আমন্ত্রণ প্রথম এসেছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি সাহিত্যের মূলস্রোত থেকে সরে গিয়ে চলচ্চিত্র জগতে যাবার লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তা গ্রহণ করে বোম্বাই যাত্রা করেন। সেখানে চৌদ্দ বছর কাটিয়ে শেষে পুণায় স্থায়ী আস্তানা গাড়েন এবং সাহিত্যের মূল স্রোতে ফিরে আসেন। তবু সৃষ্টিশীলতার প্রধান সময়টিতে তাঁর অন্তর্ধানে অবশ্যই বাংলাসাহিত্য প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শরদিন্দু রচিত ছোটদের উপযোগী লেখা সংখ্যার দিক থেকে অপর্যাপ্ত নয়; তিনি ছোটদের জন্য কোনও উপন্যাস রচনা করেননি। গল্পের সংখ্যাও কিঞ্চিতধিক ত্রিশ। ছড়া কবিতা রচনায় তাঁর অনবদ্যকার্য ক্ষমতা অথচ সেখানেও তিনি কৃপণের মতো সামান্য কিছু দান করেছেন। তিনি বহুপ্রজ হলে বাংলা ছড়া সাহিত্য যে কত সমৃদ্ধ হত তা তাঁর লেখা একটি নিটোল ছড়ার উদ্ধৃতি দিয়েই প্রমাণ করা চলে:

শিল্পীর শিরে পিলপিল করে
আইডিয়া
লেখেন যখন পুস্তক তিনি
তাই দিয়া
উইপোকা কয় চল এইবার
খাই গিয়া!

সংখ্যার মাপকাঠিতে ন্যূন হলেও ছড়ার মতোই শরদিন্দুর লেখা ছোটদের উপযোগী গল্পগুলির অধিকাংশই মানের বিচারে যথেষ্ট উন্নত শ্রেণীর। বিচিত্র স্বাদের গল্প সে-সব। ইতিহাস আশ্রিত লেখায় তাঁর দক্ষতা সহজাত। অবশ্য তিনি পরিশ্রমী লেখক। তিনি মনে করতেন, যে যে বিষয়ে লিখতে হবে সে বিষয়টি যেন লেখক আগেই গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়ে নেয়, আন্দাজে যেন কিছু না লেখে। পাঠকের বুদ্ধি-জ্ঞান ও রসবোধের ওপর শ্রদ্ধা রাখা উচিত। যা হোক আন্দাজে লিখে দেওয়া উচিত নয়। তা হলে পরে পস্তাতে হবে। এই আদর্শটি তিনি সারাজীবন রক্ষা করে গেছেন। ফলে তাঁর লেখাগুলি এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক গল্প লেখার সময়ে সর্বদা

তাঁর লক্ষ্য কীভাবে সেই যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায়। যে সময়ের গল্প বলেছেন তখনকার রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, অস্ত্র-পোশাক, আহার-বাড়িঘর খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে লেখা শুরু করা। বড়দের জন্য লেখা গৌড়মল্লার, চুয়াচন্দন, তুঙ্গভদ্রার তীরে লিখে যেমন তৃপ্তি পেয়েছিলেন, নিশ্চয়ই তেমনই তৃপ্তি পেয়েছিলেন ছোটদের জন্য সদাশিব পর্বের গল্পগুলো লিখে। তেমনই অনায়াস দক্ষতায় লিখেছেন ঝিলমনদীর তীরে, বীর্যশুল্কা, ময়ূরকূট ইত্যাদি অসাধারণ গল্প। রূপকথার গল্পের মধ্যে আছে আঙুর পরী, ডালিম পরী, পান্নাদিঘির জোড়ারুই, শিকারকাহিনী উভয় সঙ্কট, পিন্টু, আর হাসির গল্প টিকিমেধ, জেনারেল ন্যাপলা, স্বামী চপেটানন্দ ইত্যাদি। ভৌতিক গল্প মোক্তার ভূত, অন্ধকারে, প্রাণী জগতের গল্প পুষি-ভুলোর বনবাস, সামাজিক গল্প বিনুর জলপানি।

ছোটদের জন্য গল্প লেখা সম্পর্কে শরদিন্দু লিখেছেন, গল্প সকলে বলতে পারে না, বিশেষত শিশুদের গল্প। যাঁরা বয়সে বড় হয়েও নিজেদের শৈশবকাল ভুলে যাননি তাঁরাই শিশুদের গল্প বলতে পারেন। তাঁরা জানেন শিশুদের মন কী চায়, কিসে আনন্দ পায়।

শিশুরা যখন একটু বড় হয়ে কৈশোরে পদার্পণ করে তখন তাদের গল্পের চাহিদা বদলে যায়। বাঘ-ভালুক, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি, বুদ্ধুভুতুমের গল্পে মন ভরে না। তারা চায় অ্যাডভেঞ্চার, বিজ্ঞান-বিচিত্র কাহিনী, নতুনত্বের স্বাদ, রোমাঞ্চের গন্ধ।

এই প্রেক্ষাপট বদলের বিষয়টিও তাঁর চেতনায় বিশেষরূপে জাগরূক ছিল। তিনি শিশুদের জন্য যেমন রূপকথা লিখতে ভোলেননি, তেমনই কিশোর বয়স্ক পাঠকের জন্য অ্যাডভেঞ্চারের গল্প 'ভূমিকম্পের পটভূমি' লিখেছেন নিবিড় ভালবাসায়।

আমরা পূর্বে পিন্টু গল্পটিকে শিকারশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেছি, কিন্তু এটি কি শুধুই শিকারের গল্প, না কি শিকারযাত্রার ক্যানভাসে আঁকা পালিত কুকুরের মহান আত্মদানের এক অনাস্বাদিত কাহিনী। এর অতিপ্রাকৃতিক পরিবেশ গল্পটিকে যে মাত্রা দিয়েছে তার তুলনা বাংলাসাহিত্যে বড় বেশি নেই। পিন্টু এক কুকুরের নাম — সে ছিল গল্পকারের শিকার-সঙ্গী। সঙ্গী বটে কিন্তু পিন্টু খুব সাহসী কুকুর ছিল না; ভিনপাড়া দিয়ে যাবার সময় তার ল্যাজটি অলক্ষিতে পিছনের পা দুটির ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করত, আর পাড়ার কুকুরগুলো যখন ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসত তখন সে কেবলই শিকারির পাশে ঘেঁষে ঘেঁষে আসত আর গলার মধ্যে গরর গরর শব্দ করত। অবশ্য তার একটি অসাধারণ গুণ ছিল; সে খুব ভাল মরাপাখি উদ্ধার করতে পারত। গুলি খেয়ে উড়ন্ত পাখি জলে-স্থলে কিংবা পাঁকের মধ্যে যেখানেই পড়ুক পিন্টু ঠিক তাকে মুখে করে নিয়ে আসবে। এমনই একবার শিকারির গুলি খেয়ে পাখি পড়েছে এক ঝোপের মধ্যে। তা দেখে পিন্টু ছুটে গেল সেখানে, তারপরে চোঁ চোঁ করে পালিয়ে এসে শিকারির জুতোর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে পড়ল। এমন তো সে করে না। শিকারি অগ্রসর হয়ে দেখে ঝোপের মধ্যে মরা পাখিটার ওপর ঝুঁকে আগলে রয়েছে সাদা কাপড় পরা একটি স্ত্রীলোক। তখনই বুকফাটা কান্না ভেসে এল — আহা-হা-হা-হা। হঠাৎ নারীমূর্তি উঠে পড়ে হাত তুলে শিকারিকে ডাকল। সেও কলের পুতুলের মতো তার পিছু পিছু চলল। পিন্টু তাকে বারবার বাধা দিচ্ছে, পায়ের মাংস কামড়ে ধরছে, তবু শিকারি তা অগ্রাহ্য করে নিশ্চিত নিয়তির পানে ছুটছে। শেষে তাকে অতিক্রম করে পিন্টু হিংস্রভাবে সেই ছায়ামূর্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কম্পিত আর্তচিৎকার পিন্টুর কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল, আর ছায়ামূর্তিটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পিন্টু শিকারির জীবন বাঁচিয়ে দিল। ভীরু পিন্টু জীবনের শেষ অঙ্কে অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছে। এমন অলৌকিক অতিপ্রাকৃত বর্ণনায় শরদিন্দু সিদ্ধহস্ত। এ গল্প পড়ার সময়ে প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চিত হতে হয়।

ডিটেকটিভ গল্পে শরদিন্দু বাংলা সাহিত্যে সেরা লেখক: তাঁর সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর জুড়ি আর নেই। কিন্তু সে তো বড়দের এলাকা। ছোটদের জন্যও শরদিন্দু চমৎকার রহস্যভেদের আখ্যান লিখেছেন — সাপের হাঁচি। এখানে রহস্যভেদী এক কিশোর। সে মামার বাড়িতে বেড়াতে এসে দেখে সে-বাড়িতে সিঁদেল চুরি হয়েছে। অমন নিপুণ চুরি করতে একজনই পারে, কিন্তু তাকে ধরার উপায় নেই। হাতে নাতে ধরতে পারেনি কেউ, আর চোরাই মালও লোপাট। তাই চোর ধরতে সবাই নাকাল, এমনকী থানার দারোগাবাবুও। শেষ পর্যন্ত রহস্যভেদ করে চোরাইমাল উদ্ধার করে চোরকে ধরে দিল সেই কিশোর সুকান্ত।

ছোটদের জন্য প্রথম যে গল্পটি তিনি লিখেছিলেন সেটি একটি ভূতের গল্প। যদিও ভূতের গল্প সম্বন্ধে শরদিন্দুর একটু দুর্বলতা ছিল — সেকথা তিনি অপকটে স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন: বরদা চরিত্র কাল্পনিক। নতুন কোনও আইডিয়া না পেলে ভৌতিক গল্প আর লিখব না। আসলে বরদা আমাকে ছেড়ে গেছে, আমি বরদাকে ছাড়িনি। অবশ্য বরদার গল্প বড়দের জন্য লেখা অতিপ্রাকৃত জগতের গল্প। কিন্তু ছোটদের জন্য প্রথম লেখা গল্প মোক্তারভূতে অলৌকিক ভয়ানক রসের চেয়ে হাস্যরসের প্রাবল্য বেশি। শিবু আর বেণী দুই বন্ধু, দু'জনের পেশা মোক্তারি। দু'জনেই যেমন ধড়িবাজ তেমনই ধূর্ত। মক্কেল ঠকিয়ে দু'জনেই দু'পয়সার মুখ দেখেছে। শিবু ফন্দি করল বেণীকে ঠকাবে। সে বেণীর কাছে জরুরি প্রয়োজনে পঞ্চাশ টাকা ধার চাইল পরের দিনে ফেরত দেবার কড়ারে। বন্ধুর

বিপদে বেণী তাকে টাকাটা দিল কোনও হ্যান্ডনোট না রেখে। ব্যস, শিবুর পাতা ফাঁদে পড়ে গেল সে। শিবু ঋণের কথা সোজাসুজি অস্বীকার করল। বেণী আর লোকসমাজে বলতে পারে না নিজের বেয়াকুবির কথা। টাকা তো গেল, মানও বুঝি যায়। তা বেণী একদিন মরল। তাকে নিয়ে শ্মশানে শিবুও এল। ছেলেছোকরার দল তাকে মড়ার কাছে রেখে কাঠের সন্ধানে বেরুল। শিবু মনে মনে ভাবছে বেণীকে কী ঠকান-ই না ঠকানো গেছে। হঠাৎ পিছন থেকে এক চড় খেয়ে শিবু কুপোকাত। উঠে বসে দেখে কেউ কোথাও নেই, কিছুক্ষণ পরে মড়াটা একটা পা তুলে ক্যাঁৎ করে একটা লাথি কষাল। তারপরে তাকে জাপটে ধরে ঋণের টাকাটা উসুল করে শিবুর সম্মান একেবারে ধুলোয় লুটিয়ে দিল।

সামাজিক গল্পও লিখেছেন শরদিন্দু। বিনুর জলপানি গল্পটি সামাজিক গল্পের চলতি রীতিকে অনুসরণ করেনি। এর নির্মাণে সদাশিবের আদিকাণ্ড গল্পের সামান্য আভাস মেলে। অর্থের অভাবে বিনুর মতো মেধাবী ছাত্রের ছাত্রজীবনে ইতি ঘটে যাচ্ছিল। তার বাবা পড়াতে চায় না, পরন্তু তার ব্যবহারে জমিদারবাবুও বিরক্ত — বাবার দোষে বিনুও জমিদারবাবুর সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত। তাই মনের শোকে সে বিবাগী হয়ে গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে গিয়েছিল; আর কী আশ্চর্য যোগাযোগে ও কৌশলে লুঠ করা সব সম্পদ উদ্ধার করে ডাকাতদের ধরিয়ে দিয়ে সকলের, বিশেষত জমিদারবাবুর মন জয় করে নিল সেই কাহিনী পড়লে মুগ্ধতা আসে।

অ্যাডভেঞ্চারের গল্প লিখেছেন 'ভূমিকম্পের পটভূমি' — সেটাও ব্যতিক্রমী রচনা। এখানে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীর সঙ্গে কি রূপকথার মিশ্রণ ঘটেনি? তিতি বা খিট্রা কি বাস্তব জগতের প্রাণী? কল্পলোক থেকে এদের আমদানি করে শরদিন্দু বাংলা কিশোরসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আবার আদ্যন্ত রূপকথার গল্পও তাঁর হাতে চমৎকার লেখা হয়েছে, যেমন — আঙুর পরী ডালিম পরী। রূপকথার কাব্যিক জগতের মোহময় ভাষায় লেখা লোভ-হিংসা-ষড়যন্ত্র-অনুতাপ-প্রায়শ্চিত্ত ও রাজকুমারীদের পুনর্জন্ম-মিলন-বিবাহ একেবারে পারফেক্ট ফর্মের রূপকথা।

ইতিহাস-আশ্রিত গল্পে তাঁর নৈপুণ্যের কথা আগেই বলেছি। তিনি প্রতিটি গল্পের প্রেক্ষাপট রচনায় কতখানি যত্নবান, নিখুঁত পরিবেশ রচনার জন্য তাঁকে তৎকালীন ইতিহাস, সামাজিক অবস্থান খুব গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হয়। তাই ইতিহাসের চরিত্রগুলির সঙ্গে গোটা পরিবেশটাও জীবন্ত হয়ে ওঠে। শিবাজির কালের গোটা মহারাষ্ট্রে মোগলসেনার আক্রমণ, বিজাপুরের আদিলশাহি শাসনকর্তার দৌরাত্ম্য ও শিবাজির অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম — এই ত্রিমুখী চাপে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী। সে নৈরাজ্যের এক ভয়ঙ্কর দিন। সদাশিবের গল্পে বর্ণিত একখানি গ্রামের ছবি: উপত্যকায় নেমে এসে সদাশিব কিন্তু জনমানুষ দেখতে পেল না। আগে এখানে গ্রাম ছিল, এখনও নদীর পাড়ে ছাইয়ের একটা চক্র তার সাক্ষ্য দিচ্ছে; গ্রামবাসীরা শত্রুর আক্রমণে মরেছে — যারা পেরেছে পালিয়েছে। শত্রু গ্রাম লুঠ করে ঘরে আগুন দিয়ে পালিয়ে গেছে।

তখন সামাজিক বা প্রশাসনিক নিরাপত্তার কোনও প্রশ্ন নেই। ভস্মশেষ পরিচয় বহন করে সদ্যলুপ্ত জনপদের। চানক্য চন্দ্রগুপ্ত-আলেকজান্ডারের গল্প ঝিলম নদীর তীরে। মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠার গল্পে একদিকে যেমন ভারতের রাজনৈতিক চিত্রখানি অঙ্কিত হয়েছে অন্যদিকে আবার পরিস্ফুট হয়েছে উল্লেখিত মানুষগুলির মৌল চরিত্রও।

কৃষ্ণ যে গল্পের প্রধান চরিত্র যেখানে ভূমিকায় বলা হয়েছে কৃষ্ণ তখনও মানুষ, লোকোত্তর অবতারে পরিণত হননি — তিনি শুধু যাদব গোষ্ঠীর নেতা। সেই ঐতিহাসিক চরিত্রের কৃষ্ণ নামক মানুষটির কাহিনী স্যমন্তক মণি। এ গল্পে নেতা কৃষ্ণের চরিত্রের দার্ঢ্য ও অনার্য-রাজা জাম্ববানের সারল্য ও চরিত্র মাধুর্য আমাদের মোহিত করে। স্যমন্তক মণির মূল্য সে বোঝে না ঠিকই, কিন্তু ওই মণির প্রতি কৃষ্ণের অস্বাভাবিক আগ্রহ তার মনে কোনও কৌতূহল সৃষ্টি করে না, কোনও নাফার দিকে তাকে ঠেলে দেয় না। বরং কৃষ্ণের প্রস্তাবে সে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পরাক্রমে না হলেও আর্য কৃষ্ণের কূটকৌশলে সে পরাজিত হয়।

জীবজগতের গল্প বাংলাভাষায় খুব বেশি লেখা হয়নি, শরদিন্দু তাঁর স্বল্প সংখ্যক লেখার মধ্যেও পুষি-ভুলোর বনবাসের মতো উচ্চশ্রেণীর গল্প উপহার দিয়েছেন। গ্রামের গৃহস্থ বাড়ির ঘেরাটোপ ছেড়ে তারা গভীর জঙ্গলে চলে গিয়েছিল। তারা সেই বনে ভল্লুক, খরগোস, টিকটিকি, ব্যাং, বাঘ, শেয়াল, অজগর, হনুমানের মুখোমুখি হয়ে কীভাবে নাকাল হয়েছিল, টিয়াপাখির পরামর্শ তাদের কীভাবে সাহায্য করেছিল সেই আখ্যান অত্যন্ত নিপুণভাবে লিখেছেন শরদিন্দু।

এতদসত্ত্বেও বলতে হয় শরদিন্দুর স্ফূর্তি হাস্যরস পরিবেশনে। পরিপাটি হাস্যরসের গল্প ছাড়াও অন্য ধরনের গল্পেও সুযোগ মতোই তিনি হাস্যরসের জোগান দিয়েছেন, সে ভূতের গল্পই হোক, ডাকাতির গল্পই হোক, রহস্য গল্পই হোক বা তাঁর প্রিয় ইতিহাসের গল্পই হোক।

তাঁর সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক আমাদের মনে হয়েছে ছোটদের জন্য লেখায় যদি তিনি আরও একটু অকৃপণ হতেন তা হলে বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগটি নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধতর হত। সদাশিব সিরিজের তুলনা তো আর নেই। চোখ বুজলেই দেখতে পাই পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গিরিবর্ত্ম বেয়ে ছুটছে ঘোড়সওয়ার, পাহাড়ে শব্দ উঠছে খট্ খট্ খট্ খট্..... □

পিপাসা

উৎপলকুমার বসু

সেদিন রেখেছি জল স্থির এক মৃৎপাত্রে — ঢাকা দিয়ে,
জানলার কাছাকাছি — কিন্তু পৃথিবী ঘোরে — জাগতিক
চঞ্চলতা তাকেও স্পর্শ করে — অর্থাৎ সামান্য ওই পেয় পদার্থকে —
তাকে উত্তেজিত করে — পশ্চিমে, শীতের রাত্রে টেনে নিয়ে
যায় — শৈত্যে শীতল সে-জলটুকু, প্রাণোপম, হাঁড়ি ভেঙে
মেঝেয় লুটিয়ে গেল — তরঙ্গ বুঝি-বা — মৃতের
মাদুর যেন — সহসা গ্রীষ্ম এসেছে ফিরে — আমার
অমীমাংসিত তৃষ্ণা কবে আর মিটবে কে জানে।

সমস্তদিন

প্রমোদ বসু

কেউই কারওর শত্রু তো নয়, মিথ্যা খেলা, মিথ্যা খেলা!
বুকের অসুর
লাফিয়ে ওঠে, ঝাঁপিয়ে নামে, কুপিয়ে মারে দিনের বেলা,
রাতেও তেমন।
আমরা তাকে দোষ দিই না, দোষী করি মানুষটাকেই!
কিন্তু অসুর
তখনও তার বুকের ভেতর ঝাপটা মেরে শাসায় তাকেই
এবং আবার
সে-ই তো পাপের মশাল জ্বালে, আগুন ফোটে দিগ্বিদিকে! —

এই নিরিখে
কেউই কারওর শত্রু তো নয়, শত্রুতারই সবাই এখন,

সমস্তদিন, সমস্তক্ষণ।

জাগো

নির্মল বসাক

জেগে উঠতে চেয়েও দেখি পিছিয়ে যাচ্ছে পা
গোলাপ নয়, পদ্ম না, জীবন ধুতুরা
তোমায় জাগায়; তোমাকে ছোটায় বনের কাঁটা
পঞ্চশরের মাথায় রাখে উলঙ্গ ওই পা টা।

ঘুম কেটে যায়, স্বপ্ন কাটে, রুদ্ধ সন্ধ্যাযামে
ভালবাসায় পূর্ণ হয়েও শূন্য হচ্ছ কামে
সরিয়ে দাও, পিছিয়ে নাও বিছিয়ে দাও পা
ঘুম কেটে যায়, স্বপ্ন কাটে, ঘোর যে কাটে না!

নির্দ্বিধায়

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

আজ তোমাদের বলতে দ্বিধা নেই
আমাকে একজন
প্রতিটি দুরূহ বাঁকে হাত ধরেছিল
আমি তার মন
না ছুঁয়ে অক্লেশে দিব্যি পেরিয়ে গিয়েছি
আজ চরাচরে
স্বপ্নের মতন তাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে
বাইরে, ফিরে ঘরে
আজ কৃতজ্ঞতা যদি আপনের ভাষা
না জানি তা হলে
সম্পূর্ণ নিজস্ব এই মুগ্ধ সমর্পণ
তুলে নাও জলে
আকাশে মাটিতে শব্দে ফেনায় বিবৃত
ঘাসের মাথায়
তুমি তুলে তুলে নাও আমি দেখি তোমাকে কেবল
অরূপ কথায়
দেখি এ গোধূলিগোলা সমূহ সংসারে
স্বতন্ত্র পুরাণে
প্রপন্নার্তি জুড়ে নিঃস্ব বিশ্বময়
অফুরন্ত প্রাণে
আজ নিঃসঙ্কোচে বলি কলঙ্কশীলিত
সমস্ত উদ্বেগ
তুমি সারারাত নিজহাতে মুছে ভাসিয়ে দিয়েছ
আশ্বিনের মেঘ
কিছু জনপদলগ্ন কিংবদন্তি ব্রতের কাহিনী
আনাচে কানাচে
অন্তরঙ্গ বাথা হয়ে ফুটে আছে আমাদের
যৌবনের কাছে।

নির্মলা

মন্দার মুখোপাধ্যায়

সে অভিশাপ দগ্ধক্ষত
সে অভিশাপ সিমলা
প্রতিটি হাত পাথর মারা
প্রতিটি চোখ নির্বোধ
দেহে যখন ছুরিকাঘাত
অতর্কিত কব্জি
রক্তবীজে নিপাট মেয়ে
ভালবাসায় জঙ্গি
গোঠের বেনু কৃষ্ণ শোনায়
রাধিকাপ্রাণ উৎস
ঘাতকদল অনেক বাঁচে
চুলোয় দেহ চিহ্ন
জলাঞ্জলি নিষেধ বোঝা
যমুনা বয় এই স্বর
বেহাত প্রাণ দেহাতি মেয়ে
কলঙ্কিত ঈশ্বর॥

সংবেদের নীল

সুকুমার চৌধুরী

আহত হই। আহত হতে থাকি।
আর কিছু দিয়েছে কি সংবেদন?

এত যে আঘাত এত ক্ষত
এত যে দহন এত খুন

থিতানো বারুদগুলি ভিজে ওঠে
স্ফুলিঙ্গবিহীন

শুধু একটি অঙ্গারগন্ধ
ধরে রাখে শীর্ণ অভিমান

এইসব অভিমান থেকে
কোনও যুদ্ধ নেই

যুদ্ধবিহীন কোনও উত্তরন
এখনও সুদূর

বাতাসে ছড়িয়ে যায় বিষ
আকাশে ছড়িয়ে যায় অভিমান

সমূহ যাপন জুড়ে
সংবেদের নীল

আহত হই
আহত হতে থাকি

অপাপবিদ্ধ

শেখর আহমেদ

আমাকে কিছুটা অপাপবিদ্ধ বাতাস দাও
আমার ফুসফুস আর কিছু নিতে পারছে না—
প্রতিবিম্ব কথা কইল, অপাপবিদ্ধ বাতাসে
আগুন থাকে, যা কেবল অগ্নিরই সেবার্থে
তুমি অন্য কিছু চাও
সে তখন দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল,
তবে ভালবাসা দাও

ভালবাসার আগুনে পুড়তে পুড়তে
তার দগ্ধমান হাতে ভরে গেল ফুল
ধূমায়িত ফুসফুসে বয়ে গেল বসন্ত-বাতাস
সে বলল, আমার আর কোনও কষ্ট নেই
এখন নিজেই আমি অপাপবিদ্ধ বায়ু
হে অগ্নি আমাকে নাও

সাক্ষাৎকার

সুচন্দ্রনাথ দাস

ধুলো পথে আবির উড়িয়ে
হেঁটে যাচ্ছে মমতার মূর্তি মানুষগুলি...
আমি এভাবেই গ্রহণ করি পৃথিবীর সাক্ষাৎকার,
আগুনের ভিতরে সংরক্ষিত আছে অপার্থিব আলো।

অন্য কোথাও নয়, এইখানে মাটি-জলে
ভাল-মন্দে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জীবনের স্বপ্ন-সত্য মেশামেশি,
অশ্রুমাখা প্রেম....চন্দন, চন্দন
অন্ধকারের উপর দিয়ে দিগন্তে মিশেছে আলোর সেতু।

সোনার মুকুট আর পালকের টুপি একই রোদে ঝলমল,
শিশিরে মুখ মুছে সফল করি প্রীতি সম্মেলন।
কেউ কারওর করুণাপ্রার্থী নয়, ঘামের অনুপাতে স্বপ্নপসা
সুন্দর তার জ্যোৎস্নাপরীর হৃদয়-বৃত্তে ডালে।

পাখিরা নির্ভয়ে হাত থেকে তুলে নেয় সাদা খই
উঠোনে-দালানে ছড়িয়ে যায় দিগন্তের আলো
সন্ধ্যায় মুখ দেখাদেখি করে নক্ষত্র আর আকাশপ্রদীপ,
আমি এভাবেই গ্রহণ করি পৃথিবীর সাক্ষাৎকার।

ধারাবাহিক সন্দর্ভ

বঙ্গসংহার এবং

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অবশেষে ফজলুল হকসাহেব একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গড়ার জন্য মুসলিম লিগের সমর্থন চাইলেন। মুসলিম লিগ সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হল। হকসাহেব বাংলা প্রদেশের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (তখন ইংরেজিতে বলা হত 'প্রিমিয়ার' যার বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছিল 'প্রধানমন্ত্রী')। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার এক বছরের মধ্যেই বাংলার কৃষকদের ও ছোট জমির মালিকদের বড় জমিদার এবং সুদখোর ও খাতকদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, মানি লেন্ডারস অ্যাক্ট ও ঋণ সালিশি বোর্ড আইন পাশ করালেন। এই তিনটি আইন বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির ইতিহাসে আবুল কাশেম ফজলুল হককে 'হকসাহেব' বলে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর জনপ্রিয়তা বাংলার রাজনীতিতে তখন তুঙ্গে। কিন্তু মুসলিম লিগ যে ধরনের ধর্মীয় সংকীর্ণ মানসিকতার সরকার চেয়েছিল হকসাহেব তাদের সে আশায় জল ঢেলেছিলেন। বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের যে যুক্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল শত শত বছর ধরে হকসাহেব সেই মিশ্র সমাজকেই ধরে রাখলেন। মুসলিম লিগ নেতাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ তো ছিলই। তার উপর তাঁর উদার প্রশাসনিক নীতি সম্পর্ককে তিক্ত থেকে তিক্ততর করে তুলল। শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায়, নলিনাক্ষ সান্যাল প্রভৃতি কংগ্রেস নেতা এবং হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ককে কটাক্ষ করে মুসলিম লিগ নেতারা প্রকাশ্যে বিবৃতি দিতে লাগলেন।

এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সুভাষচন্দ্রের ইস্তফা, কংগ্রেস থেকে তাঁর বহিষ্কার বাংলায় কংগ্রেসকে দুর্বল করে ফেলল। এই সব ঘটনায় মুসলিম লিগ হকসাহেবের কোয়ালিশন সরকারে উপরন্তু মালিক হতে চাইল। হকসাহেবও নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে সাময়িকভাবে মুসলিম লিগে যোগ দিলেন। উৎফুল্ল অথচ সন্দিগ্ধ মহম্মদ আলি জিন্না ১৯৪০ সালের মে মাসে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লিগের বার্ষিক অধিবেশনে হকসাহেবকে দিয়ে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' উত্থাপন করলেন। এই সুযোগে প্রাদেশিক মুসলিম লিগ দলীয় বৈঠকে বিভিন্নভাবে হকসাহেবের নেতৃত্বের প্রতি তাদের অনাস্থার মনোভাব প্রকাশ করতে লাগল। অবশেষে ১৯৪১ সালে মুসলিম লিগ হকসাহেবের কোয়ালিশান সরকার ভেঙে দিল। হকসাহেবও সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লিগ থেকে পদত্যাগ করলেন এবং জিন্না ও তাঁর দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতিকে তীব্র আক্রমণ করে বিবৃতি দিলেন।

এই সময় ফজলুল হকসাহেবের মুখ্যমন্ত্রিত্বকে রক্ষার জন্য সর্বাগ্রে এগিয়ে এলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পিছনে থাকলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় ও নলিনাক্ষ সান্যাল। আইন সভার নির্দল হিন্দু ও মুসলমান এবং তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত রাজা প্রসন্নদেব রায়কত, উপেন্দ্রনাথ বর্মন, হেমচন্দ্র নস্কর হকসাহেবের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ফলে হকসাহেব নতুন করে আর একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে সক্ষম হলেন। তাঁর দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকার বঙ্গ রাজনীতিতে "শ্যামা- হক" সরকার বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

মুসলিম লিগ কোমর ভাঙা সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। বাংলার প্রাদেশিক সরকারে ফজলুল হকের অব্যাহত নেতৃত্ব ইংরেজদের আদৌ কাম্য ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লিগ ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তুতিকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানাল। জাতীয় কংগ্রেস যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরোধিতা করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সাতটি প্রাদেশিক সরকারকে ভেঙে দিল। এর পরিণতিতে ভাইসরয় এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নররা মুসলিম লিগকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করার নীতি গ্রহণ করলেন। ফলে মুসলিম লিগের রাজনৈতিক শক্তি অনেকটা বেড়ে গেল।

কিন্তু ফজলুল হককে কী করে সরকারি নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করা যায়? ওই লক্ষ নিয়ে স্যার জন হার্বার্টকে ব্রিটিশ সরকার বাংলার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করলেন। স্যার জন হার্বার্ট গভর্নর হয়েই যুদ্ধকালীন বিশেষ ক্ষমতা অনুযায়ী প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে জাপান বঙ্গোপসাগর এলাকায় তার আধিপত্য সম্প্রসারণ করে ফেলেছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে রেঙ্গুনে এসে গিয়েছেন। মণিপুরের কাছে ভারতভূমিতে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয় পতাকা নিজে এসে উড়িয়ে দিলেন। চট্টগ্রামের কক্সবাজার এবং কলকাতা বন্দর ও শহরের কয়েকটি মহল্লায় জাপানি বোমা বর্ষিত হল। ইংরাজদের পরাজয়ে ও পশ্চাদপসরণে উৎফুল্ল হকসাহেব মন্ত্রীসভার বৈঠকে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে বাংলায় মাঝে মাঝে টিপ্পনি কাটতেন। কখনও বা শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে বাংলায় চিরকুট বিনিময় করতেন এ ধরনের ভাষায়—সুভাষ আসছে, এবার পিঠের ছাল তুলে নেবে....। হার্বার্ট এবং চিফ সেক্রেটারি হকসাহেবের বাংলা টিপ্পনি বুঝবার চেষ্টা করতেন। মন্ত্রীসভার বৈঠক শেষে সবাই চলে গেলে চিফ সেক্রেটারি ঝাড়ুদারকে ডেকে এনে দলা পাকানো ওই কাগজের চিরকুটগুলি কুড়িয়ে নিতেন। ওই চিরকুটগুলি গভর্নর হার্বার্টের কাছে জমা পড়ত।

এই সময় ১৯৪২ সালের শেষ থেকে ১৯৪৩ সালের প্রথম দু'মাসের মধ্যে পরপর কয়েকটি বড় ঘটনা ঘটল। "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের এবং তাঁদের সমর্থকদের উপর কর্নেল জন হান্টের (পরবর্তীকালের এভারেস্ট বিজয়ী) নেতৃত্বে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের বর্বর অত্যাচারের অভিযোগ পেয়ে হকসাহেব তাঁর অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে মেদিনীপুরে পাঠালেন। শ্যামপ্রসাদ আধা সামরিক ইংরাজ ও গোর্খা বাহিনীর অমানুষিক হিংস্র অত্যাচারের বিবরণ সংগ্রহ করলেন এবং মেদিনীপুরে বসেই তিনি খবরের কাগজে একটি বিবৃতি দিলেন। মেদিনীপুর থেকে ফেরার পথে শেষরাত্রে কোলাঘাট স্টেশনে সেক্রেটারির নির্দেশে পুলিশ প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করল। রাগে ক্ষোভে ফজলুল হক ফেটে পড়লেন। তিনি চিফ সেক্রেটারির কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। চিফ সেক্রেটারি গভর্নরকে দেখিয়ে দিলেন। হকসাহেব লাটসাহেবের কাছে গেলেন। লাটসাহেব হার্বার্টের সঙ্গে তাঁর বাকবিতণ্ডা হল।

এর কয়েকদিন পর নোয়াখালি জেলার উপকূলবর্তী গ্রাম সানোয়ায় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একদল আফ্রিকান উপকূলরক্ষী ভোররাতে হানা দিল। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এই জেলে গ্রামের পুরুষেরা নদীতে ও মোহনার মুখে মাছ ধরতে ব্যস্ত। সৈন্যরা গ্রামে ঢুকে বালিকা থেকে মধ্যবয়সী সব মেয়েদের ধর্ষণ করল। ধর্ষণের পর তারা যখন মোটরবোটে উঠতে যাবে সেই সময় জেলেরা গ্রামের ঘাটে তাদের নৌকা ভিড়িয়ে নামছে। মাটিতে পা দিয়েই তারা তাদের বাড়ির লোকদের আর্তনাদ শুনতে পেয়ে দাঁড় ও বৈঠা দিয়ে সৈন্যদের আক্রমণ করল। সৈন্যরা মেশিনগান চালিয়ে তাদের শেষ করে দিল। খবরের কাগজে এই খবর বের হল না। ফেনি মহকুমার অতিরিক্ত এস.ডি.ও. কৃষক প্রজা পার্টির একজন নেতাকে ধরে ঘটনাটি মুখ্যমন্ত্রী হকসাহেবকে জানালেন বেসরকারিভাবে। হকসাহেব মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে চিফ সেক্রেটারির কাছে সরকারিভাবে ঘটনার বিবরণ চাইলেন। চিফ সেক্রেটারি গভর্নর হার্বার্ট সাহেবকে দেখিয়ে দিলেন। ফজলুল হক ফেনি সফরের সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি ফেনি স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হকসাহেবের উপর ১৪৪ ধারা জারি করলেন। ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার নজির আর নেই। হকসাহেব স্টেশনে অপেক্ষমান হাজার হাজার লোকের সামনে বক্তৃতা দিতে পারলেন না। তিনি ডাকবাংলোতে চলে গেলেন। স্টেশনে উপদ্রুত গ্রামটির জেলে পরিবারগুলির বিধবাদের এনে রাখা হয়েছিল। তিনি বিধবাদের হাতে একখানি করে সাদা থান ও কিছু টাকা তুলে দিলেন। দাতা ও গ্রহীতাদের মধ্যে শুধু অশ্রুজল বিনিময় হল।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পর মুখ্যমন্ত্রী জানতে পারলেন যে বরিশাল জেলার ভোলা ও দৌলত খাঁ এবং খুলনা জেলার বাগেরহাট এলাকায় বিভিন্ন খাদ্য-গুদামে মজুত কয়েক লাখ মন চাল জাপানিদের হাতে পড়ার আশঙ্কায় নদীতে ও সমুদ্র মোহনায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। হকসাহেব লিখিতভাবে চিফ সেক্রেটারির কৈফিয়ত চাইলেন। গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট ফজলুল হককে ডেকে পাঠালেন। উভয়ের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হল। এরপর একদিন হার্বার্টসাহেব মুখ্যমন্ত্রী আবুল কাশেম ফজলুল হককে পদত্যাগে বাধ্য করলেন।

হকসাহেব তাঁর লেখা একমাত্র গ্রন্থ 'বেঙ্গল টুডে' তে বাংলার তৎকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ওইসব ঘটনা সবিস্তারে বলেছেন। হকসাহেবের এই পদচ্যুতি বাংলাকে পুরোপুরি মুসলিম লিগের হাতে তুলে দিল। পরবর্তী চার বছরের ইতিহাস সম্ভবত তখন থেকেই বঙ্গদেবতা অদৃশ্য লিপিতে লেখা আরম্ভ করে দিয়েছেন। হকসাহেবকে সরিয়ে হার্বার্টসাহেব ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দিনকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসালেন।

বাংলার এই সরকার ধিকৃত হয়ে আছে ১৯৪৩ এর মহা মন্বন্তরের জন্য, যে মহাদুর্ভিক্ষে এই বাংলার অন্তত দশ লাখ মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা হল ওই সময় থেকেই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক জীবনের নীতিবোধ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সূচনা। এই সূচনা

থেকে দাঙ্গা ও দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে পরবর্তী বাঙালি প্রজন্মগুলি মানুষের ভগ্নাংশে পরিণত হয়েছে।

নোয়াখালি থেকে গান্ধীজি কয়েকদিন বিহারের দাঙ্গাদুর্গত গ্রামগুলি দেখে দিল্লি গেলেন। বিহারের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন সীমান্তগান্ধী খান আবদুল গফফর খানের উপর। এপ্রিল মাসে তিনি আবার বিহারে এলেন।

দ্বিতীয়বার বিহারের দাঙ্গাদুর্গত এলাকা ঘুরে গান্ধীজি ফিরে এলেন দিল্লিতে (১৯৪৭ সালের মে মাসে)। দিল্লি স্টেশনে সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ধরলেন। প্রশ্ন করলেন — আপনি কি জানেন, দেশ ভাগ হতে চলেছে?

ক্লান্ত ও বিষণ্ণ গান্ধীজি সেদিন জবাব দিয়েছিলেন — আমার মৃতদেহের উপরেই দেশ ভাগ হবে (The partition of the country shall only be over my dead body)। কিন্তু তাঁর জীবন্ত উপস্থিতিতেই দেশভাগ হয়েছিল।

সার্বভৌম বাংলার রাজনীতি

মে মাস (১৯৪৭) ধরে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ আসন্ন বিভাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন বঙ্গ রাজনীতিতে স্বতন্ত্র ধারা প্রবাহিত হল। এই স্বতন্ত্র ধারাটি হল ভারত বিভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই অবিভক্ত বঙ্গ রাষ্ট্রার চেষ্টা। এই স্বতন্ত্র ধারার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু এবং মুখ্য পরামর্শদাতা কিরণশঙ্কর রায়। বিতর্কিত এই প্রবাহটির প্রধান সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন হুসেন শাহিদ সুরাবর্দি। এই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রবাহ স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও ইতিহাসের বিশ্লেষণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

গান্ধীজি যখন বিহারে সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনে ব্যস্ত, সে সময় (মে, ১৯৪৭ সাল) গান্ধীজিকে বাদ দিয়েই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেশ বিভাগের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময়ই জওহরলাল একটি বিস্ময়কর চিঠি লেখেন কলকাতায় কিরণশঙ্কর রায়কে। কিরণশঙ্কর রায় ওই সময়ে বাংলা কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী এবং অন্যতম প্রতিভাবান নেতা। জওহরলাল চিঠিটি লিখে কিরণবাবুর ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। জওহরলালের লেখা সেই চিঠিটি হল —

17 York Road
New Delhi
17.5.47

My Dear Kiran,

We gradually or rather rapidly approaching the stage of final decisions in regard to our immediate future, and we should be quite clear in our minds as to what our attitude should be. I am certain that the various proposals put forward by Suhrawardy for a united independent Bengal plus joint electorate plus fifty-fifty are dangerous from the point of view before Bengal and India. Those or similar proposals can only be accepted on the basis of union with India. On any other basis they will lead to infinite troubles and far greater difficulties in the way of future union with India. You will remember the talk we had at Maulana's place some time back. I hold to that and I am more convinced than ever that we must stick to our guns. If there is no union of Bengal as a whole into India then there must be a partition of Bengal and Western Bengal must join the Union. This will surely lead to East Bengal also joining the Union before long.

In the crucial days to come I hope Congressmen in Bengal will hold fact together and stand for this position.

Yours sincerely
Jawaharlal Nehru

P. S. I am entirely opposed to the stand Calcutta being a so-called free city.

জওহরলালের এই চিঠিটি মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা প্রকাশের দু'সপ্তাহ আগে লেখা। জওহরলালের এই চিঠিটির পশ্চাৎপটটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার পর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা ভাবতে আরম্ভ করল যে আর একসঙ্গে শান্তিতে থাকা সম্ভব নয়। এমন একটা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষের ভাইসরয়ের দায়িত্ব নিলেন। গান্ধীজি তখনও নোয়াখালিতে। ওই সময় একদিন গভীর রাতে কবি অমিয় চক্রবর্তী হঠাৎ গান্ধীআশ্রমে এসে উপস্থিত। অত রাতে তাঁকে দরজায় দেখে নির্মলবাবু একেবারে হতবাক। কারণ অমিয়বাবু আগাম কোনও খবর দেননি যে তিনি আসছেন। অমিয়বাবু দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি থাকায় জওহরলালের সঙ্গে তাঁর একটা ব্যক্তিগত নিবিড় বন্ধুত্ব হয়েছিল। ফলে দিল্লিতে বসেই তিনি অনেক গোপন রাজনৈতিক খবরাখবর রাখতেন। তিনি মাঝে মাঝে গান্ধীজির সেক্রেটারির কাজও করতেন। ফলে গান্ধীজির সঙ্গেও তাঁর বিশ্বাস ও সখ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরদিন সকালে অমিয় চক্রবর্তী গান্ধীজির কাছে গেলেন। তিনিই গান্ধীজিকে প্রথম জানালেন যে, দিল্লিতে দেশ বিভাগ এবং পাকিস্তান

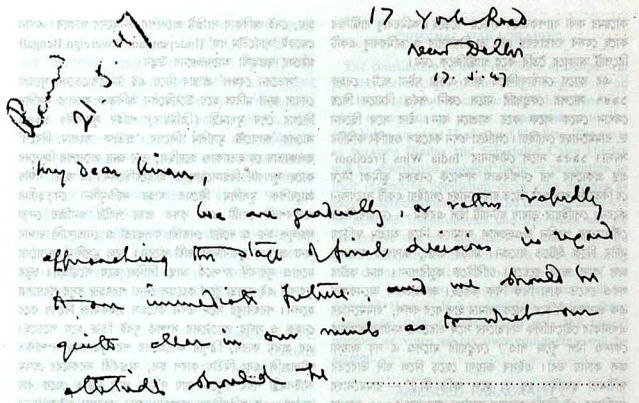

[সংক্ষিপ্তরূপে পণ্ডিত নেহরুর চিঠিটির হস্তলিপির নমুনা।]

কায়েমর কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। অমিয়বাবু গান্ধীজির কাছে যেসব খবরাখবর দেন তা নির্মলবাবু ও অমিয়বাবু একটি রিপোর্ট আকারে তৈরি করে গান্ধীজিকে দেন।

এর আগে নোয়াখালিতে আর একটা ঘটনা ঘটে। নেহরু ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফেনি পর্যন্ত বিমানে গিয়ে সেখান থেকে লঞ্চে করে আশ্রমে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ড. রামমনোহর লোহিয়া। লোহিয়া তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। ১৯৫৯ সালে মৌলানার 'India Wins Freedom' গ্রন্থ প্রকাশের পর দেশবিভাগ সম্পর্কে নেহরুর ভূমিকা নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় ওঠে তাতে রামমনোহর লোহিয়া একটি সংযোজন করেন। লোহিয়ার ভাষায় ঘটনাটি ছিল এরকম — নোয়াখালিতে পৌঁছানোর পরদিন জওহরলাল আমাকে নিয়ে আশ্রম ছাড়িয়ে নদীর দিকে হাঁটতে থাকেন। মাটির রাস্তা, জায়গায় জায়গায় জল কাদা জমে রয়েছে। চারিদিকে কচুরিপানা। ধান কাটার পরও হেতে কাদা থিক থিক করছে। জওহরলাল অনেকক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমার হাত ধরে বলল, 'রামমনোহর এখানকার ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য জায়গার কোনও মিল খুঁজে পাও? ফেব্রুয়ারি মাসেও এ-সব জায়গা জল কাদায় ভরা। এইসব জায়গা ছেড়ে দিলে যদি ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয় তা হলে ক্ষতি কী?' — রামমনোহর লোহিয়ার এই বিবৃতি খবরের কাগজে বের হল ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। লোকসভায় নেহরু এ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন, রামমনোহর অনেক শব্দ বানিয়ে বলেছেন।

সুতরাং এটা একেবারেই পরিষ্কার যে, দেশবিভাগের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার অনেক আগেই লোকেরা এ কথা জেনে গিয়েছিল। অপেক্ষা ছিল শুধু সময়ের।

১৯৪৭ সালের ১৩মে বিচক্ষণ ও হিতৈষী রাজনীতিবিদ সর্দার প্যাটেল কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেস সদস্য ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীকে লিখেছেন — I am afraid that the cry of Sovereign Bengal is a trap in which even Kiran Shankar may fall with Sarat Babu. The only way to save the Hindus of Bengal is to insist on Partition of Bengal.'

ক্ষিতীশ নিয়োগীকে লেখা সর্দার প্যাটেলের এই চিঠি এবং কিরণশঙ্কর রায়কে লেখা জওহরলালের চিঠি (১৭মে, ১৯৪৭) থেকে বোঝা যাচ্ছে দেশবিভাগের সঙ্গে বঙ্গবিভাগের বিষয়টিও নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। ২ জুন মাউন্টব্যাটেন-পরিকল্পনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে দেখা গেল যে প্রদেশগুলিকে ভারত ও পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার 'অপশন' রাখা হয়েছে। অর্থাৎ ব্রিটিশরা এ-দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সার্বভৌম অধিকার নিয়ে কোনও প্রদেশ যদি ভারত ও পাকিস্তানের কাছ থেকে আলাদা থাকতে চায়, সেই অধিকার সংশ্লিষ্ট প্রদেশের জনগণের থাকবে। এখান থেকেই 'সার্বভৌম বঙ্গ' (Independant Sovereign Bengal) গঠনের স্বল্পস্থায়ী আন্দোলনের উদ্ভব।

'সভরেন বেঙ্গল' প্রস্তাব নিয়ে এই টানাপোড়েনের সুযোগ নেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লিগের শেষ মুখ্যমন্ত্রী (প্রিমিয়ার) শাহিদ সুরাবর্দি। ১৯৪৬ সালের আগস্টে মুসলিম লিগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে' কলকাতায় যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, তার জন্য প্রদেশের হিন্দুদের কাছে সুরাবর্দি বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছিলেন। এ ছাড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের খাজা নাজিমুদ্দিন নেতৃত্বাধীন প্রভাবশালী গোষ্ঠী এবং কৃষক প্রজা পার্টির জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হক ও দলের নেতারা কলকাতা ও নোয়াখালি দাঙ্গার জন্য প্রধানত সুরাবর্দিকে দায়ী করেন। ফলে মুসলিম জনগণের মধ্যেও সুরাবর্দি সম্পর্কে আস্থা শিথিল হয়ে পড়েছিল। চতুর সুরাবর্দি এই অবস্থা বুঝে কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর শরণাপন্ন হলেন। শরৎবাবুর সঙ্গে তখন কংগ্রেস হাইকমান্ড বিশেষ করে নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে পড়েছে। এর প্রথম কারণ, ত্রিপুরি কংগ্রেসের পর সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত ঘটনাগুলি এবং দ্বিতীয় কারণ হল, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম আইনমন্ত্রী শরৎ বসুকে প্রায় দু'মাস পরে মন্ত্রীত্ব থেকে বাদ দেওয়া। এর পরিণতিতে শরৎচন্দ্র বসুর কংগ্রেস হাইকমান্ডের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে বিদ্বেষের মনোভাব গড়ে উঠেছিল। শাহিদ সুরাবর্দির সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে শরৎবাবুর এবং কিরণশঙ্কর রায়ের বিশেষ সুসম্পর্ক ছিল। কারণ এঁরা তিনজন একই সময়ে ইংল্যান্ডে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছেন এবং দেশে ফিরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে একই মঞ্চ থেকে বঙ্গরাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শরৎ বসুর মতো অনেকটা সুরাবর্দিসাহেবও নিখিল ভারত মুসলিম লিগের হাইকমান্ডের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। ফলে ওই সময়কার এই দুই বিশিষ্ট বাঙালির চিন্তার মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য এসে গিয়েছিল। কিরণশঙ্কর রায় সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপারে শরৎবাবুর সঙ্গে একমত পোষণ করতেন না ঠিকই, তবে দেশবিভাগ এবং বঙ্গবিভাগের পরিণতির ব্যাপারে এই দু'জনের মধ্যে কোনও মতপার্থক্য ছিল না।

দেশবিভাগের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা মে মাস থেকেই রাজনৈতিক নেতাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ভারতের প্রদেশগুলিকে নিজেদের পছন্দ মতো ভারত ও পাকিস্তান দুই ডোমিনিয়নের যে কোনও একটিতে যোগদানের কিংবা পৃথক প্রাদেশিক সত্তা বজায় রাখার অধিকার দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছিল। শরৎবাবু ও সুরাবর্দিসাহেব এই সুযোগ গ্রহণ করে বাংলাকে অবিভক্ত রেখে, ভারত ও পাকিস্তান দুই ডোমিনিয়নের

বাইরে এক সার্বভৌম প্রাদেশিক সরকার গড়ার জন্য উদ্যোগী হলেন। তাঁরা উভয়েই তাদের এই উদ্যোগে সাহায্য করার জন্য কিরণশঙ্কর রায়ের সমর্থন চাইলেন। সুরাবর্দি যদিও কিরণশঙ্করের ব্যক্তিগত বন্ধু তা হলেও কিরণবাবু ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পর থেকে সুরাবর্দির রাজনৈতিক মতলব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতেন। কিরণবাবু মনে করতেন সার্বভৌম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার গঠিত হলে সেই সরকার যাতে পাকিস্তানের অংশে পরিণত হতে না পারে তার জন্য রক্ষাকবচ দরকার। তা না হলে বাংলার হিন্দুরা কিছুতেই 'সার্বভৌম বাংলা'কে মেনে নেবে না। কিরণবাবু তার এই মনোভাব শরৎবাবুকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন।

শরৎবাবু ও সুরাবর্দিসাহেব 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা' সরকারের কাঠামো কী হবে তার একটা খসড়া তৈরি করলেন। শরৎবাবু ওই খসড়াটি কিরণবাবুকে পাঠান। এবং এ-প্রসঙ্গে কিরণবাবুকে ১৯৪৭ সালের ২৬মে শরৎবাবু একটি চিঠি লেখেন।

1 Woodburn Park,
Calcutta
May 26, 1947

My dear Kiran,

With reference to my conversation with you last night over the phone, I enclose herewith copies of original paragraphs 1 and 2 and as amended by me.

Yours Sincerely,
Sd/- S. C. Bose
(Sarat Chandra Bose)

Sj. Kiran Sankar Roy,
47 European Asylum Road,
Calcutta

ORIGINAL PARAGRAPH 1

Bengal will be a Free State. The Free State of Bengal will decide its relations with the rest of India.

AMENDED PARAGRAPH 1

Bengal will be a Free State. The Free State of Bengal will decide its relations with the rest of India. The question of joining any Union will be decided by the legislature of the Free State of Bengal by a two-thirds majority.

ORIGINAL PARAGRAPH 2

The constitution of the Free State of Bengal will provide for election to the Bengal Legislature on the basis of joint electorate and adult franchise, with reservation of seats proportionate to the population amongst Hindus and Muslims. The seats as between Hindus and Scheduled Caste Hindus will be distributed amongst them in proportion to their respective population or in such manner as may be agreed among them. The constituencies will be multiple constituencies and the votes will be distributive and not cumulative. A candidate who gets the majority of the votes of his own community cast during the elections and 25 per cent of the voter of the other communities so cast will be declared elected. If no candidate satisfies these conditions, that candidate who gets the largest number of votes of his own community will be elected.

AMENDED PARAGRAPH 2

The constitution of the Free State of Bengal will provide for election to the Bengal Legislature on the basis of joint electorate and adult franchise with reservation of seats proportionate to the population amongst Hindus and Muslims. The seats as between Hindus and Scheduled Caste Hindus will be distributed amongst them in proportion to their respective population or in such manner as may be agreed among them. The constituencies will be multiple constituencies and the votes will be distributive and not cumulative. A candidate who gets the largest number of votes of his own community cast during the elections and at least 25 per cent of the votes of the other communities so cast will be declared elected. If no candidate satisfies the above conditions, then that candidate who gets the next largest number of votes of his own community cast.

জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে শরৎবাবু ও সুরাবর্দি 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা'র প্রস্তাব নিয়ে গান্ধীজির কাছে গেলেন। গান্ধীজি তখন অবিভক্ত একটা কিছু ধরে রাখতে আগ্রহী। তিনি শরৎ

বসুর ওই প্রস্তাবকে 'বিবেচনার যোগ্য' বলে স্বাগত জানালেন। 'সার্বভৌম বাংলা'র প্রস্তাব নিয়ে প্রবল আলোড়ন আরম্ভ হল। শরৎবাবু এবং বসু পরিবারের বিশেষ সান্নিধ্যের দরুণ আনন্দবাজার পত্রিকা প্রথম দিকে ওই প্রস্তাবের পক্ষে প্রচার আরম্ভ করল। মুসলিম লিগের 'আজাদ' পত্রিকা ওই প্রস্তাবকে পাকিস্তান ভাবধারার 'পরিপন্থী' বলে নিন্দা করল। হিন্দু মহাসভার সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্রিকা 'হিন্দুস্থান' জোরালো প্রচার করতে লাগল 'সার্বভৌম বাংলা' গঠনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় সে সময় একটি কার্টুন প্রকাশ করা হয়েছিল। কার্টুনটি ছিল এই : শরৎবাবু 'নবকুমার' বেশে গভীর অরণ্যে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন, 'কপালকুণ্ডলা'র বেশে শ্যামাপ্রসাদ 'নবকুমার' শরৎবাবুকে প্রশ্ন করেছেন, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' অদূরে একটি গাছের আড়ালে 'কাপালিকে'র বেশে সুরাবর্দি।

এখন দেখা যাচ্ছে যে ভারত ভাগ হলেও বঙ্গপ্রদেশ ভাগ হবে কি না এটা ১৯৪৭ সালের এপ্রিল থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রবল বিতর্কের বিষয় ছিল। শরৎ বসু শাহিদ সুরাবর্দির সঙ্গে পরামর্শের পর প্রস্তাবিত, 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা'র আইনসভায় হিন্দু মুসলমান এবং তপশিলি হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব কীভাবে হবে, তার একটা খসড়াও রচনা করেন। এ বিষয়ে শরৎ বসু কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ রাখতেন।

'সার্বভৌম বাংলা' গঠনের প্রস্তাবের সঙ্গে কিরণশঙ্কর রায়ের জড়িত থাকার ব্যাপারে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েন। কারণ কিরণবাবু বঙ্গীয় আইনসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা এবং বঙ্গবিভাগের পর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে যে রাজ্য গঠিত হবে তিনি তার ভাবী মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু হাইকম্যান্ড তাঁকে কিছু বলতে পারছিলেন না এই কারণে যে কিরণবাবু গান্ধীজি, নেহরু ও মৌলানা আজাদের ঘনিষ্ঠ। উপরন্তু মৌলানা আজাদ তাঁর দিল্লির বাড়িতে 'যুক্তবঙ্গে'র ব্যাপারে কিরণবাবুর সঙ্গে বহুবার বৈঠক করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দিল্লিতে বেশ কিছু বাঙালি 'যুক্তবঙ্গের' প্রতিবাদে কিরণশঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে কিরণবাবুর একটি বিবৃতি ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া (ইউ পি আই) সংবাদপত্রে প্রচার করে। বিবৃতিটি হল এই :

(United Press of India)

"Partition of India as well as of the provinces has been accepted by the Working Commitee of the Congress and I have no doubt that this decision will be ratified by the A.I.C.C. The decision will be binding on all congressmen whatever may be their individual views. I would like to warn my countrymen against the malicious propaganda directed against myself and my friends, because the purpose of the propaganda is not merely to vilify but to disrupt and weaken the Congress in Bengal."

The above views were expressed by Mr. Kiran Sankar Roy, Leader of the Bengal Assembly Congress Party, on the implication of the Congress High Command's attitude towards the issue of the partition of Bengal, in the course of a statement to the United Press of India.

"My friends and myself", added Mr. Roy, "have neither the time nor the inclination to contradict the various tendentious statements and news that are appearing in the papers regarding ourselves. We know that interested parties are working from behind to weaken the Congress organisation in Bengal. I may mention here that my friends and myself had some part in initiating, drafting and passing the resolution that the Executive Council of the Bengal Provincial Congress Committee passed on the 4th of April last demanding a partition of Bengal. But we must confess that we have never believed in partition for partition's sake. After all, it is a disperate measure which has to be adopted as the last resort to prevent the whole of Bengal being included in Pakistan. We believed that before adopting the last resort, we should make every honourable effort to avoid the partition.

"It seems our offence is that with object in view we participated in some discussions with the leaders of the Bengal Muslim league. It should be remembered that the discussion was not initiated by us. If anything tangible would have come out of these discussions, I would have placed that before the B.P.C.C. and the High Command. The discussions, as is well-known did not produce any result, for reasons into which I need not go at this stage. Any way, we are unable to accept the position that we should not even hold discussions with our political oponents. As I have pointed out in a previous press statement issued before I left Calcutta that the discussion was informal and that I had no power to commit the B.P.C.C., the Bengal Parliamentary party of even myself without the sanction of the organisation to which I have the honour to belong.

"Our second offence seems to be that now that the partition of Bengal is a settled fact, we are unable to share the enthusiasm that is being felt by a large number of my countrymen. We confess we feel utterly depressed that circumstances over which we had no control have made the partition inevitable,—a partition which has flung more than a crore of Hindus and nearly two-thirds of Bengal into Pakistan.

"Since we have come to Delhi, myself and my friends have been made the targets of some special attention and many malicious and false stories are being circulated about us. So long as these were confined to a sort of whispering propaganda we did not take any notice. .....A responsible paper like the Hindusthan Times and I may mention also The Statesman ought to have taken some precaution before publishing these news, specially what I have been reported to have said to the demonstrators. We are here in Delhi and our address could have been easily available. If the Press wanted to contact us for verification, this could easily have been done. Another instance of careless reporting is the A.P.I. news, that myself and Dr. P. C. Ghosc had seen Mahatmaji on Sunday last. As far as I am aware, Dr. Ghose had left Delhi sometime ago and is now in Calcutta, and I have not yet seen Mahatmaji. Then regarding the reported demonstrations in my house the number of demonstrators has been fixed in both cases at 100. As for the number of the youngmen who demonstrated, I believe it would not exceed 25. As for the number of ladies, I can say that they came in 'Tangas' and their number could not exceed 24. However, these are minor matters. Yet I mention them only to show that these news have been dressed up and circulated for a purpose. Now to the significant portion about the views I have been reported to have expressed to the ladies, namely, that I was in Delhi "at the instructions of the High Command to carry on further negotiations for a Coalition Ministry in Bengal and to preserve the unity of the Province." I can only say that there is absolutely no truth in this report. As a matter of fact, the ladies in the demonstration, as is usual with all demonstrators, were too anxious to express their views and were not in a mood to have any discussion with me or to listen to my views."—(U.P.I.)

জুন মাসের (১৯৪৭ সাল) প্রথম সপ্তাহের শেষে কলকাতার 'হিন্দুস্থান', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা'র বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রচারে অবতীর্ণ হয়ে এই অভিযোগ করে যে — ব্রিটিশ বণিকেরা অবিভক্ত বাংলার মাধ্যমে পূর্বভারতে তাদের শিল্পসাম্রাজ্যের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য শাহিদ সুরাবর্দির মাধ্যমে যুক্ত সার্বভৌম বঙ্গের প্রবক্তাদের মধ্যে টাকা বণ্টন করেছে।

এই প্রচারের তীব্রতায় গান্ধীজি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এর প্রধান কারণ, জাতীয় রাজনীতিতে ও বঙ্গ রাজনীতিতে সুরাবর্দি সম্পর্কে লোকের মনোভাব নেতিবাচক হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে ওই প্রচারে বিচলিত হয়ে শরৎচন্দ্র বসু গান্ধীজির কাছে ছুটে গেছলেন। প্যারেলাল তাঁর 'Gandhi: The Last Phase'-এ উল্লেখ করেছেন যে, শরৎবাবু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে গান্ধীজিকে বলেছেন, সারাজীবন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পর অবশেষে ইংরেজের কাছ থেকে অর্থগ্রহণের অপবাদ তাকে শুনতে হল। গান্ধীজি শরৎবাবুর কাঁধে হাত রেখে তাঁর আবেগ প্রশমিত করেন।

এ রকম একটা সময়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি মৌলিক প্রশ্ন তুললেন গান্ধীজির কাছে। সেটি হল — আদর্শের দিক দিয়ে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা' মেনে নেওয়া হল। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা' পাকিস্তানের অঙ্গপ্রদেশে পরিণত হতে চাইলে, তার বিরুদ্ধে কী রক্ষাকবচ আছে। শরৎ বসু প্রস্তাব দিলেন, সে-ক্ষেত্রে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হলে আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিধান থাকবে। এ ব্যাপারে গান্ধীজির মত ছিল — সার্বভৌম বাংলা পরে যদি পাকিস্তান অথবা ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়, তবে সে সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হবে কেবল সংখ্যালঘু হিন্দুদের দুই-তৃতীয়াংশ তা সমর্থন করলে। শ্যামাপ্রসাদ দাবি করলেন যে কয়েক মাস আগের কলকাতা ও নোয়াখালি দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র পরিস্থিতির বিচার করতে হবে। সুরাবর্দিকে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার' শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে এই লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা' কখনও কোনওভাবে পাকিস্তানের অঙ্গপ্রদেশে পরিণত হবে না। গান্ধীজি সুরাবর্দির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, সুরাবর্দি এ ব্যাপারে

মত দেবেন কি না। সুরাবর্দিসাহেব ওই প্রতিশ্রুতি দিতে তাঁর অক্ষমতা জানালেন। বস্তুতপক্ষে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা' কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি।

এ প্রসঙ্গে Gandhi: The Last Phase-এ প্যারেলাল বলেছেন—He (Suhrawardy) was playing for high tricks but lacked the courage or the will or perhaps both to face up to Quaid-i-Azam who suffered no nonsense in the Moslem league camp and was trying to thread on a thin wire. And Sarat Bose and his friends, with more zeal than prudence, were permitting themselves unwillingly to be drawn into Saheed's desparate gamble.

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় বঙ্গপ্রদেশকে দুটি ভাগে (পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান) ভাগ করার প্রস্তাব অনুমোদিত হল। বিভাগের পক্ষে ১২৬ ও বিপক্ষে ৯০ ভোট পড়ল। ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতির জটিল অঙ্কে ভোটের ফলাফল গণনা হল। ধরে নেওয়া যেতে পারে, মুসলিম লিগের এম.এল.এ-দের মধ্যে সুরাবর্দি সমর্থক আবুল হাশেম, ফজলুর রহমান ও ডা. এ.এম মালেক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। কংগ্রেসের মুসলমান সদস্য ফরিদপুরের লাল মিয়াঁ, মোহন মিয়াঁ, কুমিল্লার আসরাফউদ্দিন আমেদ চৌধুরী, খুলনার গিয়াসুউদ্দিন পাঠানও একইভাবে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র বসু-সহ তাঁর সমর্থক কয়েকজন কংগ্রেস এম.এল.এ বঙ্গবিভাগের বিপক্ষে ভোট দেন। মুসলিম লিগের অধিকাংশ সদস্য, ফজলুল হকসাহেবের কৃষক প্রজা পার্টির সদস্যরা এবং তপশিলি ফেডারেশনের যোগেন মণ্ডল, মুকুন্দবিহারী মল্লিক, পুলিনবিহারী মল্লিক ও প্রমথরঞ্জন ঠাকুর বলতে গেলে মুসলিম লিগের শরিক দল হিসাবে 'পূর্ব পাকিস্তান' সৃষ্টির পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তিন এম.এল.এ জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ ও রূপনারায়ণ রায়ও ভোট দিলেন বঙ্গবিভাগের পক্ষে।

কংগ্রেসের যে-সকল হিন্দু সদস্য পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচিত তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মনোবেদনায় ভোটদানে বিরত ছিলেন। পূর্ব বাংলার কংগ্রেস এম.এল.এ-রা যাতে বঙ্গপ্রদেশ বিভাগের পক্ষে ভোটদানের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়েন, তা দেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন হুগলির কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ। অতুল্যবাবু আইনসভা প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে কংগ্রেস এম.এল.এ-দের জন্য একটি 'কিচেন' খুলেছিলেন।

আইনসভায় বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব অনুমোদনের পর আরও প্রায় এক মাস 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা'র রেশ বজায় ছিল। জুলাই মাসের প্রথম দিকে বিধানচন্দ্র রায় এবং কিরণশঙ্কর রায় দিল্লিতে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করে বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবটি পুনর্বিবেচনার কথা বলেন। তখন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন তাঁদের বলেন—ভারতবর্ষে মাত্র দু'জন লোক দেশবিভাগ চায় না। এঁদের একজন হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং দ্বিতীয়জন হলেন লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন।

জুলাই মাসের শেষ দিকে যখন দেশবিভাগের সব প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে, সেই সময় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম এক দীর্ঘ আবেগময় বক্তৃতায় এই আবেদন রাখেন যে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য রক্ষায় দেশবন্ধু যে ফর্মুলা দিয়েছিলেন সেটা অনুসরণ করে এখনও বঙ্গবিভাগ এড়ানো যেতে পারে। এটা খুবই বিস্ময়কর যে অমৃতবাজার পত্রিকা বঙ্গবিভাগের অন্যতম প্রবক্তার ভূমিকা পালন করেছে। সেই পত্রিকায় আবুল হাশেম সাহেবের বিবৃতি পুরো এক কলম ছাপা হয়েছিল।

দেশ বিভাগ ও কংগ্রেস

বঙ্গবিভাগের পর্ব শেষ হয়ে গেল। এরপর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) অধিবেশন ডাকা হল দিল্লিতে জুন মাসের ১৪/১৫ তারিখে। তার আগের দিন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল। ওয়ার্কিং কমিটিতে গভীর দুঃখ ও পরিতাপের সঙ্গে দেশবিভাগ এবং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাব বিনা বিরোধিতায় গৃহীত হল। গান্ধীজি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিলেন না। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল এআইসিসি নিয়ে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের ও বাংলার যে অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে সেখানকার এআইসিসি সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ, দুঃখ ও বেদনা তীব্র আকার ধারণ করেছে। তাঁদের মধ্যে বাংলার শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, সতীন সেন, ধীরেন দত্ত, হেমপ্রভা মজুমদার, কিরণশঙ্কর রায়, প্রভাস লাহিড়ি, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, সীমান্তপ্রদেশের খান আবদুল গফফর খান, খান আবদুল গনি, বেলুচিস্তানের খান আবদুস সামাদ খানরা দিল্লি পৌঁছনোর পথে ট্রেনে সারারাত অশ্রুবর্ষণ করেছেন। তাঁদের সারা জীবনের সংগ্রাম ও সাধনা দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে ধূলিসাৎ হতে যাচ্ছে।

এআইসিসি বৈঠকের দিন সকালে সর্দার বল্লভভাই ও জওহরলাল ডাঙ্গি কলোনিতে গিয়ে গান্ধীজিকে ধরলেন। তাঁকে বলা হল এআইসিসি বৈঠকে যোগদানের কথা। দেশবিভাগ নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব এআইসিসি যাতে অনুমোদন করে সেজন্য সদস্যদের কাছে গান্ধীজিকে আবেদন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে গান্ধীজি বৈঠকে এলেন।

মঞ্চে বসে গান্ধীজি কারও সঙ্গে একটা কথাও বললেন না। □

(ক্রমশ)

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক বাঙালি মধ্যবিত্ত-মন

অরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২ : ৩ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মধ্যবিত্ত মন ও মননের বিবর্তনের ধারা

আগের অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে—ইংরেজ রাজশক্তির অধীন বাঙলাদেশে নতুন মধ্যবিত্তসমাজ গড়ে উঠেছে কোনও দেশীয় আর্থসামাজিক প্রক্রিয়ার ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নয়, নিছক বিদেশি বাণিজ্যনীতি, প্রশাসন এবং ভূমিব্যবস্থার প্রয়োজনের অপরিহার্য অংশ হিসাবে। ফলে ওই মধ্যবিত্ত বাঙালিসমাজে বিদেশি ভাষা, বিদেশ থেকে ভেসে আসা মানবতাবাদী চিন্তার উপকরণ এবং বিদেশিদের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যে পরিমাণ বিচারহীন আনুগত্য লাভ করেছিল, স্বদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মচিন্তা ও কর্মচিন্তার ব্যাপারে ঔদাসীন্য বেড়ে গেল তার চেয়েও বেশি। জন্মসূত্রেই বাঙালি মধ্যবিত্ত-মন নিজের যে-জগৎ গড়ে তুলেছিল সেখানে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য এবং অদৃষ্টবাদী বৃহত্তর বাঙালি মন, তাঁর বোধবুদ্ধি ও মননের জগতের কোনও সত্তা পরিচিতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে অক্ষম ছিল। এ কারণেই অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সমাজের পরিচিত জগতের সংকীর্ণ আকৃতির জন্য যেমন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত মনে অনুশোচনার কোনও প্রকার অস্তিত্বই ছিল না, ওই শতাব্দীর পাঁচ দশক অবধি বাঙালি মধ্যবিত্তের পরোপচিকীর্ষু মনে বিদেশি শাসনের কুফল নিয়ে তেমন প্রতিক্রিয়া বা ইংরেজশাসন-নিরপেক্ষ কোনও বিকল্প আর্থসামাজিক ব্যববস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে অনেক বাঙালি মনীষী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে গড়ে ওঠা দেশি জমিদারগণের কৃষক-শোষণকে নিন্দা করেছেন, কিন্তু বিদেশি অভিভাবকত্বের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। শুধু তাই নয় গোটা বাংলাদেশের বিভিন্ন পল্লিঅঞ্চলে ওই শতাব্দীর প্রথম অর্ধে ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছোটলোক চাষি সম্প্রদায় যে সকল স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল সে সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় বিতৃষ্ণা প্রকাশ ছাড়া বিভিন্ন উজ্জ্বল মধ্যবিত্তমন নীরবতাই পালন করেছিল। অথচ একই উজ্জ্বল মন পৌরাণিক কুসংস্কার থেকে মধ্যবিত্তসমাজের মুক্তির জন্য বিজ্ঞানচেতনা ও পশ্চিমিধাঁচে শিক্ষাব্যবস্থা যাতে বাঙলাদেশে সম্প্রসারিত হয়, তার জন্য বিদেশি শাসকদের কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করেছে।

ব্যাপক অর্থে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙালি মধ্যবিত্ত মনের নিছক নেতিবাচক বা ধ্বংসাত্মক প্রবণতা ওই মধ্যবিত্ত সমাজেরই অভ্যন্তরীণ ব্যভিচার, কুসংস্কার এবং জাতপাতের বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়। শুধু তাই নয় ইংরেজ জাতির মহৎ মানসিক সম্পদ ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বিশ্লিষ্ট ভারতীয় জাতিসমূহের উপরের স্তরে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের জড়তায় বন্দি মনকে ওই সম্পদ ও জ্ঞানের দ্বারা কীভাবে আলোকিত করে গতিময় করা যায় তার উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। ফলে ওই সময়ের মধ্যবিত্তমনের নির্মাণধর্মী প্রবণতার ঝোঁক ছিল ইংরেজজাতির সহযোগিতায় ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে ধর্মীয় উদারতা যুক্তিবাদ বিজ্ঞানচিন্তার প্রসারের জন্য যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার উদ্বোধন করা। ইংরেজ রাজপুরুষগণও উপরোক্ত চরিত্রের মধ্যবিত্তমনের নির্মাণধর্মী প্রবণতাকে কাজে

লাগালেন নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের প্রয়োজনে উদারনৈতিক কিছু সমাজসংস্কার নীতি প্রণয়ন করে।

বৃহত্তর সমাজ-বিচ্যুত ওই নবগঠিত মধ্যবিত্তমন ও বিদেশি প্রশাসন উভয়েই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে আরম্ভ করল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে বিশেষ করে ষষ্ঠ দশকের সূচনায়। নবগঠিত মধ্যবিত্তসমাজ বাঙলাদেশে প্রথম আঘাত পেল ১৮৫৯ সালে — ইংরেজ রাজশক্তির সাম্রাজ্যিক স্বার্থের প্ররোচনায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন ভূস্বামীদের স্বার্থ আংশিক খর্ব করে খাজনা আইন প্রণয়ন করার ফলে। ভূস্বামীরূপ বাঙালি মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সঙ্গে পল্লিঅঞ্চলের উচ্চ বর্ণহিন্দু গৃহস্থ রায়তদের যে প্রচ্ছন্ন অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়কাল থেকে জন্ম নিয়েছিল, বিভিন্ন অঞ্চলের ছোটলোক কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহের সোচ্চার প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বর্ণহিন্দু রায়তদের সমর্থন পাওয়ার জন্যই সরকারি খাজনা আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল। নীলচাষের বিরুদ্ধে কিছু কিছু ভূস্বামী ছাড়াও পল্লিঅঞ্চলের বর্ণহিন্দু পরশ্রমজীবী রায়তদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষও উক্ত খাজনা আইন প্রবর্তনের অন্যতম কারণ। অভিজাত ভূস্বামীরূপ মধ্যস্বত্বভোগীদের সংগঠন 'ল্যান্ড হোল্ডারস্ সোসাইটি' দেবেন্দনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ইংরেজ রাজপুরুষদের ওই 'বিশ্বাসঘাতকতা'য় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বটে, খাজনা আইনের দ্বারা রায়তপ্রধান বাঙালি মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সমাজের আয়তন বেশ খানিকটা বেড়ে গেল। কলকাতায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হল বাঙালি বর্ণহিন্দু-প্রধান রায়তরূপ মধ্যস্বত্বভোগীদের উদ্যোগে।

পাশাপাশি ইংরেজ প্রশাসন তার সাম্রাজ্যিক স্বার্থ ও উদার নীতির ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের পথে চলল ইংল্যান্ডের শিল্পপুঁজির স্বার্থে। বস্তুত বাণিজ্যিক পুঁজির আমলে ইংল্যান্ড যতদিন ছিল ইউরোপের বিভিন্ন ধরনের উদারনৈতিক আদর্শগত সংগ্রামের একমাত্র কেন্দ্রস্থল, ইংল্যান্ডের মধ্যবিত্তসমাজে ততদিন উদারনীতির আধিপত্য ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তমদশক থেকেই তার উপনিবেশগুলো থেকে শিল্পায়নের বিচিত্র রসদ সংগ্রহে ইংল্যান্ডের শিল্পপুঁজি সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করে এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সামগ্রিক মৈত্রীভাব বিপন্ন হয়ে যায়।

বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ কেউ ওই সময়েই সমাজের বৃহত্তর অংশ পল্লিঅঞ্চলের কৃষিনির্ভর শ্রমজীবী সমাজের শোষণব্যবস্থার সঙ্গে ইংরেজের সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সম্পর্ক আবিষ্কার করে। এ ব্যাপারে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ প্রশাসন-সৃষ্ট ভূস্বামীরূপ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর বিরুদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সমালোচনা ব্যাপক হয়। ওই সমালোচকদের মধ্যে ডিরোজিও এবং ডেভিড হেয়ারের চিন্তাধারার অনুগামী বুদ্ধিজীবীরাই প্রধান ছিলেন। এঁদের মধ্যে অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, বঙ্কিমচন্দ্র এবং আরও অনেকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে উপরোক্ত চিন্তাধারাকে আর্থসামাজিক তথ্য দিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবিরোধী পরিণামে নিয়ে আসেন সখারাম গনেশ দেউস্কর এবং রমেশচন্দ্র দত্ত। কিন্তু উক্ত সাম্রাজ্যিক স্বার্থবিরোধী পরিণাম কোনও নির্মাণাত্মক কর্মসূচিতে মূর্ত হতে পারেনি, সেখানে যেটা কালক্রমে মূর্ত হতে পেরেছিল তা হচ্ছে নিছক নেতিবাচক বা ধ্বংসাত্মক প্রবণতা। বাস্তবে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশের শেষ তিন দশকে দ্বন্দ্বজর্জরিত বাঙালি মধ্যবিত্তমনের নির্মাণধর্মী প্রবণতা মুক্তি পেয়েছিল একমাত্র তার সাহিত্যকর্মে এবং ওইতিহ্যবাহী শুভ ধর্মচিন্তায়। অর্থাৎ যাঁরা হাতে-কলমে আর্থসামাজিক মুক্তির উপায় খুঁজলেন, তাঁরা নিলেন কৃষকবিদ্রোহের ধ্বংসাত্মক পথ। সাহিত্যকর্মে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ দেশের মাতৃমূর্তির রূপকল্প দাঁড় করালেন, আর 'ধর্মতত্ত্বে' ইংরেজের মধ্যে গ্রহণীয় বর্জনীয় অংশগুলো উল্লেখ করলেন। কিন্তু 'আনন্দমঠে' এসে তিনি ছদ্মবেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধেই দাঁড়ালেন। শুভধর্মচিন্তায় রামকৃষ্ণপরমহংস এবং বিবেকানন্দ বাঙালি মধ্যবিত্তদের ধর্মমত ও পথের দ্বন্দ্ব থেকে সরে এসে বৃহত্তরদেশকে সেবাধর্মে দীক্ষিত করতে চাইলেন। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত সমাজের তরুণদের মধ্যে প্রশাসকবিরোধী সহিংস পথের সূচনাকাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল শতাব্দীর শেষ দু'দশক।

গোটা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্তমনে ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে দেশ ও কালকে চিহ্নিত করবার প্রবণতার নিয়ামক ছিল পরশ্রমজীবী বাঙালি মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ অর্থে হিন্দু-জাতীয়তাবাদী মননের অবকাশ। ওই যুগে বাঙালিমধ্যবিত্ত কল্পনায় দেশকে, গোটা ভারতবর্ষকে দেখতে পেত। কিন্তু বিদেশি প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিকাঠামোর অধীনস্থ হওয়ায় তার মনন যতটা ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার বিরোধী নিছক নেতিবাচক প্রবণতায় অতি সহজেই নিমজ্জিত হতে পারত, বিকল্প আর্থসামাজিক মুক্তির কোনও নির্মাণধর্মী প্রবণতায় উত্তরণ করতে পারত না। ফলে শতাব্দীর প্রথম দিকে রামমোহন ও তাঁর অনুসারীগণ যে যুক্তিবাদী বিশ্বমানবতার ধর্ম ও মধ্যবিত্ত সমাজকেন্দ্রিক সমাজসংস্কারের কর্মসূচির মাধ্যমে প্রচলিত রাজনৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে তাঁদের নির্মাণধর্মী প্রবণতাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, শতাব্দীর শেষে রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তারুণ্যের প্রতীক বিবেকানন্দ প্রচলিত-আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর পরিবর্তে নতুন কোনও নির্মাণধর্মী ধর্মীয় বা সামাজিক কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারেননি।

কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরে যে রামা কৈবর্ত ও হাসিম শেখদের বৃহত্তর বাঙালি সমাজ নিজস্ব গতিপথে এগিয়ে চলছিল,

তাদের চেতনায় দেশ কখনও আঞ্চলিক গণ্ডির বাইরে যেতে পারত না, দেশমাতৃকা তাঁদের চেতনায় ছিল কর্ষণযোগ্যভূমি, যে ভূমি থেকে তাঁদের শ্রমে-উৎপন্ন শস্যে ভাগ বসাত জমিদার, মহাজন, সুদখোর রূপ মধ্যস্বত্বভোগী ভূস্বামী বা সম্পন্ন রায়তরূপ ভদ্রলোকেরা থানার বড়বাবুদের সহযোগিতায়। তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষঅর্ধে যখন বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজ বিদেশি জ্ঞানের প্রসারণ অথবা দেশের সম্পদ শোষণ না করার দাবি নিয়ে ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছে আবেদন নিবেদন করত বাস্তবে তা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল প্রশাসনের উচ্চতর আমলার পদে ইংরেজ না নিয়ে ভারতীয়দের নিযুক্তির দাবিতে। রামা কৈবর্ত, হাসিম শেখরা তখন সাতের দশক থেকে ফসলের ভাগ নিয়ে ও খাজনা না দেবার অধিকার নিয়ে গোটা বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলে একাংশ বিক্ষুব্ধ রায়তের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন আন্দোলন আরম্ভ করেন। ওই পর্বে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন গ্রামেরই অবস্থাপন্ন বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের কেউ না কেউ। বাঙালি বৃহত্তর-সমাজ-বিচ্যুত ভদ্রলোক গৃহস্থদের রায়তিস্বার্থের সঙ্গে অশিক্ষিত দরিদ্র শ্রমজীবী চাষির বেঁচে থাকার সংগ্রাম প্রথম ওইক্যবদ্ধ আত্মপ্রকাশ করল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিনদশকে। ওই আত্মপ্রকাশের মধ্যে বাঙালি সত্তা পরিচিতির লেশমাত্র ছিল না। ছিল ইংরেজ প্রশাসন বিরোধী নেতিবাচক সংগ্রামের আবেগ।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটেই শতাব্দীর আটের দশকের গোড়ায় ইংরেজ প্রশাসন বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট প্রবর্তন করে পল্লিবাসীদের মধ্যে আরও কিছু জমিকেন্দ্রিক নতুন মধ্যস্বত্বভোগীশ্রেণী সৃষ্টি করে। অভিজাত ভূস্বামীরূপ মধ্যস্বত্বভোগীরা হয়ে পড়েন মধ্যস্বত্ব ভোগীরূপ মধ্যবিত্তসমাজের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদশকে বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজ ক্রমশ স্ফীতিলাভ করে। ওই সমাজে জমির ফসল থেকে মধ্যস্বত্ব আয়ের সৌভাগ্য সকলের না থাকলেও ইংরেজি শিক্ষার কল্যাণে উপরোক্ত রূপ মধ্যস্বত্ব আয়ের উপায় উদ্ভাবনের অবকাশ তাঁদের থাকত।

একই কারণে মধ্যবিত্তসমাজের একটি অংশের মধ্যে ইংরেজপ্রশাসন-বিরোধী চেতনার বিস্তারলাভ করে। হোমরুল-জাতীয় স্বায়ত্তশাসন এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানকারী বাঙালি মধ্যবিত্ত তরুণ সমাজের ক্ষুদ্র অংশে আপেক্ষিক জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের ইচ্ছার স্ফুরণও ঘটতে আরম্ভ করে। ওই সময়েই আবার মধ্যবিত্তসমাজের জাতীয়তাবোধ হিন্দুজাতীয়তাবোধের সংকীর্ণ ছদ্মবেশে গড়ে উঠতে থাকে। আবার মধ্যবিত্তসমাজের তরুণ অংশের কারও কারও মধ্যে একদিকে বিবেকানন্দের ও রামকৃষ্ণমিশনের জনপ্রিয়তা ওই সময়েই সংহত হয়, অপরদিকে একটি অংশ হোমরুলের দাবি নিয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে। এক কথায় বাঙালি মধ্যবিত্তমনে আদর্শবাদী আবেগময় প্রবণতা উনবিংশ শতাব্দীর শেষদশকে শক্তিশালী হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের চেতনার বশবর্তী এর নির্মাণাত্মক দিক বিবেকানন্দের উদারনৈতিক ধর্মচিন্তায় দীক্ষিত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতী কাজেই মূর্ত হয়। আবেগময় মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবোধের ধ্বংসাত্মক প্রবণতা সমসাময়িক প্রশাসনের বৈষম্যভিত্তিক নীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংহতির পথ খুঁজতে আরম্ভ করে। ওই পথেই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, সঞ্জীবনী সভা, ভারতীয় কংগ্রেস প্রমুখ প্রকাশ্য বা গুপ্ত নানা রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে বাঙালি মধ্যবিত্তের আদর্শবাদী মন এবং আবেগ ওই সময়ে কখনও ধ্বংসাত্মক প্রবণতা বা নির্মাণাত্মক বোধ থেকে গ্রামে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংগঠন গড়ার দিকে এগিয়ে যায়নি। কেন যায়নি এর উত্তর আমরা বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের জন্মবৃত্তান্তে এবং এর স্ফীতিলাভের ওইতিহাসিক কারণে পেতে পারি। উপরন্তু ওই উত্তরের মধ্যেই বাঙালি তথা ভারতীয় মধ্যবিত্তমনের সঙ্গে একটি স্বাধীনদেশের মধ্যবিত্তমনের মৌল পার্থক্য ধরা পড়ে। ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তসমাজের জন্মসূত্র স্বাধীনদেশের মধ্যবিত্তসমাজের জন্মসূত্রের মতো নয় — শুধু এটুকু বললে ছবি স্পষ্ট হয় না। স্বাধীনদেশে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠে ওই দেশের স্বাধীন অর্থনৈতিক বিবর্তনের নিয়মে, ফলে বিবর্তনের একটি স্তরে মধ্যবিত্তমন জাতির স্বাভাবিক অগ্রবর্তী চিন্তার সূচনা করে ধর্মে দর্শনে, জ্ঞান বিজ্ঞানের নিত্য নতুন দিগন্ত বিস্তারে। ওই মধ্যবিত্তমন গোটা জাতিকে নিয়ে এগোয়। আর ঔপনিবেশিক প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্তসমাজ ও মনন জাতির সামগ্রিক সত্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে জন্মেই পঙ্গুতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, উপনিবেশের কর্তার হুকুম তামিল করতে গিয়ে যখন সে বৈষম্যের আঘাতে জর্জরিত হয়, তখনই সে নিজের অস্তিত্বের স্বাধীনতা অন্বেষণ করে। কিন্তু ওই অন্বেষণ কখনওই সমগ্রজাতির প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটকে আশ্রয় করতে পারে না। বরং সমগ্র জাতির পিছিয়ে থাকা অংশকে ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত সমাজ তার হুকুম তামিল করবার মানসিকতায় পেতে চায়। ঔপনিবেশিক আর্থসামাজিক অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে অক্ষম হয়। স্বাধীন জাতির মধ্যবিত্তসমাজের ন্যায় সমগ্রজাতির পিছিয়ে-থাকা অংশের সঙ্গে ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তসমাজ একাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হতে পারে না।

উনবিংশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠা বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ তাই বিংশশতাব্দীতে এসেও বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সামগ্রিক একাত্মবোধে উন্নীত হতে পারেনি। ওই ব্যর্থতার কারণেই বাঙালি মধ্যবিত্ত বিংশশতাব্দীর পরাধীন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেও বিচিত্র

সংকীর্ণতার, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার দায়ভাগ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। অপরদিকে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের সংকীর্ণ স্বার্থদুষ্ট নীতি ও তার প্রয়োগকে মেনে নিতেও অক্ষম হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

ফলে বিংশশতাব্দীর আদর্শবাদী মধ্যবিত্ত বাঙালিমনের ভাঙনধর্মী প্রবণতা একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতায় প্রবল হয়, কিন্তু তার নির্মাণধর্মী প্রবণতা কোনও বিকল্প আর্থসমাজিক অবস্থানকে আবিষ্কার করতে পারে না। একদিকে উনবিংশ শতাব্দীর রামমোহন-রামকৃষ্ণের ধর্মীয় যুক্তিবাদী বা ভক্তিবাদী চেতনাকে আশ্রয় করেও বাঙালি মধ্যবিত্তমন সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। অন্যদিকে বিকল্প আর্থসামাজিক রূপকল্পে বাঙালি মধ্যবিত্তমনে দেশ গড়ার কাজ কোনও সংহত মূর্তি তৈরি করতে পারে না। অন্যদিকে এ কারণেই বিংশ শতাব্দীর আদর্শবাদী মধ্যবিত্তমন যদিও বিদ্রোহে সোচ্চার হয়, আত্মত্যাগও করে, কিন্তু বাস্তবে এক ধরনের উৎকেন্দ্রিকতাসর্বস্ব রাজনৈতিক মানসিকতা ও কর্মসূচিতে আত্মনিয়োগ করে। উপরোক্ত উৎকেন্দ্রিকতা সর্বস্ব রাজনীতি মধ্যবিত্ত-সুলভ ক্ষুদ্রতা, মানসিক দৈন্য ও দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। মধ্যবিত্তমনের নির্মাণধর্মী প্রবণতা কোনও বিকল্প আর্থসামাজিক কর্মসূচিকে আশ্রয় করতে পারে না বলেই ওই উৎকেন্দ্রিকতা জন্ম লাভ করে।

বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মধ্যবিত্তমনের, উপরে উল্লেখিত নিরালম্ব আদর্শগত অবস্থানই উৎকেন্দ্রিক রাজনীতির জন্মক্ষেত্র। ওই উৎকেন্দ্রিকতাই ক্ষুদ্রতা, মহত্ত্ব, আত্মত্যাগ, আত্মসর্বস্বপরায়ণতা প্রমুখ পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যে বিখণ্ডিত মধ্যবিত্তমনকে অস্থির ও তাৎক্ষণিক করে তোলে। মধ্যবিত্ত ব্যক্তির হৃদয়বৃত্তি ও পরোপচিকীর্ষার বোধের সততা কখনও কখনও দয়া-দেখানোকে অর্থাৎ গরিবের বা অন্য কোনও ব্যক্তির উপকার করার মনোভাবকে নিজেকে শ্রেষ্ঠতর জীব হিসাবে মনে করবার নিঃশব্দ প্রবণতায় দাঁড়িয়ে যায়।

ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত মানুষেরা মানুষ-প্রজাতির অংশ বলেই তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় হলেও চিত্তবৃত্তিতে-সমৃদ্ধ সংবেদনশীল আত্মপ্রত্যয়ে স্থিতধী এন্‌লাইটেন্‌ড মানসিকতার উৎপত্তি অসম্ভব হয় না। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজ তাই সামগ্রিক উৎকেন্দ্রিক মানসিকতার মধ্যেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিদের ব্যতিক্রমধর্মী আবির্ভাবকে সম্ভব করে তোলে। সুস্থির নির্মাণধর্মী প্রবণতায় এঁরা সৃজনশীল চিন্তাকে বাস্তবধর্মী প্রয়োগের পথে নিয়ে যান। অপেক্ষাকৃত অখ্যাত আরও অনেক অনুরূপ ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করা যায়। এঁদের মধ্যে বিচিত্র মধ্যবিত্তসমাজসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা যে নেই, এমন নয়, তবে সৃজনশীল প্রয়োগের খাতিরে ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তসমাজের উৎকেন্দ্রিকতা থেকে এঁরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত মুক্ত। কিন্তু এঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং প্রচেষ্টাগুলোও পরস্পর বিচ্ছিন্ন।

সামগ্রিকভাবে বিংশশতাব্দীর বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজের আদর্শবাদী মানসিকতা উপরে-উল্লেখিত রাজনৈতিক উৎকেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ওই উৎকেন্দ্রিকতার উপরের চেহারা ছিল প্রচলিত রাজনৈতিক বিন্যাসের ধ্বংসাত্মক নেতিবাদ, ফলে অন্তঃস্থলে ছিল বিকল্প আর্থসামাজিক রূপকল্পের শূন্যতা। ওই শূন্যতার জন্যই উৎকেন্দ্রিক রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য হয় বিদেশি প্রশাসনের সমালোচনা, প্রশাসন দেশি হলে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোন পথ গ্রহণ করত, তা নিয়ে চিন্তাভাবনার পরিপূর্ণ অভাব। বস্তুত বিংশশতাব্দীর মধ্যবিত্ত রাজনীতির ছাঁচ এ ভাবেই গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ওই মধ্যবিত্ত প্রধান রাজনীতি পল্লিঅঞ্চলে বা শহরাঞ্চলে শ্রমজীবী জনসাধারণের রুটিরুজির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রসারিত হলেও, উক্ত রাজনীতির উৎকেন্দ্রিক চরিত্র নিছক রাজনৈতিক ভাঙার কাজকেই একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে লালন করে। অন্যদিকে শ্রমজীবী জনসাধারণ যাঁরা প্রচলিত আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বাহক, তারা নিজেরাও বিকল্প আর্থসামাজিক ব্যবস্থার কোনও রূপকল্প দাঁড় করাতে পারেন না। তাঁরাও রুটিরুজির জন্য মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের আন্দোলনে বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে নিছক তাৎক্ষণিকতার অনুগামী হয়ে ওঠেন।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটেই ঘটে গেল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন বিংশশতাব্দীর প্রথম দশকেই।

যদিও রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের পত্তনের মধ্য দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের একটি দীন নির্মাণধর্মী প্রচেষ্টাকে সূচিত করলেন, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সাম্রাজ্যিক প্রয়াসের বিরুদ্ধে বাঙালির জাতিসত্তাকে অটুট রাখার উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিল হয়ে গেলেন। ওই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ রোধ করা গেল ঠিকই, কিন্তু আন্দোলনের সমসাময়িক মধ্যবিত্তচরিত্রের দেউলিয়াপনার পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু ওই রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেন এমন নয়, মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিদদের উদ্যোগে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়াসও যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিদদের অর্গলমুক্ত হয়ে দেশের আপামর জনসাধারণের নিজস্ব জিনিস হয়ে উঠতে পাবে না — এ আশঙ্কায় জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়াস থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। ১৯০৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর এ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

'ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন — উচ্চতর লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধন ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন — যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনকে এই স্পর্ধা প্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের মঙ্গল সাধন হইতে পারিবে না।

যদি বর্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। **বৃথা চেষ্টায় নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সঞ্চয় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। বিশেষত উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব**... যদি দেশ কোনদিন দেশীয় বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন এবং তাহার কোন সেবাকার্যে আমাকে আহ্বান করেন তবে আমি অগ্রসর হইব — কিন্তু "নেতা" হইবার দুরাশা আমার মনে নাই — যাঁহারা "নেতা" বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি — ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন (বড় হরফ বর্তমান লেখকের)।'[১১]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি যে মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক আন্দোলনের 'নেতা' হওয়ার প্রতিযোগিতায় শামিল হওয়া, আন্দোলনের সাময়িক সাফল্যের জয়ধ্বনির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ তা সঠিক আবিষ্কার করলেন। ওই আবিষ্কারই তাঁকে মধ্যবিত্ত-রাজনীতির প্রতি বিমুখ করে তুলেছিল। বস্তুত তিনি তখন থেকেই একদিকে রাজনীতির পথে দেশ সেবার কাজ যে সম্ভব নয়, এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে গেলেন। অন্যদিকে বিকল্প রাজনৈতিক পথ অন্বেষণের পথে না গিয়ে দেশসেবার বিকল্প রাস্তার অন্বেষণে এগিয়ে গেলেন। ওই অন্বেষণের পথেই জন্ম নিয়েছিল শিলাইদহের রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রস্তুতি পর্ব। দেশপ্রেম রবীন্দ্রনাথের মনে যে প্রত্যয়সিদ্ধ অর্থ গড়ে তুলেছিল তা হচ্ছে বৃহত্তর সমাজের মানুষদের মধ্যে আত্মশক্তি সাধনের চেষ্টায় আদর্শবাদী মধ্যবিত্ততরুণ-সমাজকে নিয়োজিত করা শিক্ষা ও কর্মের মাধ্যমে।

শিক্ষার মূলধন হবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্যের যে ফল্গুধারা যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত, ওই ঐক্যের ধারাকে জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে দেশের মননশীল জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরা, আর কর্মের লক্ষ্য হবে পল্লিঅঞ্চলের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষদের আত্মশক্তির সাধনায় উদ্বুদ্ধ করা। শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে দেশজ সমন্বয়কে রবীন্দ্রনাথের মনে দেশপ্রেমকে চিহ্নিত করেছিল, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি ও শিক্ষার্থীদের কর্মসূচির ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৪–১৫ সাল অবধি বিবর্তনের ধারাতে রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের রূপকল্প পরিস্ফুট। তাঁর ওই চিন্তা বিদেশে অনেক বুদ্ধিজীবীর কাছে তাঁদের নিজ নিজ দেশের পরিপ্রেক্ষিতেও অর্থবহ হয়ে ওঠে। ওই কারণেই রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেম কথাটি ব্যবহার না করে মানুষের ধর্মে শিক্ষা ও কর্মের দিক্‌দর্শন খুঁজে পান।

এক অর্থে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশক রবীন্দ্রনাথের পথ ও পাথেয় অন্বেষণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। একদিকে দেশের অভ্যন্তরীন জগতে দেশসেবার নামে যে মধ্যবিত্ত সমাজকেন্দ্রিক শহুরে রাজনীতির উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল তার মুখোমুখি হয়ে দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়ায় শিলাইদহের গ্রামসমাজের শীর্ণকায় দরিদ্র আর্ত জনসাধারণের জীবনচর্যার দিকে ফিরে তাকালেন, অন্যদিকে প্রথম মহাযুদ্ধের রাষ্ট্রীয় বিবাদ ও সশস্ত্র হানাহানি তাঁকে মানব প্রজাতির অন্তর্লীন ঐক্যের উপলব্ধির পথে নিয়ে গিয়েছিল। উপরে উল্লেখিত ধরনের অন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উন্মাদনার মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন — রাজনীতি রাষ্ট্রনীতিরই প্রাথমিক পদক্ষেপ এংব উক্ত রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির প্রথম ও প্রধান উপজীব্য মনুষত্বের সাধনা নয়, শুধুমাত্র আধিপত্যবাদী ক্ষমতা অর্জন।

একারণেই সমসাময়িককালের ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বভারতীর রূপকল্প গড়ে তুলতে শুরু করেন তার সঙ্গে আধিপত্যবাদী ক্ষমতা অর্জনের রাজনীতির পারস্পরিক অসামঞ্জস্য রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতি-বিমুখ করে তুলেছিল। তাঁর দেশপ্রেমের সুতীব্র অনুভূতি তাঁকে বিশ্বমানবিকতাবোধের সত্য উপলব্ধির এবং প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের পথে নিয়ে গিয়েছিল।

অথচ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মধ্যবিত্ত রাজনীতির আসরে নেবে রাজনীতিকে আধিপত্যবাদী ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ থেকে না সরিয়ে তরুণ রাজনীতিবিদদের অহিংসার মধ্য দিয়ে বিদেশি শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতার পথ বন্ধ করে দেশের মুক্তি অর্জনে তৎপর হলেন। আধিপত্যবদীক্ষমতা অর্জন লক্ষ্য হবে, কিন্তু উপায়টি হবে অহিংস — ওই পরস্পর বিপরীতধর্মী তত্ত্ব বুঝতে না পেয়ে পাঞ্জাবের কৃষকগণ স্থানীয় জমিদার, সুদখোরদের ত্রাণকর্তা বিদেশি রাজশক্তির প্রতীক থানা আক্রমণ করে বসলেন চৌরিচৌরায়, মোহনদাস করমচাঁদ কৃষকদের সহিংস আক্রমণে ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিদেশি প্রশাসনের কঠোর দমননীতির প্রতিবাদে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রান্তরে জমায়েত হওয়া শত শত কৃষকদের যখন বিদেশি সেনাধ্যক্ষ ডায়ার নির্বিচারে হত্যা করে, তখনও মধ্যবিত্ত রাজনীতির অভিভাবক গান্ধী বুঝতে চাইলেন না কোথায় মধ্যবিত্ত রাজনীতি গ্রামে শোষকশ্রেণীর সহিংস আক্রমণের শিকার শ্রমজীবী চাষি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং কেন হিংসার রাষ্ট্রনীতি থেকেই সহিংস প্রতিবাদী শক্তি জন্মায়। থানা আক্রমণে মর্মাহত গান্ধী বা এমনকি তাঁর বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিষ্য-প্রশিষ্যরা জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় নীরব রইলেন। সরকার সংবাদপত্রে উক্ত খবর বিতরণ নিষিদ্ধ করলেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত রাজনীতির আবর্ত থেকে সরে থাকা রাজনীতিবিমুখ-রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে কলকাতার স্বনামখ্যাত মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিদদের

উদ্যোগ নেবার ব্যাপারে গড়িমসি দেখে একাই প্রতিবাদ জানালেন জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রান্তরে নিরস্ত্র জনতার হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং ইংল্যান্ডের রানির দেওয়া খেতাব বর্জন করলেন। প্রতিবাদপত্রের শান্ত সংযতভাষায় জানালেন জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত ইংরেজজাতির পরিচালক যে রাষ্ট্রশক্তি নিরস্ত্র অসহায় মানুষদের জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রান্তর থেকে বহির্গমনের পথ রুদ্ধ করে কাপুরুষোচিত উপায়ে হত্যালীলা সংঘটিত করল, তাঁর দেওয়া খেতাবের তিনি অনুপযুক্ত। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিদদের সক্রিয় নীরবতা পালন রবীন্দ্রনাথকে অধিকতর রাজনীতিবিমুখ করে দিল। মধ্যবিত্ত-প্রধান-রাজনীতি যে বস্তুত আত্মসর্বস্বতার রাজনীতি, যে রাজনীতির উদ্দেশ্য নিছক আধিপত্যবাদী ক্ষমতাদখল, বৃহত্তর দেশের মঙ্গলসাধন নয়, ওই উপলব্ধির সত্যতা রবীন্দ্রনাথের কাছে আবার প্রমাণিত হল। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ছিল বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প রচনার সমসাময়িক।

২ : ৪ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চরিত্রে মধ্যবিত্ত টানাপোড়েন

গান্ধীজি নয় রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় মধ্যবিত্ত ব্যক্তিত্ব যিনি ওই মধ্যবিত্ত রাজনীতির উৎকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মন নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন দেশের মানুষীসত্তার অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধানে। আর তাঁর সন্ধান ছিল প্রয়োগধর্মী। প্রয়োগের আগে তাঁর মনে 'মানুষ' বা 'দেশ' গড়ার কোনও মডেল ছিল না। ছিল শুধু উপনিষদের মানুষ নিয়ে আদর্শায়িত এক রূপকল্পকে অবলম্বন। ওই অর্থে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের উত্তরসূরি। তবে প্রয়োগধর্মিতায় রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে অনেক অধিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন।

১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়বার আগে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু জগদীশ বসুকে লেখা চিঠিতে 'প্রকৃত হিন্দু' গড়বার মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ গড়বারই স্বপ্ন দেখেছিলেন। অথচ 'প্রকৃত হিন্দু' গড়বার জন্য কোনও আত্মিক রূপকল্প তাঁর মনে ছিল এমন মনে হয় না। হয়ত ছিল তাঁর পিতৃদেবের ব্রাহ্মণ্যধর্ম-ঘেঁষা কিছু হিন্দুয়ানি সংস্কারের প্রভাব, অবশিষ্ট ছিল বিমূর্ত আদর্শ থেকে বিচ্ছুরিত কিছু বাহ্যিক আচার-আচরণ, জীবনধারণ-প্রণালী নিয়ে অস্পষ্ট ধারণা। যেমন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষার্থীগণ বিলাসিতা বর্জন করবে, স্বাবলম্বী হবে, দরিদ্রের ন্যায় জীবনযাপন করবে আর খোলা প্রকৃতির আঙিনায় বড় হবে। এর কোনওটিতে 'হিন্দুত্ব' নেই, অন্য যে কোনও ধর্মাবলম্বীরাও উপরোক্ত সবকয়টি আচরণকেই মানুষ গড়ার কাজে যোগ্য মনে করতে পারেন। 'অতীতের প্রকৃতি' ও 'আশ্রম বিদ্যালয়ের জীবন-প্রণালীতে' সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় এবং শোবার আগে বেদমন্ত্র বা উপনিষদের স্তোত্র গাইবার বাধ্যবাধ্যকতা'[১২] ছাড়া শিক্ষার্থীদের ব্রাহ্মঘেঁষা হিন্দুত্ব চিহ্নিত করবার আর কিছু ছিল না। শিক্ষার্থীদের ব্রাহ্মণ শিক্ষককে প্রণাম এবং অব্রাহ্মণ শিক্ষককে নমস্কার জানানোর ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর 'প্রণাম' উঠে গেল। রয়ে গেল শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অসাম্প্রদায়িক উপনিষদ মত'— যে মতে আশ্রমের ট্রাস্টডিডের বিধি-অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অন্যতম কর্তব্য ছিল প্রতিদিন চারবার বেদ ও উপনিষদ থেকে নির্বাচিত শ্লোক গেয়ে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করা। রবীন্দ্রনাথের কাছে ওই শ্লোক হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি কোনও বিশেষ ধর্মীয়সম্প্রদায়ের ব্যাপার ছিল না, ছিল মানুষের ধর্মের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু সহকর্মী শিক্ষকগণ কতটা রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করতেন তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সন্দেহটি প্রকট হয় যখন কয়েক বৎসর পরে একটি মুসলমান বালক শিক্ষার্থী হবার আবেদন করলে কোনও শিক্ষকই আবেদন গ্রহণে নির্ভয় হতে না পেরে ব্যাপারটি গুরুদেবের কাছে মীমাংসার জন্য নিয়ে এলেন। বিনা দ্বিধায় রবীন্দ্রনাথ তাকে শিক্ষার্থী হিসাবে গ্রহণ করলেন। এর পরবর্তী অধ্যায়ে আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ধর্মশিক্ষাদানের নীতি ও আচরণ কোন পথে এগিয়েছিল তৎকালীন ইতিহাস থেকে ওই তথ্য পাওয়া কঠিন। যেটুকু তৎকালীন ইতিহাস থেকে দেখা যায় তা হচ্ছে— প্রথমত আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্রমশ কল্পিত আশ্রমজীবনের হিন্দুয়ানি শৃঙ্খলায় শিথিলতা। দ্বিতীয়ত শিক্ষার্থীদের 'আদর্শ মানুষ' গড়বার কড়াকড়ি থেকে মুক্তি।'[১৩]

তবে যে মানসিকতা ১৯১৬ সাল থেকে ১৯১৭ অবধি অন্তত প্রতিষ্ঠাতার লেখাপত্রে আশ্রম বিদ্যালয়ের কাছে, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা আগের মতো শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক ছিল না, প্রধানত শিক্ষা-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি না হলে ছোট ছোট শিশুদের অনন্ত জিজ্ঞাসার ফল্গুধারাকে বেগবান স্রোতস্বিনীতে কে রূপান্তর করবে, কে শিশুদের চিত্ত উদার ও ভয়শূন্য করে গড়ে তুলবে এবং বিশ্বমানসিকতায় দীক্ষিত করবে ? তাই রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে খুঁজছিলেন ওই তপস্বীকে যিনি নিজেই অনন্ত জিজ্ঞাসার পথের পথিক, মানবিক সর্বজনীনতায় যিনি নির্ভীক ও উদার, মানুষেরধর্মে যিনি বিশ্বময়।

পরিপূর্ণভাবে বিকশিত মানুষ গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে যে আশ্রম বিদ্যালয়ের পত্তন, সে পরিকল্পনায় পথ ও পাথেয় রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তন করলেন কঠিন বাস্তবতার অভিজ্ঞতায়। শিক্ষকগণ অনেকেই ত্যাগব্রতী, আদর্শবাদী, কিন্তু কোথায় তাঁদের

বিশ্বমানুষ গড়ে ওঠার তপস্যা ? সকলেই এসেছেন ছাত্রদের পড়াতে, জ্ঞানের মাপকাঠিতে কে কতটা সফল ছাত্র তৈরি করতে পেরেছেন, তার হিসাবনিকাশেই তাঁরা ব্যস্ত। তাঁদের সফলতার নির্ধারক হল এনট্রান্স পরীক্ষা। পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তুলবার জন্য তো আশ্রম বিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল, এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ভাল ফল করবার জন্য তো নয়। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন — উৎকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তমন যত সহজে কোনও না কোনও বিমূর্ত আদর্শবাদকে আলিঙ্গন করে, তত সহজে মানুষীমনের গতিময়তার স্তরে স্তরে নিজেকে বাস্তব প্রয়োগের দ্বারা ভাঙা-গড়ার কাজে নিযুক্ত করতে পারে না। আবেগের ধাক্কায় দু'দিন কর্তব্য পালন করে প্রচলিত শ্রমবিমুখ ও উদ্যোগহীনতার দাস হয়ে পড়ে। ওই উপলব্ধি থেকেই তাঁর আদর্শবাদী মধ্যবিত্ত মনে একদিকে হতাশা এবং অন্যদিকে অভীষ্ট পথে এগিয়ে যাবার অনমনীয় সংকল্পের মধ্যে টানাপোড়েন তাঁকে অশান্ত ও অস্থির করে তোলে। জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রনাথ হতাশায় ও ব্যর্থতাবোধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আলো দেখাতে পান শিলাইদহ-পতিসরের রবীন্দ্রনাথে। উৎকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মানসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁর ব্যক্তিগত মানসিকতা পথের সন্ধান পায় দেশের কেন্দ্রবিন্দুতে। সেখানে মানুষের জৈবিক অস্তিত্বের সঙ্কটই যে মানুষেরধর্ম থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয় তা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন। তখনই তিনি উপলব্ধি করেন বিত্তবানের দারিদ্র্যবরণে চিত্তের মুক্তি আসে না, যেমন আসেনি পাশ্চাত্যজগতে বিত্তহীনদের বিত্তবান হওয়ার মাধ্যমে। অপরিমিত বিত্তভোগ বা দারিদ্র্যবরণ উভয়ই মানুষকে তার প্রজাতিগত মানবিক কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুত করে।

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির জগতে যখন ওই ভাঙাগড়া চলছিল সমসাময়িক আশ্রমবিদ্যালয়ে তখন এসে গিয়েছিল প্রচলিত উৎকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত 'স্বদেশি' রাজনীতির ঢেউ।

আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে কেউ আশ্রম বিদ্যালয়ের লক্ষ্যপূরণে বিধি ও ব্যতিক্রম নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন না ঠিকই, কিন্তু সকলেই নীরবে একটি প্রচ্ছন্ন ধারণা পোষণ করতেন। তা হচ্ছে— বিদ্যালয়ের আদর্শ রূপায়ণে শিক্ষকদের স্ব স্ব আত্মিক দায়িত্বের চেয়ে গুরুদেবের আত্মিক দায়িত্ব অনেক বেশি। আপাত বিচারে এর জন্য রবীন্দ্রনাথের নিজের কাজের ধরনকে দায়ী করা যায়। প্রথম যে ধরন রবীন্দ্রনাথের কাছেই অস্বস্তিকর ছিল তা হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা। নামে গুরুদেব হলেও কাজে ছিলেন অঘোষিত কর্তাব্যক্তি। এ বাস্তবতায় কোনও শিক্ষক বা শিক্ষার্থী চেতনায় বা কর্মসূত্রে স্বাধীনভাবে বিদ্যালয়ের সত্তা পরিচয়ে নিজেকে একাত্ম করে পেতে পারেন না। অন্য যে কাজের ধরন রবীন্দ্রনাথের ও শিক্ষকদের মধ্যে দেয়াল তুলে ফেলতেন তা হচ্ছে, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব বণ্টন সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা আশ্রমিকদের যৌথ আলোচনার নিরিখে কমই হত। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বিদ্যালয়ের সুকুমারমতি বালক শিক্ষার্থীদের কর্মশিক্ষার ভার অর্পণ করলেন নবাগত ক্ষিতিমোহন সেনকে। বিদ্যালয়ের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দায়বদ্ধতাবোধ এতটাই সুতীব্র ছিল যে নিজের অজান্তেই নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছা দু' একজন সুনির্বাচিত অধ্যাপক বা শিক্ষকের কাছেই মাত্র প্রকাশ করতেন এমন শুধু নয়, বাস্তব রূপ যাতে পায় তার আশাও করতেন। উপরোক্ত অবস্থায় বিদ্যালয় শিক্ষকদের নিজ নিজ সাধনার ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারেনা বা রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় শিক্ষকদের সাধনা শিক্ষকসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে না। এর ফলে অনেক দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহে কর্মীসাধারণ রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার শরিক হতেন না, শুধু তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতেন। শিক্ষকরা কীভাবে শিক্ষাদান করবেন, এ ব্যাপারে তাঁদের নিশ্চয়ই স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু বিদ্যালয় তো শুধুমাত্র শিক্ষাদানের বা ছাত্র পড়াবার কাজে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথই চাইতেন আশ্রমজীবনের সামগ্রিক সাধনার অংশ হিসাবে শিক্ষকদের পড়ানোর কাজ হবে গৌণ কর্মসূচি, মুখ্য হবে শিক্ষকদের নিজ নিজ সৃষ্টিধর্মী মানুষীসাধনার সঙ্গে শিক্ষার্থীর অনুরূপ সাধনার মেলবন্ধন। ব্যাপারটি কঠিন রবীন্দ্রনাথ ওই কঠিনকেই ভালবাসতেন। শিক্ষকগণ সাধারণভাবে কঠিন কাজেই নিজেকে জড়াবার জন্য নিজের অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির সাধনা করতে চাইতেন না।

ওই মুখ্য কাজ নিছক কর্মশিক্ষাদানের মাধ্যমেও সম্ভব হয় না, পারস্পরিক মানসিক আদান প্রদান, আত্মত্যাগের বোধ, ও সহযোগিতাধর্মী কর্মপ্রবাহের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। এ কারণেই বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কল্যাণকর পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য বলে প্রতিষ্ঠাতার কাছে পরিগণিত হত। ওই মুখ্য কাজের নির্ধারক ছিল পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ গড়ার কাজে এগিয়ে যাওয়া। যতটা শিক্ষার্থীর, তার চেয়েও বেশি শিক্ষকসাধারণের। ওই কাজে আশ্রমবিদ্যালয় কতটা সফল হয়েছিল, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত হতে পেরেছেন এমন কোনও লেখা রবীন্দ্রনাথের নেই। বরং অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ যে জর্জরিত থাকতেন, তাঁর চিঠিপত্রে তা দেখা যায়।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের আশ্রমবিদ্যালয়ের পথ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট তিনি মধ্যবিত্তসমাজেই এবং ইংরেজি শিক্ষায় সফল শিক্ষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। যাঁরা পড়তে বা পড়াতে আশ্রম বিদ্যালয়ে আসতেন, তাঁরা সকলেই শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ওই সীমাবদ্ধতার হাত থেকে রেহাই পান নি। বিদ্যালয় কেন তাঁর অভীপ্সিত পথে চলতে পারছিল না, তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা

মানসিক যন্ত্রণা পাননি এমন ধারণা বাস্তব নয়, কিন্তু সরব অভিযোগ কোনও সহকর্মী শিক্ষকের বিরুদ্ধে তিনি করেননি, মনে করতেন ব্যর্থতার দায়ভাগ একমাত্র নিজের। নিজের মনেই নিজের পথ খোঁজার, অনেক নীরব প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন। এখানে কোনও সাথি না পাওয়ার দায়ভাগ তো রবীন্দ্রনাথের নিজেরই।

অবশ্য সরব অভিযোগ তুলেছিলেন বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কিছু কিছু হীনমন্য রাজনীতিবিদগণ। কার বিরুদ্ধে? রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। কারণ রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক চরিত্রের শিক্ষা এবং রাজনীতি দ্বারা দেশের প্রকৃত মুক্তি আসবে না বলে প্রচার করতেন তাঁর লেখায়, বলায় এবং আশ্রমবিদ্যার কার্যসূচিতে।... 'দেশকে মুক্তি দিতে হলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে...' রবীন্দ্রনাথের এ ধারণা রাজনীতিবিদরা পছন্দ করতেন না, যুক্তি দিয়ে প্রতিবাদও করতে এগিয়ে আসতেন না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ 'দেশকে শিক্ষা দিতে হবে' বলে শিক্ষার চরিত্রটা কী বোঝাচ্ছেন, এটুকু উপলব্ধি করবার ধৈর্য্য বা মানসিকতা তৎকালীন মধ্যবিত্তসমাজের তথাকথিত শিক্ষিত সংবেদনশীল লোকদের চিত্তেও ছিল না। রাজনীতি যাঁদের পেশা ছিল, তাঁদের না বুঝতে পারাই স্বাভাবিক। তৎকালীন বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজের কাছে 'শিক্ষা' কথাটির একটি মাত্র তাৎপর্য ছিল। 'লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।' অন্যদিকে যাঁরা 'শিক্ষা' কথাটিকে নিছক 'সর্বজনীন শিক্ষা' বুঝেছিলেন তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। ওই স্তম্ভিতদের দলেই ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্তসমাজের প্রতিষ্ঠাবান বুদ্ধিজীবীগণ এবং গান্ধীজি স্বয়ং। তাঁদের প্রশ্ন ছিল পরাধীন ভারতবর্ষের শহরে ও গ্রামে যখন বিদেশিশাসন ও তাঁর অনুচরগণ শ্রমজীবী মানুষদের অহর্নিশ শোষণ ও বঞ্চনার কারাগারে বন্দি করে রেখেছেন, তাঁদের বন্দিদশা না ঘুচলে প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা হবে কী করে? তাঁদের মতে শিক্ষার বিকিরণে রাজনৈতিক পরাধীনতাই তো অনতিক্রম্য বাধা। গ্রামে জমিদারের পাইক পেয়াদা স্কুল দেখলেই ভাঙবার চেষ্টা করতেন কেন তা কি রবি ঠাকুর বোঝেন না?

ভুল বোঝাবুঝির আসল সমস্যা ছিল অন্যত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই জানতেন যে পল্লিঅঞ্চলে জনশিক্ষার প্রসারে গ্রামে জমিদারবাবু আতঙ্কিত হতে পারেন, সুদখোর ও মহাজনেরা অক্ষরজ্ঞানের অভাবের সুযোগে দরিদ্র চাষিকে শোষণ ও বঞ্চনার যে অবকাশ পেয়ে যান, চাষির জমি ও ফসল নিয়ে তাদের ভোগলালসা যেভাবে চরিতার্থ করতে পারেন, পল্লিসমাজে ভেদবুদ্ধির আখড়া যে উপায়ে গড়ে তুলতে পারেন, গরিবের অক্ষরজ্ঞান, অঙ্ক শেখা, উপরে উল্লিখিত আর্থসামাজিক ধরনের ব্যবস্থায় অনর্থ সৃষ্টি করতে পারে বলে গ্রামের কায়েমি স্বার্থ স্কুলশিক্ষার প্রসারকে বাধা দেবে। এসব তথ্য বা সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের অচেনা নয়। যদি জনশিক্ষার উদ্দেশ্য হয় নিছক লেখাপড়া বা অঙ্ক শেখা, তাহলেই চাষিদের মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে, এটাও রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায় বাস্তব অবস্থার অতি সরলীকরণ। কেন? কারণ লেখাপড়া শিখেই দুই পা দুই হাত ও শির নিয়ে মানুষী শরীর শুভবুদ্ধির জগতে চলে গিয়ে দেবতা বনে যায় না, তাঁর মনে ভোগলালসার হাতছানি, ক্ষোভ দ্বেষ নিষ্ঠুরতা জমিদার মহাজনবাবুদের মতোই অক্ষুণ্ণ থাকে। ফলে জমিদারের জমি তার হাতে গেলে সে যে আরেকজন ক্ষুদে জমিদার বা মহাজন না হয়ে তার লোভলালসাকে মনের কোণায় ঘুম পাড়িয়ে রাখবে তার গ্যারান্টি কোথায়? যাঁরা আগে স্বরাজ সাধন, তারপর চাষিদের উন্নতির কথা বলেন, তাঁদের কাছেও রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন — স্বরাজসাধনটা কি শুধুমাত্র শিক্ষিত ভদ্রলোকদের দায়িত্ব? স্বরাজসাধনের কাজ হয়ে গেলে ভদ্রলোকেরা বিদেশি শাসকদের মতো ছোটলোক সমাজকে ঠকাবে না, ওই গ্যারান্টি কোথায়?'[১৪] সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে, দেশের মুক্তির ব্যাপারে শ্রমজীবী মানুষদের সামবায়িক আত্মশক্তির বোধন না করে স্বরাজসাধন ব্যাপারটা তামাশা হয়ে যেতে বাধ্য হবে। আর পল্লিঅঞ্চলের ওই শ্রমজীবী মানুষকে দিতে হবে সামবায়িক কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হবার শিক্ষা। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের সব কথাই মেনে নিয়েছিলেন। যে কথা মানতে পারেননি, তা হচ্ছে শ্রমের উপকরণ বাদ দিয়ে আত্মনির্ভরশীলতার প্রকাশের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ একথা অস্বীকার করেননি তাই শেষ অবধি বলছেন: 'পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণ সঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভেতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।' এজন্য কি প্রয়োজন ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন? রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিতপথ ভেবে উঠতে পারেননি। তারই স্বীকৃতির মতো শোনায় যখন রবীন্দ্রনাথ বলছেন: 'কেমন করে সেটা হবে [অর্থাৎ কেমন করে পল্লির সঞ্চারিত প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভেতর থেকেই উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবে] সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল ভাবছি। ভাল জবাব দিয়ে যেতে পারব কিনা জানিনে, জবাব তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে।'[১৫] কালটা হচ্ছে ১৯২৬ সাল শ্রীনিকেতনে পল্লিসংগঠনের কাজে ও কথায় যখন রবীন্দ্রনাথ নিযুক্ত। প্রয়োগের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ পথ খুঁজছেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু এটুকুই নিশ্চিত ছিলেন — স্বরাজসাধনের ব্যাপারটি মুষ্টিমেয় কিছু নেতার নয়, এটা গোটা দেশের নিজেকে বাঁচাবার শক্তি অর্জনে, 'তা বিশেষ আইনের দ্বারা অর্জিত হয় না, চরকায়, খদ্দরে বা চার-আনাক্রীত কংগ্রেসে ভোট দেবার অধিকারে হয় না।'

এ সব কথা রবীন্দ্রনাথ বলছেন এ শতাব্দীর দ্বিতীয়দশকের মাঝামাঝি। তখনকার রবীন্দ্র-মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিত কী ছিল? শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় নিয়ে ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা, বিশ্বভারতী গড়তে কিছুটা ভরসা করতে পারতেন এমন মধ্যবিত্ত বাঙালি বন্ধুস্থানীয় পণ্ডিতের সঙ্গে মানসিক বিচ্ছেদ, সুরেশ সমাজপতি, ডি. এল. রায়দের রবীন্দ্রনাথ-বিরোধী প্রচার, গান্ধীজির ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে স্বদেশি করেন এমন মধ্যবিত্তসমাজের তরুণ বাঙালিদের ভেসে যাওয়া, আধিপত্যবাদী ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না অথচ বিশ্বভারতীকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যার মিলনক্ষেত্র বলে ঘোষণা করায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের কিছু সৎ স্বদেশপ্রেমিকের মধ্যেও উচ্চারিত-অনুচ্চারিত সংশয়, 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটির বক্তব্য বিরোধিতা করে স্বয়ং শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদী লেখা, আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেই এন্ড্রুজের নেতৃত্বে চরকাকাটার প্রতিযোগিতা, পল্লি-পুনর্গঠনে এলমহার্স্টের উদ্যোগকে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ভক্ত কিছু ছাত্রের এলমহার্স্টের সহযোগী সেজে তাঁকে ভেতর থেকে বিনষ্ট করার অপচেষ্টা ইত্যাদি আরও অনেক ছোটো বড় ঘটনা, উড়ো কথা এবং এলমহার্স্টকে নিয়ে ফিস্‌ফিসানি প্রচার।[১৬]

চার পাশের এ বিরোধিতার সমুদ্রে রবীন্দ্রনাথ প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর স্বরাজসাধনের দীর্ঘমেয়াদি পথের সাময়িক প্রতিবন্ধক হল গান্ধী-প্রদর্শিত অসহযোগ আন্দোলনের তাৎক্ষনিক আবেগ।[১৭] বস্তুত গান্ধীজির কার্যসূচি বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতন অংশে তেমন কোনও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারেনি, কারণ একমাত্র পাঠভবন ছাড়া অন্য দুটো ভবনে অর্থাৎ বিদ্যাভবন ও কলাভবনে আবেগে ভেসে যেতে পারেন এমন বয়েসের শিক্ষার্থী প্রায় নগণ্য ছিলেন। বিদ্যাভবনের গবেষণা-বিভাগে পাঠভবনের শিক্ষকদের মধ্যে প্রথমদিকের শিক্ষার্থী-গবেষকই অধিক ছিলেন। কলাভবনে নান্দনিকচর্চার প্রকৃতি এমনই ছিল যে ওইখানে শিক্ষার্থীরা রাজনীতির কথা ভাবতে সময়ই পেতেন না। বরঞ্চ কিছুটা সময় ছিল শিক্ষকদের। অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি শিক্ষকদের যতটুকুই সমমর্মিতা থাকুক না কেন, কেউই বিশ্বভারতী ছেড়ে স্বদেশি করবার জন্য চলে যাবার মতো আবেগাপ্লুত হতে পারেননি, শুধু কয়েকজন গোপনে বা প্রকাশ্যে চরকা কাটতেন। পাঠভবনের শিক্ষার্থীদের একটি অংশই স্বরাজ সাধনায় লিপ্ত হয়ে গ্রামে গিয়ে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। যত গোলমাল দেখা দিল এলমহার্স্টের সুরুল গ্রামের কাজ নিয়ে। কিছু অসহযোগী আন্দোলনের অনুরক্ত শিক্ষার্থী আশ্রমবিদ্যালয় ছেড়ে কাজ করতে গেলেন সুরুল গ্রামে। সেখানে অচিরেই গ্রামবাসীদের মধ্যে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করায় তাদের রবীন্দ্রনাথ বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১৮] সাধারণভাবে বিরুদ্ধমত পোষণ করবার অপরাধে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বা বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথ কাউকে বিদায় দেননি।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে ওই সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত মনে গান্ধী-প্রদর্শিত অসহযোগিতার আন্দোলনের দ্বারা স্বরাজ সাধনের জন্য বিদেশি প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করার কৌশল এতই মনঃপুত হয়েছিল যে বিশ্বভারতীর সহযোগিতাধর্মী মর্মবাণী বাঙালি মধ্যবিত্তের উৎকেন্দ্রিকতাসর্বস্ব মনে কোনও দাগ কাটেনি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, নৃত্যনাট্য যতটা বাঙালি মধ্যবিত্ত মনে রসের সঞ্চার করেছিল, বিশ্বভারতীর মর্মবাণী এবং শ্রীনিকেতনের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বৃহত্তর পল্লিসমাজে আত্মশক্তির শিক্ষা প্রসারিত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত আহ্বান একই মধ্যবিত্ত মনের কাছে উলুবনে মুক্তো ছড়ানোর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যদিও রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় গ্রামসমাজকে আত্মশক্তি অর্জনে উদ্বুদ্ধ করানোর কাজে মধ্যবিত্ত সমাজমানসের সংবেদশীল সত্তাকে আমন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল বাস্তবে তিনি কোনও সাড়া পেয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। এমনকি বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতন বিভাগের কর্মী শিক্ষার্থী শিক্ষকদের মধ্যেও অনুরূপ সাড়া পেতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন এমন ধারণা করার অবকাশ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যবিত্ত মনে ওই ব্যর্থতাবোধই তাকে টানাপোড়েনের আবর্তে ফেলে দিয়েছিল।

২.৫ রবীন্দ্র-পরিকল্পিত বিশ্বভারতীতে গ্রামসমাজ গুরুত্ব পেল কেন?

১৯২২ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী-সংক্রান্ত চিন্তার দুই তৃতীয়াংশ দখল করেছিল পল্লিসমাজ ও তার অধিবাসীদের অভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁদের সামবায়িক আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের সমস্যা ও উপায় উদভাবন। এলমহার্স্ট বা পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁদের পুঁথিগত কৃষিবিদ্যা প্রচার না করে প্রথমেই হতে চাইলেন তাঁদের আত্মীয়। শ্রীনিকেতনে কৃষি-ফার্মের ব্যবস্থাপনা সম্ভবত ১৯২৩–২৯ সালে আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৯২২ থেকে ১৯২৮ সাল অবধি আশেপাশের গ্রামের পুকুরসংস্কার গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য-সমবায় গঠন, বয়স্কদের অক্ষরজ্ঞানের ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্গে গ্রামের বারোয়ারি ধর্মীয় বা অন্য যে কোনও উৎসব পালনের যৌথ কর্মপ্রণালী গ্রহণ, ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি গঠন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ওই আত্মীয়তা অর্জনের কাজ শুরু হয়েছিল।

বিশ্বভারতীর কাজকর্মের মধ্যে ওই সময়ে গ্রামপুনর্গঠনের কাজ সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল, এ কথার চেয়েও গুরুতর যে দিক প্রতিষ্ঠাতার ভাবনা-চিন্তায় বা চিঠিপত্রে দেখা যায় তা হচ্ছে দেশের তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তসমাজের ওপর গভীর অনাস্থা। কেন এই অনাস্থার ভাব রবীন্দ্রনাথের মনে

এসেছিল তা সহজেই অনুমেয়। এর কারণ শুধু এমন নয় যে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজ তাকে উপেক্ষা করে ক্ষান্ত হয়নি, যে কোনও সুযোগেই হল ফোটাত, তাঁর বিশ্বমানবতা বোধের অভিব্যক্তিকে বিদেশি রাজশক্তির প্রতি দুর্বলতা বলে প্রচ্ছন্ন অভিযোগ করত। অনাস্থার অন্যতম কারণ অবশ্যই ছিল আশ্রম বিদ্যালয়ের সমাজের চলচিত্র, যা বাইরের বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের অংশ ছাত্র, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মতোই থেকে যাচ্ছিল। প্রতিমাদেবী বা পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির ছত্রে ছত্রে আশ্রমের কর্মী, শিক্ষকদের নিয়ে তাঁর দুঃখ ব্যথা ও বেদনার অভিব্যক্তি ছড়িয়ে আছে।

আশ্রমবিদ্যালয় গড়বার সময় নিজের যৎসামান্য বিত্তের ওপর নির্ভর করায় আশ্রমিকদের মধ্যে তাঁর ওপর সকল ব্যাপারে নির্ভর করার যে প্রবণতা তিনি দেখেছিলেন, তা যেন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের বেলায় না ঘটে, সেজন্য বিশ্বভারতী ১৯১৮ সালের ২৮শে ডিসেম্বর জন্ম নেবার তিন বছরের মধ্যেই বিশ্বভারতীর দায়দায়িত্ব ১৯২১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর সমর্পণ করেছিলেন বিশ্বভারতীর ভারতীয়-অভারতীয় হিতৈষীদের কাছে। তিনি ঘোষণা করলেন: 'আজ বিশ্বভারতী পরিষদের প্রথম অধিবেশন।... আজ সর্বসাধারণের হাতে তাঁকে সমর্পণ করে দেব। বিশ্বভারতীর যাঁরা হিতৈষীবৃন্দ ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরে আছেন... যাঁরা একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, তাঁদেরই হাতে আজ একে সমর্পণ করে দেব।' সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী গড়ে তোলা বিশ্বভারতী পরিষদের প্রথম অধিবেশন অলঙ্কৃত করেছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাঃ নীলরতন সরকার, বিদেশি অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি এবং ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করেন এমন আরও অনেকে।

কিন্তু পরিষদের অধিবেশনে শ্রুতিমধুর বক্তৃতা ছাড়া নামি দামি বাঙালি মনীষীদের কেউই বিশ্বভারতীর দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে এলেন না। বিশ্বভারতী-পরিষদের সদস্য হতে রাজি হলেন না স্যার যদুনাথ, বিজ্ঞানী জগদীশ বসুর মতো কবির ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত বন্ধুগণও। তাঁরা সকলেই ব্যক্তিগত জীবনে পাণ্ডিত্যের সাধনায় যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেছেন। বিশ্বভারতী পরিষদের সদস্য হয়ে তাঁদের নতুন কিছু লাভ নেই, বরং দায়িত্বপালনের বাধ্যবাধকতা চেপে বসতে পারে। হয়তো কান্ট-কথিত 'Laziness' এবং 'cowardice'এর ভূমিকা কারণ ছিল। অথবা রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত বাঙালি বন্ধুদের কাছে নোবেলপ্রাইজ পাওয়া রবি ঠাকুরের দাম অনেক বেশি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রনাথের গ্রামসমাজ সম্পর্কিত ধ্যানধারণার চেয়ে।

(ক্রমশ)

প্রসঙ্গ সূত্র:

১১. চিঠিপত্র, পঞ্চদশ খণ্ড পৃষ্ঠা ৪২—৪৩।

১২. ১৯০৯ সালে ৪ঠা নভেম্বর ক্ষিতিমোহন সেনকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: 'ছাত্রদিগকে ধর্মশিক্ষা দান সম্বন্ধে শান্তিনিকেতন ট্রাস্টডিডের বিধি লঙ্ঘন করা চলিবে না। কোনো অধ্যাপক ছাত্রদিগকে বিশেষভাবে কর্মমত সম্বন্ধে কোনও সাম্প্রদায়িক পন্থায় চালনা করিবার চেষ্টা মাত্র করিবেন না।' (এখানেই দেখা যায় প্রকৃত হিন্দু গড়বার স্বপ্ন থেকে রবীন্দ্রনাথ সরে আসছেন, কিন্তু 'আশ্রমের অসাম্প্রদায়িক ঔপনিষদ মতে' তাঁর ছিল গভীর আস্থা)... প্রভাত সূর্যোদয়ে, মধ্যাহ্নে, সূর্যাস্ত কালে ও শয়নের পূর্বে উপনিষৎ ও বেদ হইতে বিশেষ নির্বাচিত চারিটি কবিতা স্বরসংক্ষেপে সুকণ্ঠ বালকদের দ্বারা গান করাইতে হইবে...

বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য নানক কবীর রামমোহন প্রভৃতি মহাপুরুষদের মৃত্যু দিনে উৎসব করিতে হইবে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ (পূর্বে উল্লেখিত) পত্রসংখ্যা ৮, পৃ. ১১

১৩. **আশ্রমের রূপ ও বিকাশ** প্রথম প্রবন্ধ, পৃ. ৭-২৩

১৪. এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম চৌধুরীকে লেখা: 'রামডের কথা' শীর্ষক চিঠিখানি দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড (১৩৬৮, প.ব. সরকার) পৃ. ৩৪৩—৩৫০

১৫. ঐ, পৃ. ৩৫০।

১৬. এ প্রসঙ্গে লিওনার্দো এলমহার্স্টের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ (Personal reminiscences) দ্রষ্টব্য: L.K. Elmhirst, **Poet and Plowman** (Visva-Bharati, 1973) পৃ: ১৫—৩১

১৭. ঐ পৃষ্ঠা ২০—২২ এখানে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের গোপন কথাবার্তার বিবরণ এলমহার্স্টকে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮. ঐ পৃ. ২২—২৬

প্রবন্ধ

রাসসুন্দরীর আত্মকথা

গুণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

"১২১৬ সালের চৈত্রমাসে আমার জন্ম হয়, আর এই ১৩০৩ সালে আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর হইল। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত দীর্ঘকাল যাপন করিলাম।"

এই দুটি বাক্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছে রাসসুন্দরীর জীবন চরিত। দ্বিতীয় বাক্যটি সে যুগের একজন গ্রাম্য বর্ষিয়সী মহিলার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। 'আমি এই ধরাধামে আসিয়া' বা 'এই পৃথিবীতে আসিয়া' গোছের কিছু না লিখে একেবারে 'ভারতবর্ষ'? 'আমার জীবন' বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় বন্দেমাতরম লেখা হয়নি। ১৮৬৮ সালে অবশ্য লেখিকার বয়স ৫৯, —৮৮ নয়। কিন্তু আত্মজীবনীর প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে মন্মোচ্চারণের মতো বার বার এই নামটি ঘুরে ফিরে আসছে—'আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত কাল গত করিয়াছি' (প্রথম ভাগ, দ্বাদশ দিনে রচনা); 'এই ভারতবর্ষে আসিয়া এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমি জীবনযাপন করিলাম,' 'এই ভারতবর্ষে আসিয়া আমি ৮৮ বৎসর বাস করিলাম (দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম রচনা), 'এইক্ষণে আমার বয়স ৮৮ বৎসর হইয়াছে। ভারতবর্ষে আমি এতকাল পর্যন্ত আছি,' 'ভারতবর্ষে আমি অনেক দিবস আসিয়াছি' (দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় রচনা) —এমন উদাহরণ যত্রতত্র ছড়ানো। 'আমার জীবনের' প্রথম পর্ব প্রকাশিত হল ১৮৬৮ সালে, বন্দেমাতরম রচিত হল ১৮৭৫ সালে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র ভারতকে দেশমাতৃকা হিসাবে কল্পনা করেননি,—তিনি বন্দনা করেছিলেন সপ্ত কোটি মানুষের দেশজননীকে। সেই সপ্ত কোটি করে ত্রিশ কোটি হয়ে আসমুদ্রহিমাচলে প্রতিধ্বনিত হল সে আলাদা প্রসঙ্গ। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় সেই সময় ফরিদপুরের এক গ্রাম্যবধূর মনে ঝাপসা ভাবে আঁকা ছিল এক স্বদেশমূর্তি—সে মূর্তির নাম ভারতবর্ষ।

দেশপ্রেমের যে উন্মেষ এই অন্তঃপুরচারিনীর মধ্যে পাওয়া যায় তা যে নেহাত আকস্মিক নয় সে কথা সেই সময়কার প্রবণতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে অনেকটা স্পষ্ট হয়। পণ্ডিতদের মতে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম ধাক্কা সামলে ওঠার পর বঙ্গদেশে দুটি প্রবণতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—দেশপ্রেম ও ভগবদ্ভক্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল বাঙালি মনীষীর মন এই মিশ্র উপলব্ধিতে গঠিত। অবশ্যই সেই সব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে রাসসুন্দরীর নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয় না। কিন্তু 'আমার জীবন' যাঁরা পাঠ করেছেন এবং এই লেখিকার উত্তরপুরুষদের সম্বন্ধে যাঁরা বিন্দুমাত্র অবহিত তাঁরা একটি বিষয় লক্ষ করে থাকবেন। জাতীয়তাবাদের যে বীজ এই পল্লীবধূর মনে রোপিত হয়েছিল পরবর্তীকালে তা মহীরুহের আকার ধারণ করে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পুত্র-পৌত্রী-প্রপৌত্রী পরম্পরায়। আদি প্রতিমামহী কেবল বীজমন্ত্রের মতো স্বদেশের নামটি উচ্চারণ করে গেছেন—অস্পষ্ট অনুভবের বেশি কিছু প্রকাশ করার মতো পরিবেশ তখনও গড়ে ওঠেনি।

রাসসুন্দরীর প্রথম জীবনে, এমনকী মধ্য বয়সেও স্বাধীনতা সংগ্রাম বলতে যা বোঝায় তার সূচনাই হয়নি। তার উপরে তাঁর জীবন কেটেছে এক হাত লম্বা ঘোমটা দিয়ে, উদয়াস্ত রান্না ও পরিবেশনে, সংসারের সকলের তো বটেই উপরন্তু পরিচিত অপরিচিত অতিথি অভ্যাগতদের সেবায়। এই গণ্ডিবদ্ধ পরিস্থিতিতে কে তাঁকে শুনিয়েছিল ভারতবর্ষের অস্তিত্বের, মহিমার, গৌরবের কথা? এই বোধ কি চারিপাশের পরিমণ্ডল থেকে আহরিত? মনে হয় তিনি জন্মেছিলেন এমন এক সচেতন মানসিকতা নিয়ে যার যোগ্য মূল্যায়ন করার মতো তখন কেউ ছিল না।

প্রকাশনার ইতিবৃত্ত :

রাসসুন্দরীর জন্ম ইংরেজি ১৮০৯ সালে, পূর্ববঙ্গের এক সম্পন্ন জমিদার পরিবারে। পিতা পদ্মলোচন রায় তরুণ বয়সেই মারা যান। এঁদের নিবাস ছিল পাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রামে। বারো বছর বয়সে রাসসুন্দরীর বিবাহ হয় ফরিদপুর জেলার রামজিয়া গ্রামের জমিদার সীতানাথ সরকারের সঙ্গে। ছিলেন রায়, হলেন সরকার। তবে সে যুগে মেয়েদের পদবী উল্লেখ করার প্রথা ছিল না। হয় দেবী অথবা দাসী। সচরাচর ব্রাহ্মণ কন্যা বা বধূরা লিখতেন দেবী। যেমন ঠাকুর পরিবারের স্বর্ণকুমারী কখনও ঠাকুর বা ঘোষাল লেখেননি। একই নিয়মে রাসসুন্দরী তাঁর আত্মচরিতে নিজের নাম লিখেছেন দাসী। এই প্রথা তাঁর পৌত্রী সরলাবালাও কিছুদিন অনুসরণ করে ছেড়ে দেন। পরিবারের সকলে আপত্তি করেন। অতঃপর তিনি লিখতে শুরু করেন সরলাবালা সরকার। রাসসুন্দরীর পৌত্র ডাক্তার সরসীলাল কিন্তু ১৮৯৮ সালে ঠাকুমার যে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ জীবনী প্রকাশ করেন তা 'শ্রীমতী রাসসুন্দরী কর্তৃক লিখিত'। বোঝাই যায় পরিবারের কেউই বৈষম্যমূলক ওই সামাজিক সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না।

সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে, যখন মেয়েদের অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত ছিল গর্হিত কর্ম — রাসসুন্দরী বৃহৎ সংসারের সব দায়-দায়িত্ব পালন করে, সকলের অগোচরে লিখতে পড়তে শিখে নিজের আত্মচরিত রচনা করেন। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত এর প্রথম খণ্ড বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম জীবনচরিত। "আমার ৬০ বৎসর পর্যন্ত শরীরের অবস্থা এবং মনের অবস্থা আমার জীবনের সমুদয় বৃত্তান্ত কিঞ্চিত লিখিত হইয়াছে। এদিকে আর ২৫ বৎসর আমার জীবনের বৃত্তান্ত লেখার দরকার বটে।" পিতামহীর এই সাধ অপূর্ণ থাকেনি। পুত্র কিশোরীলালের পুত্র সরসীলাল সম্পূর্ণ বইটি প্রকাশ করেন। তার সূচিপত্র ছিল এই রকম :

মঙ্গলাচরণ

প্রথম রচনা — স্তব, বালিকা কাল, ছেলেধরার ভয়, গঙ্গাস্নানে গমন, স্কুলের কথা

দ্বিতীয় রচনা — কবিতা, আমার ভয় ও দয়ামাধব ঠাকুর, আমি মায়ের মেয়ে, বাটীতে আগুন ধরা, আমরা তিন ভাইবোন নিরাশ্রয়, দয়ামাধবকে ডাক, পোড়া ভিটায় পরমান্ন, মানুষ না ঠাকুর ?

তৃতীয় রচনা — কবিতা, ঠাকুর কে ? মহামন্ত্র পরমেশ্বরের নাম, আমার ছেলে, খুড়ীমার কথা, আমার প্রথম শোক, বিবাহের কথা, মা তুমি কি আমায় পরকে দিবে, বিবাহের আয়োজন, আমি মায়ের কোল ছাড়া হইলাম।

চতুর্থ রচনা — কবিতা, নৌকার মধ্যে আমার ক্রন্দন ও লোকের সান্ত্বনা, আমার আর এক মা, নতুন বধূ, শ্বশুর বাটি, মাটির সাপের গল্প, আমার সংসারের কাজ, সেকালের বৌদের নিয়ম।

পঞ্চম রচনা — কবিতা, আমার লেখাপড়া শিখিবার সাধ, সেকালের লোকের আলোচনা, পরমেশ্বর তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাও, রামদিয়া গ্রামের কথা, আমার পুত্র ও কন্যা, সংসারের বিবরণ।

ষষ্ঠ রচনা — কবিতা, আমার লেখাপড়া শিখিবার প্রবল বাসনা, স্বপ্নে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যভাগবতের একখানি পাতা, লেখাপড়ায় লোকনিন্দার ভয়, সেকালের লোকাচার

সপ্তম রচনা — কবিতা, গৃহিণী কর্মের ভার, আমার তিনটি ননদ, জয়হরি ঘোড়ার কথা, আমার সন্তান ও সংসারের সুখ।

অষ্টম রচনা — কবিতা, সংসার লহরী, আমার পুত্রবধূ, পুরাণ শুনিবার সাধ, চৈতন্যভাগবত পুস্তক পড়িবার কথা, পুত্রশোকের যন্ত্রণা।

নবম রচনা — কবিতা, সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ, ছাপার লেখা ও আমার ক্রন্দন, লিখিতে শিখিলাম।

দশম রচনা — কবিতা, শরীর তরণী, ২৯ মাঘ শিব চতুর্দশী

একাদশ রচনা —

দ্বাদশ রচনা —

ত্রয়োদশ রচনা — কবিতা, স্বপ্ন বিবরণ, মনের অলৌকিকতা, অন্তরের স্পষ্ট দর্শন, মৃত্যু কল্পনা।

চতুর্দশ রচনা — কবিতা, প্রকাশ্যে ভূতদৃষ্টি

পঞ্চদশ রচনা — কবিতা, কর্তার কথা

ষোড়শ রচনা — রামদিয়ার সন ১২৮০ সালের জ্বর বর্ণন।

দ্বিতীয় খণ্ডের পনেরোটি রচনার কোনও সূচিপত্র নেই। পরে এই বইয়ের আরও কয়েকটি সংস্করণ হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণে দুটি ভূমিকা যুক্ত হয় — লেখেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দীনেশচন্দ্র সেন। দু'জনেই বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এর কিছু অংশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

এরপর ১৯৫৬ সালে আর একটি সংস্করণ হয়। প্রকাশ করেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং। তার পরে ১৯৮৭ সালে আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন নামক প্রকাশনা সংস্থার দ্বারা। কোনও অজ্ঞাত কারণে এই সংস্করণে দীনেশচন্দ্র সেনের ভূমিকাটির শেষ অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে।

অন্তরঙ্গ দলিল :

শুধুমাত্র বাংলায় লেখা প্রথম আত্মজীবনী হিসাবে নয়, 'আমার জীবন' নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সেই যুগের মেয়েদের এমন একটি অন্তরঙ্গ দলিল, এমন একটি সামাজিক চিত্র এই বইয়ে পাওয়া যায় যা পুরুষ লেখকদের কাছ থেকে দুর্লভ। দীনেশচন্দ্র সেন এই কারণে বইটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। "সাধারণত কবিগণ প্রেমকে কেন্দ্রবর্তী করিয়া রমণী চরিত্র আঁকিয়া থাকেন...রমণীর সমগ্র চিত্রটি আমরা প্রায়ই কাব্য বা উপন্যাসে দেখিতে পাই না। ...কবি বা উপন্যাসিক যে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন রাসসুন্দরী সেই স্থান হইতে কথা আরম্ভ করিয়াছেন। কোন পুরুষ শত প্রতিভা বলেও রমণীহৃদয়ের গূঢ় কথার এমন আভাস দিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।"

সম্পূর্ণ স্বয়ংশিক্ষিত এই রমণী সাহিত্য রচনার কোনও কলাকৌশল জানতেন না, ধর্মপুস্তক ছাড়া অন্য কোনও বই পড়ার সুযোগও ঘটেনি অথচ তাঁর ভাষা সহজ, সরল ও সুখপাঠ্য, অত্যন্ত আন্তরিক ও অকপট। তিনি কিছুই গোপন করার চেষ্টা করেননি এমনকী নিজের নির্বুদ্ধিতার কাহিনীও। তাঁর নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তখনকার সামাজিক প্রেক্ষাপট, বিশেষ করে মেয়েদের অবস্থা। ধনী জমিদার গৃহিণী হয়েও কিন্তু তাঁকে উদয়াস্ত সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতে হত। সম্ভবত, পরিবার বৃহৎ বলে সেই অনুপাতে কর্মকাণ্ডও ছিল বিপুল — হয়ত অপেক্ষাকৃত সাধারণ ঘরের বধূ হলে কাজের চাপ এতটা থাকত না। তাঁর নিজের ভাষায়, "ঐ সংসারটি বড় কম নহে, দস্তর মতই আছে। বাটীতে বিগ্রহ স্থাপিত আছেন, তাঁহার সেবাতে অন্ন-ব্যঞ্জন ভোগ হয়। অতিথি পথিক সতত আসিয়া থাকে, তাঁহাদিগকে বাটীর মধ্য হইতে সিধাপত্র দেওয়া হয়। এদিকে রান্নাও বড় কম নহে। আমার দেবর ভাসুর কেহ ছিল না বটে কিন্তু চাকর চাকরাণী প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ জন বাটীর মধ্যে ভাত খাইত। তাহাদিগকে দুবেলাই পাক করিয়া দিতে হইত। বিশেষত ঠাকুরাণী (রাসসুন্দরীর শাশুড়ি) চক্ষুহীন হইয়াছেন, তাঁহার সেবাও সর্বোপরি।...আমি ব্যাকুলচিত্তে ঐ সকল কাজের তরঙ্গ দেখিতে লাগিলাম আর ভাবিতে লাগিলাম আমা হইতে এত কাজ হওয়ার কোন মতেই সম্ভাবনা নাই। আমি মনে মনে এই চিন্তাটি অধিক করিতে লাগিলাম। হে দীননাথ আমার শক্তিতে যে এ সকল কাজ সুসম্পন্ন হয় এমন ভরসাও করি না। তবে যদি হয় সে তোমার নিজ গুণে, তুমি যা কর তাই হবে।"

রাসসুন্দরীর ঈশ্বরপ্রেমে কোনও খাদ ছিল না। ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ধর্মভাবকে পৌত্তলিকতার অনেক উর্ধ্বে উন্নততর আধ্যাত্মিক কল্পনা বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন, "ইহার ধর্ম জীবন্ত আধ্যাত্মিক ধর্ম। জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ইনি ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান, তাঁহার করুণা উপলব্ধি করেন, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, এক কথায় তিনি ঈশ্বরেতেই তন্ময়।"

রাসসুন্দরী ও মদনগোপাল :

ছোটবেলায় রাসসুন্দরী ছিলেন যেমন সরল তেমনই ভীরু প্রকৃতির। একটুতেই ভয় পেতেন, সহজেই চোখে জল এসে যেত। তাঁর মা সাহস দেবার জন্য বলেছিলেন পরমেশ্বর আছেন, তাঁকে ডাকলেই তিনি শুনতে পান, মনে মনে ডাকলেই সে ডাক ঠিক তাঁর কানে পৌঁছয়। এই কথাগুলি বালিকা রাসসুন্দরীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

পিতৃগৃহে বিগ্রহ ছিলেন দয়ামাধব, শ্বশুরগৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মদনগোপাল। মাত্র চোদ্দ বছর বয়স থেকেই এই বিগ্রহ সেবা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সংসারের দায়িত্ব রাসসুন্দরীর উপর এসে পড়ল। তার আগে পর্যন্ত তাঁর শাশুড়িই সব পরিচালনা করতেন। কিন্তু তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাবার ফলে বালিকাবধূর উপর দায়িত্ব পড়ে। বিরাট সংসার, বিশাল কর্মকাণ্ড। রাসসুন্দরী কিন্তু হাসিমুখে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতেন, মদনগোপালের প্রতি অচলা ভক্তি। তাঁর ধারণা ছিল ঈশ্বর তাঁর প্রতি সদয় বলেই তিনি সুস্থ দেহে দীর্ঘকাল সন্তান, পরিবার, পরিজন ও প্রজাদের সেবা করে যেতে পেরেছেন, কখনও এজন্য মনে কোনও খেদ ছিল না। এমনকী লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে যখন মনে প্রবল হল তিনি দিবারাত্র পরমেশ্বরকে ডাকতেন। 'পরমেশ্বর, তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাও...তুমি যদি না শিখাও তবে আর কে শিখাইবে।' শেষ পর্যন্ত নিজের চেষ্টায়, কিছুটা ঘটনাচক্রে, কিছুটা স্বামীপুত্রের সহযোগিতায় রাসসুন্দরী লিখতে পড়তে শিখলেন। তাঁর কিন্তু বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া এ অসম্ভব সম্ভব হত না।

আত্মচরিতে রাসসুন্দরী নিজেকে বড় একটা জাহির করার চেষ্টা করেননি — অনেক কথাই অকথিত থেকে গেছে। মদনগোপালের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে কতটা গভীর ও আন্তরিক ছিল তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পৌত্রী সরলাবালার লেখা থেকে। একবার নাতির অন্নপ্রাশন উপলক্ষে জিনিসপত্র আনা হয়েছে।

'জিনিসগুলি নৌকা হইতে নামাইয়া বাহিরের ভাণ্ডার ঘরে তোলা হইতেছে এই সংবাদ যখন ঠাকুরমাকে একজন দিল, তখন তিনি যেন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জিনিসপত্র মদনগোপালের ভাণ্ডারে না তুলিয়া তোলা হইতেছে বাহিরের ভাণ্ডারে ? কিশোরীর ছেলের ভাতে কিনা এই অঘটন ঘটিল ! কিশোরী কি ভুলিয়া গেল যে, এ বাড়িতে মদনগোপাল আছেন, এ বাড়ির যাহা কিছু উৎসব, সে তো মদনগোপালেরই সেবার মহোৎসব। সেই মহোৎসবের প্রসাদান্নই তো ছেলের অন্নপ্রাশনে তাহার মুখে দেওয়া হইবে, না হইলে কিসের অন্নপ্রাশন ?

বাহিরে নান্দীমুখের ব্যবস্থা হইতেছে, পুরোহিত দুর্গাচরণ চক্রবর্তী মহাশয় নান্দীমুখ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের তত্ত্বাবধান করিতেছেন,

হবিষ্যঘরে নান্দীমুখের জন্য ক্ষীরের নাড়ু ও তিলের নাড়ু পাক করা হইতেছে, ঠাকুরমা নাড়ু করা ছাড়িয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিলেন, তাঁহার দুই চোখের জল তখন নিঃশব্দে গালের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে।

...ঠাকুরমা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছেন, আর আমরা আছি উঠানে দাঁড়াইয়া। কাহারও মুখে কথা নাই।

ইতিমধ্যে খবর পাইয়া বাবা ছুটিয়া আসিয়াছেন।....দাওয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, মা বাড়ি কার? মদনগোপালেরই তো বাড়ি? বাহিরের ভাণ্ডারও মদনগোপালের, ভিতরের ভাণ্ডারও তাঁরই। একটাতে না তুলে যদি আর একটাতে জিনিস তোলা হয়ে থাকে, তাতে দোষ হল কি?

এই হল বাবার সওয়ালের ধারা, বাবা ছিলেন খুব বড় উকিল।

ঠাকুরমা বলিলেন, তাই তো সবই তো তাঁরই। ...কিশোরী ঠিকই বলেছে, বাহির আর ভিতর সবখানেরই মালিক তো মদনগোপালই। (হারানো অতীত)

এই ভাবে সমস্যার সমাধান হল। মদনগোপালের সঙ্গে রাসসুন্দরীর মানঅভিমানের পালাও কম চিত্তাকর্ষক নয়। এই বিষয়ে নানা তথ্যও তাঁর পৌত্রীই সরবরাহ করেছেন। 'আমার জীবনে' যতবার মদনগোপালের উল্লেখ আছে তা ভক্তিরসে আপ্লুত, যেমন "হে প্রভু মদনগোপাল কাত্তালের ঠাকুর। নির্ধনের ধন তুমি দয়ার সাগর। তুমি হে ব্রহ্মাণ্ডপতি পতিতপাবন।" ইত্যাদি। অথবা "হে নাথ করুণাসিন্ধু, হে অনাথ বন্ধু, তোমার লীলার পারাপার নাই। তুমি সাপ হয়ে কামড়াও, ওঝা হয়ে ঝাড়, হাকিম হয়ে হুকুম দাও, পেয়াদা হয়ে মার।" দ্বিতীয় অংশে সম্পর্কটা অনেকটা ব্যবহারিক স্তরে নেমে এসেছে, কিন্তু সরলাবালার স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় মদনগোপাল তার চেয়েও অনেক বেশি ছিলেন রাসসুন্দরীর কাছে—অনেক অন্তরঙ্গ। ছোট ছেলে যেমন মায়ের সঙ্গে দুষ্টুমি করে মদনগোপালও রাসসুন্দরীর কল্পনায় সেরকম ক্রিয়াকলাপ করে বসতেন। অর্থাৎ বিগ্রহ তাঁর কাছে বিগ্রহমাত্র ছিলেন না—ছিলেন জীবন্ত, প্রাণচঞ্চল। ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে উন্নত ধর্মজীবনের কথা লিখেছেন তারই প্রতিফলন আমরা পাই সরলাবালার স্মৃতিচারণে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমাদের দেশে ঈশ্বরের নামে যে বিগ্রহ স্থাপন করা হয়, তাহাকে ঠিক পৌত্তলিকতা বলা যায় না; তাহা ঈশ্বরের স্মারক চিহ্ন মাত্র। তাহাতে পৌত্তলিকতার সঙ্কীর্ণভাব নাই। খ্রিস্টানেরা হিন্দুকে যে ভাবে পৌত্তলিক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, হিন্দুর পৌত্তলিকতা সে ভাবের নহে।" রাসসুন্দরীর মদনগোপাল ঈশ্বরের খোলস ছেড়ে নেমে এসেছিলেন একেবারে তাঁর প্রাণের ঠাকুর হয়ে, যাঁর সঙ্গে তাঁর রাগ-অভিমান-ভালবাসার নিরন্তর টানাপোড়েন চলতেই থাকত। এমনকী মদনগোপালের উপর গোঁসা করে অনশন ধর্মঘট করেছেন এমন ঘটনাও সরলাবালার স্মৃতিচারণে পাওয়া যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে কারণে বইটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেই আধ্যাত্মিকতা কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেনকে তেমন খুশি করতে পারেনি। তাঁর মতে, "শেষাংশে এই ধর্মতত্ত্ব একটু বেশি নিবিড় হইয়া ইতিহাসের দিকটা খর্ব করিয়া ফেলিয়াছে—শেষাংশটি প্রথমাংশের ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক ও হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।"

জমিদারি সংক্রান্ত সমস্যা :

আত্মকথায় রাসসুন্দরী বার বার উল্লেখ করেছেন তাঁর ভীরু প্রকৃতির কথা। ছোটবেলায় তো বটেই পরে সংসারের কর্ত্রীরূপেও তিনি লোকলজ্জার ভয়ে নিতান্তই কাতর হয়ে থাকতেন। পাছে লোকে কিছু বলে এই আশঙ্কায় বইয়ের দিকে তাকাতে পর্যন্ত ভরসা করতেন না। অথচ তাঁরই বিবরণে আছে স্বামী, পুত্র ননদ সকলেই তাঁর পড়ার আগ্রহের কথা শুনে খুবই আনন্দিত হন। সুতরাং তাঁর লজ্জা এবং ভয় অনেকটা অহেতুকই ছিল বলা যায়। অথচ তাঁর প্রকৃতিতে আশ্চর্য বৈপরীত্যও লক্ষ করার মতো। 'আমার জীবনে' মাত্র একটি ঘটনার কথা আছে—যখন স্বামীর অনুপস্থিতিতে তিনি খুবই সঙ্কটজনক অবস্থা যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে সামাল দিয়েছিলেন। ঘটনাটি ছিল একটি মামলা সংক্রান্ত। তাঁর কথায়:

"সেই মিরালি (মীর আলি) আমুদের সঙ্গে ক্রমাগত তিন পুরুষ পর্যন্ত মোকদ্দমা চলিয়াছিল। ঐ কর্তাটির (অর্থাৎ রাসসুন্দরীর স্বামী) উত্তর দেশে কতকটা এলাকা আছে। একবার তিনি সেই উত্তর দেশে যান। তখন সকল ছেলে আমার জন্মে নাই, কেবল বড় ছেলে বিপিনবিহারী ৬ বৎসরের হইয়াছে। বাটিতে কেবল সেই ছেলেটি আছে। ইতিমধ্যে এক দিবস সেই মিরালি আমুদ হুকুম দিয়া হাঁদিগের অনেক প্রজাকে অনেক প্রকার যাতনা দিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে লাগিল। তখন বাটিতে যে গোমস্তা ছিল, সে পীড়িত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যান্য যে সকল লোক ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, আমাদের কি সাধ্য আমরা কি করিতে পারি। বাটিতে কেবল আমি আছি, আমিও তদ্রুলা মামলা মোকদ্দমা কিছুই বুঝিতে পারি না। বিশেষত এসকল কর্মের আমি কর্তাও নহি। তখন ঐ প্রজাদিগের পরিবারগণ আমার নিকট আসিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং তাহাদিগকে যে প্রকার প্রহার এবং যাতনা দিয়া খাজনা আদায় করিয়া লইতেছে তাহা সমুদয় বলিয়া বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল। উহাদিগের কান্না দেখিয়া এবং ওই সকল যাতনা মনে করিয়া আমার অসহ্য যন্ত্রণা হইতে লাগিল। আমার যে ছেলেটি লইয়া বাটিতে আছি,

সে ছেলেটিও পত্রলেখার উপযুক্ত হয় নাই। তখন আমি ওই ছেলেটিকে উপলক্ষ করিয়া একখানি পত্র দিয়া একজন লোককে মিরালি আমুদের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। ওই পত্র পাইয়া মিরালি আমুদ পরম সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের প্রজাগণকে খালাস দিলেন এবং মিরালি আমুদ নিজে উদযোগী হইয়া তাঁহাদিগের প্রধান দুইজন মুরুব্বিকে আমাদিগের বাটিতে পাঠাইয়া সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন। কর্তাটি বাটিতে নাই, তাঁহার বিনা অভিপ্রায়ে এত বড় একটা কাজ করিয়া আমার মনে অতিশয় ভয় হইল।"

কিন্তু তাঁর ভয় অমূলক প্রতিপন্ন হল। স্বামী সীতানাথ সরকার ফিরে এসে সব ঘটনা শুনে খুবই খুশি হলেন। রাসসুন্দরী নিজে যেসব কথা লেখেননি সেই সব তথ্য পাওয়া যায় তাঁর পরম স্নেহের পৌত্রী সরলাবালার লেখা থেকে। সরলাবালা লিখেছেন, তাঁর ঠাকুর্দা তামাশা করে বলতেন, 'বউরাণী আবার পাকের ঘরে ক্যান, উনি তো গিয়ে বসবেন কাছারিতে, আর আমারই তো থাকবার কথা ঘোমটা দিয়ে পাকের ঘরে।' (পিঙ্কুর ডাইরি)

স্বাভাবিক বিনয় এবং সঙ্কোচবশে অনেক কিছুই সবিস্তারে লেখেননি রাসসুন্দরী। যেমন সেই যুগের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কথা। তাদের মারামারিও হত আবার মিলেমিশেও থাকত তারা। বেশির ভাগ জমিদার ছিলেন হিন্দু—প্রজা মুসলমান। আবার মুসলমান জমিদারও ছিলেন। তেমনই একজনের সঙ্গে মামলা মিটমাটের উল্লেখ আছে 'আমার জীবন' বইটিতে। ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় সরলাবালার বিভিন্ন লেখায়—হারানো অতীত, পিঙ্কুর ডাইরি এবং অন্যান্য প্রবন্ধে। রাসসুন্দরীকে ভাল করে বুঝতে গেলে লেখাগুলি পড়া দরকার। তা না হলে ঘটনাবলী এবং সমকালীন সমাজ সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ হয় না।

'ঠাকুমা ছিলেন যেমন ভীতু, তেমনই ভালমানুষ, তাঁর ঘোমটা সবসময় নাকের উপর থাকে, আবার কখন-কখন গলা পর্যন্তও নামে। এ তো আমি নিজেই দেখেছি। ভুব দেবার সময়েও ঘোমটা ঠিকই আছে। সেই ঠাকুমার কাছে দুরন্ত রাগী মুসলমান জমিদার জব্দ হলেন, এটা কি অবাক-করা কথা নয়?

সেকালের মুসলমানেরা নানারকম মতাবলম্বী ছিলেন। যাঁরা মহরমে তাজিয়া বানিয়ে হাসান-হুসেন করতেন তাঁদেরই ধর্মের কেউ কেউ বলতেন তাহলে আর হিন্দুদের পুতুল-পুজো কি দোষ করল। সত্যনারায়ণের পুজো দিত হিঁদুরা, মুসলমান মতে সিন্নি দিয়ে। আর সত্যপীরের পুজো দিত মুসলমান, নারায়ণের জায়গায় একটা 'পীর' বসিয়ে। আবার বসন্তের সময় শেতলা ঠাকরুণের চরণামৃত আর ওলাওঠার সময় ওলাবিবির পুজো দেওয়া—এতে হিন্দু-মুসলমানের কোনো তফাত ছিল না। হিঁদুরাও ঘোড়া গড়ে গড়ে ঘোর-সাহেবের দরগার বটতলায় স্তূপাকার করত, যে ছেলের অসুখের জন্য এই মানত করত সে চার পায়ে ঘোড়ার মত হেঁটে হেঁটে দরগায় যেত, তার মা-ই নিয়ে যেত তাকে। এদিকে আবার মদনগোপালের নামেও চিনি মানতো মুসলমানেরা। এই তো সব ব্যাপার, এর মানে বোঝা মুশকিল'। [সেকালের হিন্দু-মুসলমান, পিঙ্কুর ডাইরি]

এ হল সরলবালার বিবরণ। কিন্তু যে কথা ভরসা করে রাসসুন্দরী তাঁর আত্মচরিতে লিখতে পারেননি, নাতনির কাছে অসঙ্কোচে সে সব গল্প করেছেন। সম্ভবত এই ঘটনাটি এতই অভিনব যে পরিবারে এবং গ্রামে সকলের মুখে মুখে ফিরত।

ঘটনাটা সংক্ষেপে এই। সামসুল হুদা নামে একজন অত্যাচারী জমিদার ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানা লোক, কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। কিন্তু গ্রামে এসেই প্রজাদের উপর এমন উৎপীড়ন চালাতেন যে ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। এদিকে রাসসুন্দরীর স্বামীও ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ। অনেক লাঠিয়াল ছিল তাঁর। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে হুদার লোকজনেরা এসে ধান কেটে নিচ্ছে, বিল থেকে মাছ ধরে নিচ্ছে—ইত্যাদি নানাভাবে সরকারদের এলাকায় প্রজা-নির্যাতন করছে। নায়েব এসে রাসসুন্দরীকে জানালেন যে তাঁদের লাঠিয়ালরা লাঠিতে তেল মাখিয়ে প্রস্তুত কর্তামার হুকুম পেলেই মারামারি শুরু করে দেবে। রাসসুন্দরী নায়েবকে বলেছিলেন হুকুম দেবার আগে আমি হুদা সাহেবকে একটা চিঠি লিখে জানতে চাই তিনি কি দাঙ্গাহাঙ্গামা চান, না মিটমাট।

তখনকার কালে এ অতি অসম্ভব প্রস্তাব। হিন্দু ঘরের বধূ চিঠি দেবেন মুসলমান জমিদারকে? শেষ অবধি রাসসুন্দরীর এই চিঠিতেই কাজ হয়েছিল—তার উল্লেখ আমরা 'আমার জীবনে' পাই। নাতনির কাছে রাসসুন্দরী বলেছিলেন সেই চিঠির বয়ান কী ছিল।

'ঠাকুমা বললেন, চিঠিতে লিখেছিলাম, 'বহুত বহুত তসলিম, ভাইসাহেব, ভাই মনে করে আরজি জানাচ্ছি আপনার কাছে। আপনি বড় ঘরানা, তায় এলেমদার, যখন কর্তা নেই দেশে, তখন এই অরক্ষিত বেচারি প্রজাদের উপর হামলা করা আপনার মত মানুষের ইমানে কি ঘা দিবে না? ভাইয়ের যদি অসম্মান হয় তাতে বোনেরও অসম্মান, এক বাংলাদেশেরই মানুষ আমরা, এতে এই বাঙালী জাতেরও মান যাবে ভিন দেশের কাছে।' চিঠিটা এই ধরনের ছিল। আর মদনগোপালের প্রসাদী পায়েস আর মিষ্টিও পাঠিয়েছিলাম, প্রসাদ মুখে দিলে যদি তার সদ্বুদ্ধি হয়। কিন্তু হযত হিঁদুর দেবতার প্রসাদ খেতে চাইবে না, তাই লিখেছিলাম, 'ঠাকুরের প্রসাদে দোষ নেই বলেই পাঠাতে ভরসা করলাম, গাজী সাহেবের সিন্নি আমরাও মাথায় করে নিই। যদি গুণা হয় মাপ করবেন।'

এই চিঠিতে ম্যাজিকের মতো কাজ হল। সরলাবালার কথায় হুদা সাহেব অনেক উপঢৌকন নিয়ে নিজেই এসে উপস্থিত। বহেন সাহেবকে বহুত বহুত সেলাম জানিয়ে তিনি নায়েবের মারফত বলে পাঠালেন যে আর কোনও মামলা হবে না। তিনি কোর্টের দরখাস্ত এনেছেন এই মর্মে। রাসসুন্দরী কাঁপতে কাঁপতে তাতে সই করে দিলেন।

দুটি বর্ণনায় অবশ্য কিছু অসঙ্গতি আছে। প্রধান অসঙ্গতি হল সই করা নিয়ে। এই ঘটনা যখন ঘটে তখন রাসসুন্দরীর বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। অথচ আত্মজীবনী অনুসারে তিনি লিখতে শেখেন তারও অনেক পরে। তাঁর পুত্র কিশোরীলাল যখন কলেজে তখন মায়ের কাছ থেকে চিঠি না পেয়ে সে অনুযোগ করে। সেই হল রাসসুন্দরীর লিখতে শেখার সূত্রপাত। সম্ভবত তিনি আগে থাকতেই সই করতে জানতেন। বেশি নাটকীয়তার খাতিরে সেই কথা গোপন করেছেন আত্মচরিতে।

চরিত্রে স্ববিরোধ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'আজকাল ধর্মশিক্ষা করিয়া খুব একটা হৈ চৈ উঠিয়াছে।' তাঁর অনুসরণে বলা যায় 'আজকাল নারীবাদ লইয়া খুব একটা হৈ চৈ উঠিয়াছে।' যে কোনও সাময়িক উত্তেজনার মতো এই হৈ চৈ যে দীর্ঘস্থায়ী হবে এমন নয় হয় না কিন্তু তারই মধ্যে আশঙ্কা জাগে রাসসুন্দরীকে নারীবাদীরা তাঁদের আক্কেল দাঁতের চর্চা পদার্থ না বানিয়ে বসেন। সেই কারণেই তাঁর আত্মচরিতের বিশদ বিশ্লেষণ এত জরুরি।

'আমার জীবনে' অকথিত কথাই বেশি আছে। কিছুটা স্বাভাবিক বিনয় এবং ব্রীড়াবশে, খানিকটা প্রকাশের অক্ষমতায় রাসসুন্দরী যা বলতে চেয়েছিলেন তার অনেকটাই বলে উঠতে পারেন নি। পাঠককে বুঝে নিতে হয়। তাঁর স্নেহের পৌত্রী সরলাবালা সরকারের কৃপায় অনেক অলিখিত বৃত্তান্ত পাঠকের গোচরে এসেছে। এই দুই বিবরণ একত্র করলে যে সম্পূর্ণ চিত্রটি ফুটে ওঠে তা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই চিন্তাউদ্রেককারী।

রাসসুন্দরীর তথাকথিত প্রতিবাদী ভূমিকার কথাই ধরা যাক। কোনও অর্থেই তিনি বিদ্রোহ করেননি। এমনকী মনে মনেও নয়। কে কী বলবে এই চিন্তাই তাঁকে সর্বদা অভিভূত করে রাখত। সত্যি বলতে কি বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশ এই কথাটিও তাঁর ক্ষেত্রে একেবারেই খাটে না। সেসময় সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা গর্হিত বলে গণ্য হলেও বাল্যকালে তাঁকে (তিনি অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন নিজেই স্বীকার করেছেন) ছেলেদের স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য অবশ্য তাঁকে অক্ষর পরিচয় করানো নয়, দুষ্টু মেয়েদের সংস্রব থেকে দূরে রাখা। কিন্তু সেই যুগে যে বয়সে মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি চলে যেত, তখন তাঁকে বিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, বাইরের মহলে পাঠানো হল ছেলেদের মধ্যে। সেই হল লেখাপড়ার সূত্রপাত। শুধুমাত্র বাংলা নয়, 'সেকালে পারসী পড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। আমি মনে মনে তাহাও খানিক শিখিলাম। আমি যে এই সকল পড়া মনে মনে শিখিয়াছি, তাহা আর কেহ জানিত না।'

এর বেশ কিছুদিন পরে তিনি যখন সংসারের কর্ত্রী এবং কয়েকটি সন্তানের মা হয়েছেন তখন আবার লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে নতুন করে জেগে উঠল। কিন্তু পাছে নিন্দা হয় এই ভয়ে সেকথা কাউকে বলে উঠতে পারেন না। বহু কষ্ট করে চৈতন্যভাগবত পড়তে শিখলেন। কিন্তু দেখা গেল তাঁর ননদেরা এই খবরে অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁরাও চাইলেন রাসসুন্দরীর কাছ থেকে লেখাপড়া শিখতে। তাঁদের অবশ্য শিক্ষা বেশিদূর এগোয়নি। তবে স্বামী পুত্রেরা তো বটেই, বাড়ির সকলেই যেভাবে তাঁকে উৎসাহিত করলেন তাতে মনে হয় এত গোপনীয়তা নিরর্থক ছিল। কিন্তু স্ববিরোধ রাসসুন্দরীর নিজের মধ্যেই ছিল। "আমি একে তো মেয়ে, তাহাতে বউ মানুষ, মেয়েমানুষকে লেখাপড়া শিখিতেই নাই। এটি স্ত্রীজাতির পক্ষে প্রধান দোষ বলিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সে স্থলে আমি এ প্রকার সাজিয়া লিখিতে বসিলে লোকে আমাকে দেখিয়া কি বলিবে। বাস্তবিক আমাকে কেহ কটুকাক্য বলিবে বলিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হিল।"

আবার এই রাসসুন্দরীই অন্যত্র বলছেন, "তখন আমাদিগের দেশের সকল আচার-ব্যবহার বড় মন্দ ছিল না, কিন্তু এই বিষয়টি ভারি মন্দ ছিল। সকলেই মেয়েছেলেকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।" তিনি নিজের অদৃষ্টকে এর জন্য দোষারোপ করছেন। অথচ পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল উভয়েই ছিল অন্য ধাতুর। সেখান তাঁর বিদ্যাশিক্ষা চর্চা করার কোনও বাধাই ছিল না। বলতে গেলে পিতৃগৃহেই তাঁর লেখাপড়ার সূচনা। তবু তিনি সর্বদা সমালোচনার ভয়ে সন্ত্রুচিত হয়ে থাকতেন। ছোটবেলা থেকেই ভীরু ও লাজুক রাসসুন্দরী কালক্রমে এক বিরাট পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়েও সাহস করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে জাহির করতে পারলেন না।

তিনি যে অনেক পরিশ্রম করে লিখতে পড়তে শিখলেন সবই পরমেশ্বরের কৃপায় এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি উদয়াস্ত সংসারের কাজে অমানুষিক পরিশ্রম করেও যথেষ্ট ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। এই ঈশ্বরভক্তি তাঁকে অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যুশোক সহ্য করার শক্তি দেয়। তিনি নিজে লিখেছেন, "হে অধিকারী মহাশয়। তোমার সংসারযাত্রায় থাকিয়া যে কত আশ্চর্য কাণ্ড দেখিতেছি তাহার সংখ্যা নাই। তুমি আমা হইতেই আমাকে কত প্রকার সাজ সাজাইয়া আনিয়া দেখাইতেছ। আমার পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র, পৌত্রী, দৌহিত্রী

এই সমুদয় সাজাইয়া তোমার যাত্রার আসরে আনিয়া আমাকে দেখাইয়া দেখাইয়া প্রায় সকলই তুমি নিয়া গিয়াছ। .....তুমি নির্দয় হইলেও বলিব দয়াময়।"

এই যে নিরাসক্তভাবে দূর থেকে নিজের জীবনকে নিরীক্ষণ করা এখানেই রাসসুন্দরীর বিশেষত্ব। সেই কারণেই তাঁর আত্মচরিতকে শুধুমাত্র বাঙালি রমণীর সাহিত্যের জগতে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়। তাঁর কৃতিত্বকে খাটো করা হয়। তাঁকে কালের পরিধির মধ্যে আটকে ফেলা হয়। সমসাময়িক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও তিনি সময়কে অতিক্রম করে যাবার তাগিদ অনুভব করেছিলেন অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে। তবে নিজের শক্তি সম্পর্কে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন না। কিন্তু পুরো বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দুই দিকপাল সাহিত্যিক ও পণ্ডিত অপার বিস্ময়ে অভিনন্দন জানালেন এই আশ্চর্য সৃষ্টিকে যার মধ্যে একই সঙ্গে তাঁরা পেয়েছিলেন এক উন্নত মনের পরিচয় ও সাহিত্যের এক নতুন ধারা।

পরম্পরা

রাসসুন্দরীর অবদান কেবল সাহিত্যিক হিসাবে ফুরিয়ে যায় নি, তিনি তাঁর জীবনধারার মধ্য দিয়ে তাঁর ভক্তি, সেবা, প্রাণশক্তি ও দেশপ্রেম সঞ্চারিত করেছেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম — ছয় পুরুষ ধরে এমন কৃতিত্বের ইতিহাস তো বিশেষ নজরে পড়ে না। বাংলার বহুচর্চিত পরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশ নানাদিকে দ্যুতি বিকীর্ণ করে নিঃশেষ হয়ে গেলেন বলতে গেলে চার প্রজন্মেই। নিভে যাবার আগে আর একবার স্থলে ওঠার মতো সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির এই পড়ন্ত আলো শেষ অবধি এসে থেমে গেছে দীনু ঠাকুর, সোমেন ঠাকুর ও কিছু পরিমাণে সুভো ঠাকুরে — অর্থাৎ পঞ্চম প্রজন্মে। তবে লক্ষ করার বিষয় ঠাকুরবাড়ির প্রতিভা আবর্তিত হত পুরুষদের ঘিরে — মহিলাদের মধ্যে দু'একজন ব্যতিক্রম থাকলেও তাঁদের প্রতিভাও ছিল পুরুষ-অনুসারী। রাসসুন্দরী ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর অলক্ষ্য প্রভাব সময়ের দূরত্ব অতিক্রম করে বহুদূর বিস্তৃত — দুই শতক পার হয়ে আজ তা তৃতীয় শতকের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। ভূস্বামী হয়েও তৎকালীন জমিদার তনয়দের চেয়ে রাসসুন্দরীর বংশধরেরা ছিলেন স্বতন্ত্র। তাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই পদার্পণ করেছিলেন আধুনিক যুগে — পেশাগত নৈপুণ্যের জগতে। প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছিলেন। রাসসুন্দরীর এক পুত্র দ্বারকানাথ ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, কিশোরীলাল ছিলেন আইনজ্ঞ ও আইনজীবী। আইনের বই লেখেন তিনি, টেগোর ল প্রফেসর পদেও অধিষ্ঠিত হন। পৌত্র সরসীলাল ছিলেন নামকরা ডাক্তার।

মানসিকতার দিক দিয়েও এঁরা ছিলেন সময়ের চেয়ে এগিয়ে — মুক্তমনা, সংস্কারের তোয়াক্কা করতেন না। রাসসুন্দরীর শেষ সময়ে তাঁরই ইচ্ছায় তাঁকে গঙ্গাযাত্রা করানো হয় শুনে পরে কিশোরীলাল অত্যন্ত দুঃখিত হন, আপত্তি করে বলেন এরকম ভর তিনি হোমিওপ্যাথি ওষুধে কত সারিয়েছেন — টানাহ্যাঁচড়া করার কী প্রয়োজন ছিল। কিশোরীলালের কন্যা সরলবালার প্রতিভা ছিল বহুমুখী। এই সরলবালার জামাতা প্রফুল্লকুমার সরকার আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রফুল্লকুমারের পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে সেই আদি প্রপিতামহীর অফুরন্ত কর্মক্ষমতা, ২০০০ সালে রাসসুন্দরীর মৃত্যুর শতবর্ষপূর্ণ হচ্ছে। একশো বছর আগে চলে গেলেও তিনি রেখে গেছেন তাঁর উত্তরাধিকার, যা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিলাভ করেই চলেছে। □

চতুরঙ্গের

আগামী সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হবে

দ্বিসহস্রাব্দ পূর্তি উপলক্ষে

বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক জীবনচর্যার

মূল্যায়নধর্মী সন্দর্ভসম্ভার নিয়ে।

রচয়িতারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তি।

কিছু হাসি, কাশি আর ঘামের গন্ধ

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

আজ আমার সাতষট্টি নম্বরের জন্মদিন। আমি যখন জন্মাই, তখন সেই দিনটার কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না। আমার জন্মাবার ফলেও সেই দিনটার কোনও উজ্জ্বলতা বাড়েনি। তবে অন্য একটা কারণে, কাকতালীয়ভাবে, পরবর্তীকালে, বছরের সেই বিশেষ তারিখটা সর্বভারতীয় ছুটির দিন বলে গণ্য হচ্ছে। লোকে ছাদের ওপর উঠে সেদিন প্রাতঃকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে, তারপর জাতীয় সংগীত গায়। আমার কথা কেউ বলে না। আসলে এ-সব ব্যাপারে আমার কোনও হাত ছিল না। এখনও নেই।

আমি জন্মদিন মানি না। বছরের প্রত্যেকটা দিন, আমার মতে, আমার বাকি জীবনের প্রথম দিন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দিনটা ভোলাও যায় না। যতদিন মা বেঁচে ছিল, ততদিন ঠিক মনে করে আলাদা দুধ আনা হত, পায়েস রান্না হত বাড়িতে। ভাই-বোন বাড়িসুদ্ধ লোক আমার কল্যাণে সেদিন এক বাটি করে পায়েস খেতে পেত। নানা সময়ে আমাদের পরিবারে অভাব অনটন দেখা গিয়েছে, বাবার রোজগার কমে গেছে, তখনও পায়েসটা বাদ পড়েনি। মা মারা যাওয়ার পর প্রতি বছর জন্মদিনে পায়েস খাওয়াবার দায়িত্ব পড়েছে আমার স্ত্রীর ওপর। তার কখনও ভুল হয় না কিন্তু পায়েসের পরিমাণ সম্পর্কে সে বড় কৃপণ। এক বাটি এখন এক হাতায় এসে ঠেকেছে। না হলে হয়ত এতদিনে মরেই যেতাম। পায়েস যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, এ খবর মায়েরা রাখে না।

জন্মদিনে নতুন জামা পাওয়া যায়। সেই জামা পরে, একদিনের জন্য সকলের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকার আনন্দই আলাদা। জাতীয় উৎসবের সামগ্রিক হট্টগোলের মধ্যেও আমি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। যেখানে আর সকলে অবহেলিত, উপেক্ষিত হচ্ছে। সারা জীবন এই দিনটিতে তাই পরম কৃতজ্ঞতায় আমার সমস্ত গুরুজনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে এসেছি। তাঁরা আমার দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন।

তাঁদের শুভকামনার ফলেই হোক বা কখনও সচেতনভাবে কোনও অন্যায় কাজ না করার জন্যই হোক, আমি দীর্ঘজীবন পাওয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছি ক্রমে ক্রমে। সকলকে সুখী করতে পারিনি আমি জানি, কেননা প্রত্যাশা না করলে সকলকে সুখী করা যায় না। এ নিয়ে আমার মনে কোনও অনুশোচনা নেই।

দীর্ঘজীবনের ফল, আজ অনুভব করছি, আমার গুরুজনের সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রণাম করার যোগ্য প্রাচীন পা এক জোড়া দু'জোড়ায় নেমে এসেছে। আমার মায়ের ছোট বোন — আমার ছোট মাসি — তাদের একজন। একাশি বছর বয়সে ছোট মাসির পা দুটো বাতে বেঁকে গেছে, তবে প্রণাম করা যায়। ছোট মাসি একমাত্র আমায় ডাক নাম ধরে ডাকে যখন দেখা করতে যাই।

আমার জন্ম পুরীতে। যাকে অনেকে জগন্নাথধাম বলে, যেখানে শ্রীচৈতন্য ইহলীলা সাঙ্গ করেছিলেন। ভক্তলোকে বলে, নীল আকাশ আর সমুদ্রের মাঝখানে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। মৃদু গুঞ্জন শুনি, তাঁকে নাকি খুন করা হয়েছিল। ওই জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যেই তাঁকে পুঁতে ফেলা হয়েছে। কী সাংঘাতিক কথা — আমি ভাবি, এ নিশ্চয় সত্য নয়। অমন মহাপুরুষকে কেউ হত্যা করে? আবার ভাবি, মহাপুরুষকেই তো লোকে হত্যা করে। তাঁরা যে সত্যের স্বরূপ দেখান, তাতে আমাদের চোখ ঝলসে যায় না। আমার জন্ম পুরীতে তার কারণ সেখানে আমার মায়ের বাপের বাড়ি। আর,

তখনকার দিনে মেয়েদের সন্তানসম্ভাবনা হলেই বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হত। আপনারা দিকপাল সব বাঙালিদের জীবনীগ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখবেন, তাঁদের অধিকাংশের জন্ম মাতুলালয়ে। ভিতরের সত্য হল, নারী যখন সাংসারিক কাজে অপারগ, তখন তাকে শ্বশুরালয় থেকে বিদায় দেওয়া হত। আমার মাতামহের সাত-সাতটি মেয়ে, তাই তাঁর পুরীর দোতলা বাড়ির পেছন দিকে উঠোনের কোণে একটা পার্মানেন্ট আঁতুড়ঘর ছিল। অসংখ্য শিশুর জন্ম হয়েছে সেই ঘরে। আজ তারা, তাদের সন্তান-সন্ততি এবং তাদেরও সন্তান-সন্ততি সারা ভারতের কোণে কোণে ছড়িয়ে রয়েছে — থিকথিক করছে। উপার্জন করছে, ভোগ করছে, পরিবেশের মধ্যে দূষণ ছড়াচ্ছে, প্রতিনিয়ত। পোকাদের মতো, নির্বিকারভাবে।

একটি পুত্রসন্তান লাভ করার আশায় আমার মাতামহ চারবার বিবাহ করেছিলেন। প্রথম দু'জন অকালে গত হন। পরের দু'জন টিকে যান। চতুর্থজন ঠাকুরের কৃপায় একটি পুত্রসন্তান উপহার দিতে পেরেছিলেন মাতামহকে, তৃতীয়জন তখন পঞ্চম বন্যাকে গর্ভে ধারণ করে অপেক্ষমান। অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার পর মাতামহ আর কাম-ক্রোধে লিপ্ত থাকেননি। দীক্ষা নিয়ে গুরুদেবের চরণে নিজের সংসারের ভবিষ্যৎ সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। একজন প্রবাসী অসফল আইনজীবীর পক্ষে আর কী-বা করার ছিল। উক্ত পঞ্চম কন্যাই আমার ছোটমাসি। আমার মা তাঁর চতুর্থ কন্যা।

লিখতে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা কেমন আজগুবি, অস্বাভাবিক ঠেকছে। কিন্তু তখন এসব খুব মসৃণভাবে গ্রহণ করা হত। আমার দুই দিদিমার নাম নিভননী আর ননীবালা। দাদু কারুর প্রতি পক্ষপাত না দেখাতে দুজনকেই 'ননী' বলে ডাকতেন। যে সাড়া দিত, তাকেই পান সেজে দিতে বলতেন। ওঁদের সংসারে সতিনদের মধ্যে কলহ ছিল না, বোঝাপড়া ছিল। কীরকম বোঝাপড়া, আমি কল্পনা করতে চাই। পাখিদের মতো?

আমার মাতামহের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন জানকীনাথ বসু। তিনি রাজধানী কটকে ওকালতি করতেন। পুরীতেও তাঁর একটা নিজস্ব বাড়ি ছিল। ছুটিছাটায় প্রায়ই পুরীতে আসতেন বেড়াতে। তাঁর অনেকগুলি পুত্রসন্তান ছিল। ইচ্ছা করলে তিনি হয়ত আমার মাতামহকে কন্যাদায় থেকে সম্পূর্ণ না হোক কিছুটা উদ্ধার করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা কায়স্থ, অসবর্ণ, সুতরাং এ প্রশ্ন কখনও ওঠেনি। তা ছাড়া তাঁরা কত ধনী।

কলাগাছের মতো মেয়েরা একে একে বড় হয়ে উঠতে লাগল। কী করে তাদের বিবাহ দেওয়া হবে সেই চিন্তায় দাদু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ঠাকুরকে ডাকতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরই পথ বলে দেন। এক, বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দাও আর দুই, চেঞ্জারদের দিকে নজর রাখো। চেঞ্জার মানে এখনকার ভাষায় টুরিস্ট। পুরী বরাবরই বাঙালি টুরিস্টদের কাছে প্রধানতম আকর্ষণ। সেখানে তীর্থক্ষেত্রের পুণ্য আছে আবার সমুদ্রসৈকতের মুক্তবায়ু আছে। সেই উনিশশো পঁচিশ সালে যক্ষ্মারোগের কোনও নিশ্চিত নিরাময় ছিল না। লোক পুরীতে শরীর সারাতে যেত। এই তিন রকমের যাত্রীদের জন্য পুরীর সমুদ্রতীরে তখনই একাধিক হোটেল গড়ে উঠেছিল। সবচেয়ে অভিজাতটির নাম বি.এন.আর. হোটেল। এ ছাড়া বাঙালি বাসিন্দারা নিজেদের বাসগৃহের ঘরও চুক্তিতে ভাড়া দিত। দাদু তাঁর দুই স্ত্রী এবং সাত কন্যাকে নিয়ে সমুদ্রকিনারে বেড়াতে যেতেন মাঝে মাঝে। এক চেঞ্জার পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাওয়ায় তারা আমার এক মাসিকে বরণ করে নিয়ে যায়। বর্ধমান জেলার কালিকাপুর গ্রামে আমার সেই মাসির শ্বশুরবাড়ি। সেখানে বেড়াতে গিয়ে আমি প্রথম কাঁঠাল খেয়ে ছিলাম।

বাংলা কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এবং বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আর সব মাসিদের বিয়ে হয়েছিল বলে শুনেছি। কেউই শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকেনি। ওই বিজ্ঞাপনে পাওয়া মেজো-জামাই ছিল ধনী ঠিকেদার। তাই সে ভদ্রলোক এমন ঈশ্বরানুরাগী ও নিরাসক্ত শ্বশুরকে দেখে অত্যন্ত চমৎকৃত হয় এবং কালক্রমে সকল কন্যার বিবাহের আর্থিক দায়িত্ব বহন করে। এ-ও ঠাকুরেরই কৃপা। কেবল ছোটমাসিকে গ্রহণ করে সেজো জামাইয়ের অদম্ভন সহকর্মী। ঘরে ঘরে সম্বন্ধ। তখন সোনার দাম একুশ টাকা ভরি, বেনারসি শাড়ি পঞ্চাশ টাকা। একটা মেয়ের বিয়েতে খরচ পড়ত তিন হাজার টাকা মাত্র।

অনেকদিন আগে, মা বেঁচে থাকতে, ছোটমাসির কাছে শুনেছিলাম যে বিয়ের আগে একজন চেঞ্জার যুবক মাকে গান শেখাতে আসত। দাদু সব মেয়েকেই অল্পবিস্তর গান-বাজনা শিখিয়েছিলেন। তাঁর নিজের গানের গলা ছিল। ঠাকুরদেবতার গান গাইতেন, ব্রহ্মসংগীত তখন খুব জনপ্রিয় বাঙালি মহলে। কিন্তু মায়ের বেলা দাদুর আর সে ক্ষমতা ছিল না। ওই চেঞ্জার ছেলেটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গান শেখাতে রাজি হয়। এবং এই কাজের জন্য সে কোনও বেতন নিত না।

ছোটমাসির এই কথার মধ্যে অন্য কোনও ইঙ্গিত থাকতে পারে। কারণ ছোটমাসির গান শেখা হয়নি।

বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দাদু উত্তর-বিহারের পাত্রপক্ষকে চিঠি লেখেন বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। তারপর বাবার সঙ্গে আমার মায়ের বিয়ে হয়ে যায়। তখন মায়ের বয়স পনেরো। মায়ের ষোলো বছর বয়সে আমার জন্ম। তফাতটা খুব বেশি নয়। আমার যখন পঞ্চাশ বছর বয়স, মায়ের তখন ছেষট্টি। ছোটমাসির

চৌষট্টি। ছোটমাসি ঠাট্টা করে বলতেই পারে, ছোড়দি, ওই লোকটার কী যেন নাম ছিল? আমি সেখানে উপস্থিত। এই কলকাতা শহরের এক বাঙালি পল্লিতে।

মা বলেছিল, 'কোন লোকটার?'

—'ওই যে, তোকে গান শেখাত পুরীতে?'

—'অতশত আমার মনে নেই।'

—'আমার মনে আছে' ছোটমাসি বলেছিল, 'ওর নাম ছিল তারক। রোগা চেহারা। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।'

—'আর কী মনে আছে তোর?'

মা স্পষ্টত অপ্রসন্ন।

কলকাতা শহরে আমার সামনেই এই সব সংলাপ আদান প্রদান হয়। আমার মেয়ের বয়স তখন সতেরো। সে অবশ্য উপস্থিত ছিল না। সে তার প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরছিল কোথাও। ছোঁড়াটা ওর সহপাঠী, আমি বাধা দিইনি।

ছোটমাসি বলে, 'ও ছিল আইবুড়ো।'

—'ভাগিস'। মা একটু রেগে গিয়েই বলে, 'শোন খোকন, একটা নির্দোষ লোককে নামে কেচ্ছা রটাসনি। লোকটা টিবি থেকে সেরে উঠে স্বাস্থ্য ফেরাতে পুরীতে এসেছিল। বাবার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে আলাপ। বাবা বলে, আমার মেয়েদের একটু গান শেখান না। এখানে তেমন মাস্টার নেই। তো তিন-চার মাস—'

—আমাকে তো শেখায়নি। শুধু তোকেই শেখাত। বাবা বলত, আমার গলায় গান নেই, আমি যেন লেখাপড়া শিখি। দাদার কাছে আমি ইংরিজি পড়তাম। বাবার মনে মনে নিশ্চয়—

মা বলে, 'যাই থাক, ওই চোদ্দ বছর বয়সে আমার মনে কোনও পাপ ছিল না। গান-জানা লোক, আমায় কয়েকটা গান শিখিয়ে দিয়ে গেছে। বাস। তারপর তো আমার বিয়ে হয়ে গেল। ডাকু পেটে যখন আবার এলাম, শুনলাম, সে চলে গেছে। তারপর বাবা মারা গেল।'

ডাকু আমার ডাক নাম। আগেই বলেছি, দুই বোনের কথোপকথনের সময় তখন আমার বয়স পঞ্চাশ, মায়ের ছেষট্টি, ছোটমাসির চৌষট্টি আর আমার মেয়ে ঝুমকির সতেরো। এখন আমার সাতষট্টি হল। দাদু, দিদিমারা কেউ বেঁচে নেই। বাবাও মারা গেছে। মা নেই। ছোটমাসি একাশি বছর বয়সে বাত নিয়ে টিম টিম করে জ্বলছে। তার দুই ছেলে, তিন মেয়ে। ছোটমাসি ইংরেজিতে নাম সই করতে পারে। মা পারত না। বাবা যতদিন বেঁচে ছিল, মায়ের চিঠিতে বাংলা বানান ঠিক করে দিয়েছে। ওই তারক যদি আমার বাবা হত, সে-ও দিত নিশ্চয়। আমি তো আমিই থাকতাম।

ছোটমাসি সেদিন প্রায় প্রতিহিংসাবশত বলেছিল, 'তোমাকে গান শেখাতে আমার ভাল লাগে, লোকটা তোকে বলেনি?'

—'তাতে কী বোঝায়?' বলে হঠাৎ কেঁদে ফেলেছিল মা। হ্যাঁ, কেঁদে ফেলেছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'ইয়ার্কির একটা সীমা আছে।'

আমরা সেদিন উঠে এসেছিলাম। তারপর মা কিছুদিন ছোট মাসির বাড়ি যায়নি। আবার সব মিটমাট হয়ে গেছে। অনেক বছর ঘুরে গেছে তারপর। সধবা মাসিরা বিধবা হয়েছে। বিধবা মাসিরা মারা গেছে একজন একজন করে। আমার মাসতুতো ভাইবোনেরা এবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সবাই তারা মুঠো মুঠো ক্যাপসুল খায় আর ঠাকুরঘরে বসে গুরুদেবের পুজো করে। তিনি হাত ধরে বৈতরণী পার করে দেবেন। ওই বিশ্বাস নিয়ে স্বস্তিতে আছে।

আজ সাতষট্টি বছরের জন্মদিনে ভাবছি একবার ছোটমাসির বাড়ি যাব। নিজের ডাকনামটা শুনে আসব। আর জেনে আসব, কে কোথায় আছে, কেমন আছে, কে আর নেই। আমার সঙ্গে কারুর যোগাযোগ নেই তেমন। ছোটমাসিই গেজেট।

না। তারক মাস্টারের কথা আমি তুলব না। ও প্রসঙ্গ চুকেবুকে গেছে। সেইদিনই, ছোটমাসির বাড়ি থেকে ফেরার পথে রিকশায় বসে মা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বল তো ডাকু, 'তোমাকে গান শেখাতে আমার ভাললাগে,' এটা কি কোনও খারাপ কথা?

আমি বলি, তুমি হঠাৎ কেঁদে ফেললে কেন? ছোটমাসি ঠাট্টা করছিল।

—'ঠাট্টা না। হিংসে।' তারপর মা চুপ করে যায়। আমি, বাবার প্রতিনিধি, মায়ের কৈফিয়ত তো শুনলাম। অন্তত বুঝলাম, এই ঘটনার কথা মা কখনও বাবাকে বলেনি।

আমার শোবার ঘরে মা-বাবার জোড়া ফটো বাঁধানো আছে দেয়ালে। আমার শ্বশুর-শাশুড়ির ফটোও দেয়ালে ঝোলে। এরা সবাই এক জীবন করে পোকার মতো বেঁচে তারপর স্বাভাবিক ভাবে মারা গেছে। আর কিছুদিন পর ছোটমাসিও যাবে। মেসোমশায়ের ছবির পাশে জায়গা হবে তার। সেখানে দাদু আর দুই দিদিমার ছবি আছে। তারপর আমি যাব। পোকার মতোই। কিছু হাসি, কাশি আর ঘামের গন্ধ রেখে যাব। ধোপার বাড়ি থেকে কেচে আসবে।

কিছু তো থাকে না। আয়া-ফায়া সব বুজরুকি। আমি বুঝে গেছি। শুধু দুটো একটা কথা, আলটপকা বলা কথা, যেমন, 'তোমাকে গান শেখাতে আমার ভাল লাগে,' থেকে যায়। □

পাকিস্তান : এক অস্মিতার সঙ্কট

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশেরই মতো পাকিস্তান আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। শুধু তা-ই নয়, আমাদের সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক। আর সেই নাড়ির বন্ধন কাটার রক্ত এখনও ক্ষরিত হচ্ছে। তাই ওদেশ সম্বন্ধে জানার চেষ্টা আমাদের নিজেদের স্বার্থেই বাঞ্ছনীয়। ইতিহাসের দেবতার বিচিত্র রসিকতায় ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ১১ই মে তারিখের পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের পারম্পরিক শাসানির বছর ঘোরার পূর্বেই বাসযাত্রার সম্প্রীতিতে পরিণত হয়েছে। ফলে একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এই অবসরে ভারতে আমরা যদি পাকিস্তানের অস্মিতা বা আত্মপরিচয়ের সঙ্কট সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করি তাহলে বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত করার তা সহায়কই হবে।

পাকিস্তানের অস্মিতার সঙ্কট ওদেশের জন্মলগ্ন থেকেই। একথা সর্বজনবিদিত যে "দ্বিজাতি তত্ত্ব" পাকিস্তানের দার্শনিক বনিয়াদ। মুসলমানরা ধর্মে পৃথক বলেই এক স্বতন্ত্র জাতি (nation বা nationality), তাই তাঁরা ভারতবর্ষে থাকবেন না। তাঁদের জন্য চাই এক স্বতন্ত্র বাসভূমি (home land)। সেই পৃথক জাতি-রাষ্ট্রে (nation state) তাঁরা নিজ স্বতন্ত্র প্রতিভা অনুযায়ী জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্মবিকাশের সাধনা করবেন। বাদবাকি ভারতের সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। তাই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি (এর যথার্থ সংজ্ঞা সম্ভবত ইচ্ছা করেই এ দাবির প্রবর্তক লিগ নেতা জিন্না কখনও দেননি) এক (গোড়ায় একাধিকের প্রস্তাব ছিল) স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র রূপে ভারত থেকে পৃথক হবে। মোটামুটি পূর্বোক্ত দাবির ভিত্তিতে জিন্নাসাহেবের কুশলী নেতৃত্বে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের মধ্যস্থতায় ব্রিটিশ সরকারের দোসরা জুনের ক্ষমতা হস্তান্তরণের প্রস্তাব স্বীকৃতি পায়।

পাকিস্তানের অবিসংবাদী নেতা জিন্না তাঁর নতুন রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে চিরতরে ভারত ছেড়ে ৭ই আগস্ট তখনকার রাজধানী করাচিতে পদার্পণ করেন। কিন্তু ১১ই আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যদের কাছে সভাপতি হিসাবে জিন্না যে প্রথম বক্তৃতা দেন তাতেই তিনি স্বয়ং "দ্বিজাতি তত্ত্ব" বাতিল করেন। বহুচর্চিত সেই স্বতঃস্ফূর্ত বক্তৃতার (কোনও লিখিত নোটের ভিত্তিতে নয়) একাংশে তিনি বলেন, "এই পাকিস্তান রাষ্ট্রে ইচ্ছামত মন্দির মসজিদ অথবা অপর যে কোনও উপাসনাস্থলে যাবার অধিকার আপনাদের আছে। আপনাদের ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায় যা-ই হোক না কেন, তার সঙ্গে এই মূল নীতির কোনও সম্পর্ক নেই যে আমরা একই রাষ্ট্রের অধিবাসী। আমার মতে এই নীতিকে আমাদের আদর্শ রূপে সদাজাগরূক রাখা কর্তব্য। তা হলে আপনারা দেখবেন যে কালক্রমে হিন্দুরা আর হিন্দু এবং মুসলমানরা আর মুসলমান থাকবে না—ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে নয়, কারণ সেটা হল প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রশ্ন—এ হল রাজনৈতিক অর্থে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে।"

অর্থাৎ ভারতের মুসলমানরা সর্বার্থে এক স্বতন্ত্র জাতি (nation বা nationality) এবং তাই কেবল মুসলমানদের এক স্বতন্ত্র বাসভূমি অর্জন তাদের অধিকার ও কর্তব্য—এই যে ভূমিকার উপর লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তানের দাবি, ১৪ই আগস্ট তা সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠার পূর্বেই জিন্না তা পরিহার করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই প্রথম বার তিনি এ ভূমিকা নেননি। এমন একাধিকবার করেছেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত ঘটনাগুলির মধ্যে যেগুলি কিছুটা জানা তার কয়েকটার উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। ভারত বিভাগের দাবি জানালেও মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে অন্তিম পর্বের আলোচনায় জিন্না পাঞ্জাব

ও বঙ্গবিভাজনের বিরোধিতা করেছিলেন। দুটি প্রদেশকেই অখণ্ড ভাবে তিনি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেছিলেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবিতে। জিন্নারই যুক্তি প্রয়োগ করে মাউন্টব্যাটেন যখন প্রদেশদুটির অমুসলমান (হিন্দু-শিখ) সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে (মূলত জেলাভিত্তিক) ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব করলেন, জিন্না তখন প্রদেশগুলির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐক্যের যুক্তি উত্থাপন করে ওভাবে প্রদেশ দু'টির বিভাজনের বিরোধিতা করেছিলেন।

অনুরূপ ভাবে ভারতবিভাজন যখন বাস্তবতায় পরিণত হল এবং যখন উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন প্রকট ভাবে দেখা দিল, তখনও জিন্না তাঁর দাবির তর্কসিদ্ধ পরিণাম লোক বিনিময়ের ভয়ঙ্কর সম্ভাবনায় সঙ্গত কারণেই ভীত হয়ে উভয় রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও স্বাধিকার বজায় রাখার প্রবক্তা হয়ে উঠলেন। ৬ই জুলাই তিনি যে মুসলমানগণ প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন তাঁদের নিজ-সৃষ্ট মুসলিম বাসভূমিতে আমন্ত্রণ না জানিয়ে ভারতের প্রতি অনুগত হয়ে সেদেশেই থেকে যাবার পরামর্শ দিলেন। অনুরূপ ভাবে ১৩ই জুলাই উভয় রাষ্ট্রকেই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আবেদন জানালেন। কারণ তত দিনে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তাঁর প্রস্তাবিত মুসলিম বাসভূমিতে ভারতের সব মুসলমানদের ঠাঁই হবে না। এ ছাড়া অন্তত তখনকার মতো পাকিস্তানে বেশ কিছু অমুসলমান থেকে যাবেন। ওদেশ কেবল মুসলিম বাসভূমি হতে পারবে না।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবার পরও তিনি ২৬শে অক্টোবর রয়টারের এক প্রতিনিধির কাছে অনুরূপভাবে ওদেশের সংখ্যালঘুদের পূর্ণ নাগরিক অধিকারের অঙ্গীকার করেন। মৃত্যুর সাত মাস পূর্বেও আমেরিকার অধিবাসীদের কাছে এক বেতার বার্তার মাধ্যমে তিনি অনুরূপ আশা ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া মুসলিম বাসভূমি হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানে ইসলামি শরিয়া শাসন প্রবর্তন যে আদৌ তাঁর কাম্য নয়, একথা তিনি ওই বেতার ভাষণে বলেছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য ইসলামের সাহায্য নিলেও বিশ্বাস-মানসিকতা ও আচার-ব্যবহার — সর্ব ক্ষেত্রেই তিনি এক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক ব্যক্তি ছিলেন বলে বারশো বছরের পুরাতন ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে এ ব্যাপারে শেষ কথা বলে মেনে নেওয়া স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। ইসলামি রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের দাবি যখন তুঙ্গে এবং অন্য সব লিগ নেতারা যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে যেভাবে পারছেন ইসলামকে কাজে লাগাচ্ছেন সেই ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দেও বহু প্ররোচনা সত্ত্বেও জিন্না শরিয়তের দোহাই দিয়ে উলেমা সম্প্রদায়ের "ফাঁদে পা দিতে" অস্বীকার করেন।

॥ ২ ॥

সহানুভূতিশীলদের মতে সর্বোচ্চ নেতার রাজনৈতিক দর্শনের দোলাচলচিত্ততা আর বিরূপ সমালোচকের মতে তা হল জিন্নার কথা ও কাজের গরমিলের অসাধুতা। যেভাবেই দেখা যাক না কেন এই (এক বিখ্যাত মার্ক্সবাদীর ভাষায়) "দর্শনের দারিদ্র" (poverty of philosophy) বিগত অর্ধ শতাব্দীতে পাকিস্তানকে কুরে কুরে খাচ্ছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা পাকিস্তানের একালের শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে মনে বুঝলেও বাইরে খুব একটা প্রকাশ করতে পারেন না। কারণ তাহলেই পাকিস্তানের অস্তিত্বের যৌক্তিকতাই চলে যায়। কিন্তু পাকিস্তানের কর্ণধার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী রাজনীতিক ব্যবসায়ী বণিক আমলাবর্গ স্ব স্ব কারণে পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র চান। ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির ইচ্ছা কারও নেই। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মাভিব্যক্তির জন্য এজাতীয় অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট রাষ্ট্র আদৌ অনুচিত নয়। কিন্তু জন্মের আদি লগ্নে ইসলামি অস্মিতার যে ছাপ নেওয়া হয়েছে, তাকে বর্জন করার সাহস কোথায়? এদিকে ওই সূত্র ধরে মৌলানা মৌদুদির জমায়েত-এ-ইসলামি ও অন্যান্য ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি আসর জমাবার যে চেষ্টা করছে তাতে পাকিস্তানের সংহতিই ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। তবে সে প্রসঙ্গের আলোচনা পরে। ইতিমধ্যে যে দল ও যে নেতার সরকারই ক্ষমতায় এসেছে, যে কোনও ক্ষেত্র থেকে ক্ষমতাধীশদের শাসনে কোনও রকম চ্যালেঞ্জ দেখা দিলেই ইসলামের ধুয়ো তুলে কিছু মধ্যযুগীয় প্রথার আদেশ জারি করে (তা পালন করতে পারুক না পারুক) প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসন, ভুট্টোর 'আধুনিক' শাসন, জিয়ার শরিয়া-শাসন অথবা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের মতো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যবসায়ীর শাসন — সবাই বিপদ বুঝলেই ইসলাম ও শরিয়ার অন্তরালে আসল উদ্দেশ্য গোপনের চেষ্টা করে। পাকিস্তানের অনেকেই এটা বুঝেও নিরুপায়।

আধুনিক পাকিস্তানের সচেতন নাগরিকবর্গ দেশ-বিদেশের অবস্থা এবং বিশ্বে প্রচলিত সাম্প্রতিক ধ্যানধারণা সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাই যে-কোনও বিকাশোন্মুখ দেশের মতোই তাঁরা সেসব গ্রহণও করতে চান। এর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রথা ও তার সঙ্গে জড়িত মূল্যবোধসমূহ প্রধান। কিন্তু এর জন্য তাঁদের প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এসব সংগ্রামের খবর ভারতে আমরা খুব একটা রাখি না। কয়েক দফায় ওদেশে সামরিক শাসন দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। বর্তমানেও যে গণতন্ত্র চলছে, তার উপর সেনাবাহিনীর ছায়া চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেরই নজরে পড়বে। এর কারণও পাকিস্তানের জন্মলগ্নে — বরং তারও আগে থেকে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে জিন্না ছিলেন লিগের এক রকম ডিক্টেটার। কায়েদ-এ-আজমের

মর্জি অনুসারে চলা-বলার শিক্ষা লিগ নেতাদের। পাকিস্তান হবার পর হঠাৎ সে অভ্যাস যায় কেমন করে? আর এত দিন অবাধ আনুগত্য পেতে পেতে এবং মোটামুটি তাঁর একার কুশলী রাজনৈতিক দাবাখেলার চালে পাকিস্তান অর্জিত হয় বলে জিন্না সত্য সত্যই ডিক্টেটার হয়ে উঠেছিলেন। পাকিস্তান অর্জনের পর্বে এবং তার পরও গণতন্ত্রের ধরন-ধারণের অনুশীলন লিগ সংগঠন পরিচালনা, লিগের কর্মসূচি অথবা নেতৃবৃন্দের চালচালনে বিশেষ অনুসৃত হয়নি। "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" কেবল লিগের স্লোগানই ছিল না, ওই মানসিকতা মোটামুটি লিগের সর্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। জিন্নার কারণে ওই একই মানসিকতা ও বৃত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁর নীচের সারির নেতৃবর্গও। ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অথবা সংস্কৃতি ও-দেশে গড়ে ওঠার খুব একটা সুযোগ পায়নি। আর ডিক্টেটারদের পরবর্তী প্রজন্ম প্রায়শ দুর্বল হয়ে থাকে। আজকের পাকিস্তানে সেই বিষবৃক্ষের ফল ফলছে।

পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিকাশের বদলে সামরিকতন্ত্রের শক্তিশালী হয়ে ওঠার অপর একটি কারণের কথা কেমব্রিজ ধারার পাকিস্তানি ঐতিহাসিক ড. আয়েষা জালাল কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংক্রান্ত তাঁর এক পুস্তকে বলেছেন। কাশ্মীর দখলের জন্য পাকিস্তানের অসফল অ্যাডভেঞ্চার হল এই কারণ। কায়েদ-এ-আজমের আশীর্বাদপ্রাপ্ত ওই প্রয়াসে পাকিস্তান সৃষ্টির স্বল্পসময়ের মধ্যে সামরিকবাহিনীর মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ উন্নয়নমূলক কাজ স্থগিত রেখে ওই দুঃসাহসী প্রচেষ্টার পিছনে জলের মতো অর্থব্যয় করতে হয়েছে। এসব প্রয়াস বাঘের পিঠে সওয়ার হবার মতো। এই প্রক্রিয়ায় আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর দেশের নাগরিকদের উন্নয়নের দাবির গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পরবর্তী শাসকবর্গ প্রায়ই সামরিকবাহিনীকে কাজে লাগিয়েছেন। আর বাঘ একবার তাজা রক্তের স্বাদ পেলে তাকে পুনরায় খাঁচায় পোরা অতীব কঠিন। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের মতো ভারতেরও অবস্থা। বিষয়টি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে বলে এখনকার মতো এই ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট।

॥ ৩ ॥

অতঃপর পাকিস্তানের সংহতির প্রশ্ন। যেন তেন প্রকারেণ জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেই জাতি হিসাবে গড়ে ওঠা যায় না — এর প্রমাণ আজকের বিশ্বে সর্বত্র। বহু পুরাতন জাতি-রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের দেশ হওয়া সত্ত্বেও স্কটল্যান্ডে পৃথকতাবাদের মানসিকতা এখনও প্রবল। দীর্ঘকাল ধরে ওখানে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তিত থাকলেও এই অবস্থা। কানাডার ফরাসিভাষী অঞ্চলেও থেকে থেকে পৃথক হবার দাবি উঠছে। চোখের সামনে আমরা চেকোস্লোভাকিয়া দ্বিখণ্ডিত হতে দেখলাম। যুগোস্লাভিয়াও ভাঙল বহু রক্ত ও অশ্রু ঝরিয়ে। কিন্তু তবু তার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলিতে হত্যা, মৃত্যু ও উদ্বাস্তু হবার যেন শেষ নেই। এ জাতীয় উদাহরণের কথা ছেড়ে ঘর অর্থাৎ ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। দক্ষিণের বিচ্ছিন্নতাবাদ ভিসুভিয়াসের মতো — কখন অগ্নি উদ্গীরণ করবে বলা কঠিন। পাঞ্জাব আপাতত শান্ত হলেও পূর্বোত্তর ভারত বিগত অর্ধশতাব্দীতে আদৌ শান্ত হয়নি। তাও তো দুর্বল ও আংশিক হলেও এদেশে সংহতি স্থাপনের একটা প্রয়াস গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে দীর্ঘকাল ক্রিয়াশীল।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্তানের সে শিক্ষা বা সুযোগ ছিল না। হিন্দু ও কংগ্রেসের প্রতি অবিশ্বাস এবং ঘৃণা-বিরোধিতাকে পুঁজি করে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম, নিজ ভৌগোলিক সীমার অন্তর্ভুক্ত সব নাগরিকদের এক সূত্রে বেঁধে রাখার সচেতন প্রচেষ্টা তার কর্ণধারদের তরফ থেকে হয়নি। একমাত্র মুসলিম অস্মিতা-নির্ভর হওয়ার ফলে এর প্রথম বলি হন অবশ্যই দেশের অ-মুসলমানরা অর্থাৎ হিন্দু, শিখ ও খ্রিস্টানরা। তাঁদের অধিকাংশকেই পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে হয়। সিন্ধুতে বেশ কয়েক লক্ষ হিন্দু এখনও আছেন। পাঞ্জাব, এমনকী সীমান্ত প্রদেশেও, বেশ কিছু হিন্দু ও শিখ এবং কিছু খ্রিস্টান এখনও রয়েছেন। সব মিলিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর বর্তমান সংখ্যা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার সামান্য এক ভগ্নাংশ মাত্র। ইসলামি রাষ্ট্রে তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হতে বাধ্য। তার উপর শরিয়তি আদালত ও হুদুদ আইনের কৃপায় তাঁরা কী মর্মপীড়ার মধ্যে থাকতে বাধ্য হন, তা ব্লাসফেমির আইনে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দুই খ্রিস্টান যুবকের দেশ ছাড়তে বাধ্য হওয়া (তাদের জন্য আসমা জাহাঙ্গীরের মতো ও-দেশের মানবাধিকারের কর্মীরা যে প্রাণপণ লড়েছেন তাঁর কথা এখানে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণীয়) ও অপর এক খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকের আত্মহত্যার ঘটনায় প্রকট। কোনও জনগোষ্ঠীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখলে তারা যে রাষ্ট্রের প্রতি একাত্মতা বোধ করতে পারে না — একথা বলাই বাহুল্য।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল। কিন্তু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ এক মুসলিম জনগোষ্ঠীকেও ইসলামি অস্মিতার টানে ধরে রাখা গেল না। আমরা সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান ও আজকের বাংলাদেশের প্রতি ইঙ্গিত করছি। বাংলাদেশের জন্মের কাহিনী নতুন করে চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে দিল যে জাতিরাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইসলামি উম্মা ও মিল্লাত-বিরাদরি একমেব উপাদান নয়। ভাষা, সংস্কৃতি, পারস্পরিক বিশ্বাস, সহনশীলতা ও আর্থিক-রাজনৈতিক সমানাধিকার প্রভৃতিও সমান মূল্যবান। কিন্তু পাকিস্তানের

শাসকবর্গ বাংলাদেশের সৃষ্টির এই ইতিহাস থেকে খুব একটা কিছু শিখেছেন বলে তাঁদের কাজকর্মে মনে হয় না।

কোনও কোনও মহলে এমন একটা ধারণা আছে যে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিমসমাজ বুঝি এক পাথরে কোঁদা (monolithic)। অমুসলমানদের সঙ্গে পাল্লা দেবার সময়ে এমন একটা সাময়িক একসূত্রতা দেখা দিলেও তা স্থায়ী নয়। শিয়া-সুন্নির পার্থক্য ইসলামের প্রথম যুগ থেকে এখনও চলছে। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বহু উপবিভাগও আছে। এ ছাড়া আছে সুফিরা (এঁদের মধ্যেও বহু উপবিভাগ)। ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামে সম্ভবত কাদিয়ানিরা সর্বশেষ গোষ্ঠী। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল কথা হল নানা ক্ষেত্রে মতভেদ সত্ত্বেও সহনশীলতা সহকারে সব মত ও পথকে একত্র করে চলার চেষ্টা, সহজীবন ও সহ অস্তিত্ব প্রয়াস। এর অনুশীলন পাকিস্তানে এখনও আশানুরূপভাবে হয় না। অমুসলমানদের ইসলামি রাষ্ট্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত করা যায়। অথবা তাঁদের দেশ ছাড়তেও বাধ্য করা যায়। কিন্তু ভিন্ন মত-পথের মুসলমানদের ক্ষেত্রে কী হবে? বহু দিনের সামরিক শাসনের অবলুপ্তিকারী জুলফিকার আলী ভুট্টোর আমলে কাদিয়ানিদের অমুসলমান ঘোষণা করা হল। তাঁদের প্রকাশ্যে আজান দেওয়া চলবে না এবং তাঁদের উপাসনাস্থলকেও আর মসজিদ বলা চলবে না। পরোক্ষভাবে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করার নায়ক ও-দেশকে ভাঙার আর এক পদক্ষেপ নিলেন এবং সুন্নি মৌলবাদীদের চাপে কোনও জননেতা প্রকাশ্যে এ ব্যাপারে কিছু করতে পারলেন না। শিয়া সুন্নির আবহমান কালের বিবাদও আজকের পাকিস্তানে কম তীব্র নয়। উভয় পক্ষেই গণহত্যা চলছে। এমনকী ইবাদৎ করতে সমবেত ভক্তদের রক্ত ঝরছে মসজিদে গণহত্যার জন্য। কেবল ১৯৯৮ সালে এ-জাতীয় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৫৫৬ জন। অধিকাংশই সংখ্যালঘু শিয়া এবং ঘটনাগুলি ঘটেছে পাঞ্জাবে।

অতঃপর উপজাতি (ethnic) সংঘর্ষের সমস্যা।

পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী উত্তরপ্রদেশ-বিহার-মধ্যপ্রদেশের উর্দুভাষী মুসলমানদের বেশ একটা অংশ নুতন রাষ্ট্রের জন্মের পরই সেদেশে প্রধানত সিন্ধু প্রদেশে গিয়ে আর্থিক দিক থেকে বেশ গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। মুসলিম লিগের সর্বভারতীয় নেতৃত্বে তাঁদেরই প্রাধান্য ছিল বলে সরকারি চাকুরি এবং লাইসেন্স-পারমিট জোগাড় করে ব্যবসার ক্ষেত্রে দু'পয়সা উপার্জনও করছিলেন। কিন্তু ধীর গতিতে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের কাছ থেকে নতুন ক্ষমতাধীশদের যতটুকু দোহন করা সম্ভব তাতে সবার আকাঙ্ক্ষা মেটে না। বিশেষ করে আদি অধিবাসীদের। তাঁদের মধ্যে সচেতন গোষ্ঠী তাই প্রতিবাদ জুড়ে দিলেন। তাঁদের বক্তব্য, বহিরাগত মুহাজিররা সব লুটেপুটে নিচ্ছেন, স্থানীয় পাকিস্তানিদের ভাগে বিশেষ কিছু পড়ছে না। আর মুহাজিররাও স্থানীয় (সিন্ধি) ভাষা শেখা বা তাদের সঙ্গে রোটি-বেটির সম্বন্ধ করার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। নিজেদের উর্দু ভাষা ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত তহজিব-তমদ্দুনের অহমিকায় স্থানীয় পাকিস্তানিদের তাঁরা একটু অনুকম্পার দৃষ্টিতেই দেখতেন। দেশজ পাকিস্তানিদের সঙ্গে একাত্ম হবার সচেতন প্রয়াস তাঁদের তরফে হয়নি। ভারত থেকে পাকিস্তানযাত্রী পাঞ্জাবি মুসলমানদের এ সমস্যায় ভুগতে হয়নি। প্রধানত পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করে ওখানকার ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে একাকার হতে পেরেছেন। সিন্ধি বনাম উর্দুভাষী মুহাজিরদের বিবাদ বাড়তে বাড়তে গত কয়েক বছরে তা গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করেছে। পরস্পরকে হত্যা ও গোষ্ঠীগতভাবে একে অপরের সম্পত্তি নষ্ট করা লেগেই আছে। বিচ্ছিন্নতাবাদের ভয়াবহতার আভাস পাওয়া যাবে পাকিস্তানে সদ্য (১০ই মার্চ, ১৯৯৯) প্রকাশিত শ্রীমতী আসমা জাহাঙ্গীরের বেসরকারি মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে। কেবল ১৯৯৮ সালেই করাচি শহরে এই গৃহযুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ১১৭৮। সমগ্র পাঞ্জাবে একই সময়-পরিধিতে নিহত হয়েছেন ৪৮১১ জন পাকিস্তানি নাগরিক। ওই প্রদেশে অপরাধের ঘটনাবলী পূর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি সর্বতো-পৃথক জনগোষ্ঠী হয়ে পড়ায় পাকিস্তানে অস্মিতার সঙ্কটের অপর একটি দিগন্ত খুলে গেছে। এর সমাধানের কোনও সম্ভাবনা আপাতত দিকচক্রবালেও দেখা যাচ্ছে না।

পাকিস্তানে অঞ্চলভিত্তিক উপজাতিকেন্দ্রীক (ethnic) সংঘর্ষও কম নয়। কয়েকটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বিষয়টির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব। পাক-ভারত মৈত্রীর যে সংগঠনটির সঙ্গে আমি কয়েক বছর যাবত যুক্ত তার সম্মিলিত অধিবেশন উপলক্ষে ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে আমি কয়েক দিনের জন্য পাকিস্তানে ছিলাম। পেশোয়ারে সম্মেলনের প্রথম দিন এক ভোজসভায় পরলোকগত সীমান্ত গান্ধীর নাতি প্রায় সাত ফিট উচ্চ তরুণ আসফুন্দিয়ার ওয়ালির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পিতা ওয়ালি খাঁর মতো তিনিও সক্রিয়ভাবে সীমান্ত প্রদেশের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং ওই প্রদেশের বিধানসভার সদস্য। পেশোয়ার যাবার পরিকল্পনা হবার পরই আমি বাদশা খাঁর জীবনী সম্বন্ধে কিছু তথ্যের জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। পেশোয়ার থেকে অল্প কিছু দূরে তাঁর গ্রাম চরসদ্দায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক জানাতে জনাব আসফুন্দিয়ার বললেন যে তিনি তখন রোগে শয্যাশায়ী ও শীঘ্রই তাঁর অস্ত্রোপচার হবে বলে ওয়ালি খাঁ সাহেব তখন দেখা করার অবস্থায় নেই। তবে আমার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে সম্মত হলেন। আমার চিঠিখানি পিতা

পেয়েছেন কি না জিজ্ঞাসা করায় আসফুন্দিয়ার সাহেব উত্তর দিলেন যে না পাওয়াই সম্ভব। কারণ একে তো ভারত থেকে চিঠি এবং দ্বিতীয়ত তাঁদের পরিবারকে এখনও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

জনাব লতিফ আফ্রিদি খাইবার এজেন্সি থেকে প্রথম নির্বাচিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের (পার্লামেন্টের) সদস্য। তাঁর সাহায্যে আমরা কয়েকজন বিদেশিদের পক্ষে নিষিদ্ধ খাইবার গিরিপথ দেখার সুযোগ পাই প্রায় আফগানিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে। তিনি আমাদের পাক-ভারত মৈত্রী সমিতির ওদেশের একজন বড় পৃষ্ঠপোষকও বটে। বলা বাহুল্য তিনিও পুস্তভাষী আর ওই অঞ্চলের অনেকের মতো বাদশা খাঁর অনুরাগী। পেশোয়ার শহরের বনিকসভা কর্তৃক আমাদের জন্য আয়োজিত এক ভোজসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঠাট্টার ছলে হলেও তিনি প্রকাশ্যে মন্তব্য করলেন যে পাঞ্জাবি প্রভাবিত পাকিস্তান সরকার তাঁদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করে। পাক-ভারত মৈত্রী সমিতির এক বিশিষ্ট সদস্য পাঞ্জাবি ড. সুবাশির হোসেনের (ভুট্টোর আমলের মন্ত্রী) দিকে প্রকাশ্যসভায় অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাদের মতো ভারতীয়দের উপস্থিতিতেই তিনি এই অভিযোগ করলেন। শুধু এই নয়। খাইবার এজেন্সির বেশ কয়েকজন ব্যক্তির কাছে শুনলাম যে তাঁদের পাখতুন খুয়া ('পাখতুনদের দেশ') স্বাধীন, তাঁরা পাকিস্তানের ধার ধারেন না। একথা সত্য যে লান্ডিকোটা বা কাবুলের সড়কের পাশে দু'দশটি ছোট-বড় বাজার ও জনপদ ছাড়া খাইবার এজেন্সির ভিতর আর সর্বত্র পুরাতন উপজাতিদের জির্গার শাসনই চলে। তবু মুদ্রাব্যবস্থা, ডাক-তার এবং সৈন্যবাহিনী ও সীমান্তরক্ষীর দায়িত্ব পাকিস্তান সরকারের, যদিচ খাইবার গিরিপথ দেখার সময়ে নির্ধারিত অর্থ জমা দিয়ে আমাদের দু'জন খাইবার এজেন্সির সশস্ত্র পুলিশ বাসে রাখতে হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নটা প্রশাসনিক ব্যবস্থার নয়, মানসিকতার।

এই পৃথক মানসিকতার প্রশ্ন পেশোয়ার ও সীমান্তপ্রদেশের অন্যত্রও লক্ষ করেছি। প্রায় সবাই নিজেদের পাকিস্তানির বদলে পাখতুন বলে পরিচয় দিতে বেশি পছন্দ করেন। নিজ রাজ্যকে ইংরেজদের দেওয়া নাম উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বদলে পাখতুন খুয়া বলেন। এই উপজাতীয়তাবাদের (sub nationalism) মানসিকতার আর একটি আবেগমণ্ডিত অভিব্যক্তি দেখলাম পাক-ভারত জনমঞ্চের স্থানীয় উদ্যোক্তাদের দ্বারা আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। পুস্ত ভাষায় ওঁদের এক জনপ্রিয় গায়কের উদাত্ত কণ্ঠের গান শুরু হতেই অধিকাংশ স্থানীয় দর্শক বেশ উচ্চকণ্ঠেই গলা মেলালেন। কয়েক জন দর্শক তো মঞ্চের সামনে এসে নৃত্য শুরু করে দিলেন। আশেপাশের দর্শকদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ওটা পাখতুনদের "জাতীয় সঙ্গীত"। তাই শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর এই আবেগোচ্ছ্বাস। শুনেছি বেলুচিস্তান ও আরও কোনও কোনও অঞ্চলেও এরকম স্থানীয় স্বাদেশিকতার প্রভাব বিদ্যমান।

অতঃপর ভাষার প্রশ্ন। পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে "বাওম-এ-মুসলমান" ও "জবান-এ-উর্দু" শ্লোগান জনপ্রিয় হলেও পূর্ব পাকিস্তান যে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের বছর ঘোরার পূর্বেই ঢাকায় প্রকাশ্যভাবে কায়েদ-এ-আজমের মুখের উপর উর্দুর বিরোধিতা করেছিলেন তা আমরা জানি। মূলত "মুখের ভাষার" প্রশ্নে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ পৃথক হয়ে যায়। তারপর প্রধানত ওই উর্দু ভাষা ও তহজিব-তমদ্দুন-এর প্রশ্নে মুহাজিররা সিন্ধিদের কাছে এক ঘরে। উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হলেও কোনও পাকিস্তানি মূল নাগরিক অথবা প্রদেশের ভাষা নয়। এমনকী যে পাঞ্জাবিদের ভিতর পাকিস্তান-মানসিকতা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মনে হয়, তাঁরাও দেখেছি ভারতীয় পাঞ্জাবিদের সঙ্গে পাঞ্জাবি ভাষাতে কথা বলেই আনন্দ পান বেশি। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ওঁদের জাতীয় সংহতি বা অস্মিতার খুব সহায়ক বলে মনে হয় না। পাঞ্জাবিদের মধ্যেও দেখলাম 'সিরাইকি' নামের এক আঞ্চলিক ভাষার বেশ প্রভাব। পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে যে হিন্দু 'সিরাইকি" ভাষী ভারতে বা অন্যত্র আছেন, তাঁদের মধ্যে ওই ভাষাকে কেন্দ্র করে একটি সংগঠনও গড়ে উঠেছে। ওই সংগঠনের দুই একবার আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার বিবরণ দেখলাম।

পাকিস্তানের অস্মিতা-সমস্যার আরও দু'টি দিকের কথা বলে আমাদের বক্তব্যের উপসংহার টানা হবে। পাঞ্জাব-সিন্ধুর সামন্তবাদী এবং সীমান্ত প্রদেশ বালুচিস্তানের উপজাতীয় আর্থ-সামাজিক- সাংস্কৃতিক কাঠামো ছাপিয়ে ও-দেশে আধুনিক যে-কোনও দেশের মতোই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা পুষ্ট ও যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক দেশ-বিদেশে শিক্ষিত এইসব নর-নারীকে আর ধর্মভিত্তিক মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার গণ্ডির মধ্যে বন্দি করে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ পাকিস্তানের মূল প্রেরণা—ইসলামি রাষ্ট্র। ইসলামি মৌলবাদীরা ছাড়াও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শাসক-রাজনৈতিক নেতারাও বিপদ দেখলেই ইসলামের দোহাই দিয়ে গদি সামলাবার চেষ্টা করেন। ফলে তাঁরা মনেপ্রাণে না চাইলেও মৌলবাদীদের হাত শক্ত হয়। ও-দেশের শরিয়তি আদালত বা হুদুদ আইন ইত্যাদি এর উদাহরণ। জিন্নারই মতো ভুট্টো, বেনজির অথবা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ বাধ্য হয়ে প্রশাসনে ইসলামের প্রবর্তক। না চাইলেও পাকিস্তানিসমাজে মৌলবাদীদের প্রভাববৃদ্ধিকারী। কিন্তু পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তসম্প্রদায় এতে রাজি নয়। প্রতিবেশী আফগানিস্তানে তালিবানদের মৌলবাদী দাপট দেখে স্বদেশে ওই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে স্বভাবতই তাঁরা অনিচ্ছুক। এই কারণে

মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলি ও-দেশে নির্বাচনে সুবিধা করতে পারে না। অথচ জাতি হিসাবে অস্মিতা চেতনাকে টিকিয়ে রাখতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বড় একটা অংশ এখনও ইসলাম ছাড়া অপর কিছুর উদ্ভব করতে পারেননি। মৌলবাদ ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব পাকিস্তানের সমাজে তাই প্রকট।

তালিবান ও মৌলবাদীদের প্রসঙ্গে পাকিস্তানের অস্মিতা এবং এমনকী নিছক অস্তিত্বের আরও দুটি সঙ্কটের প্রতি ইঙ্গিত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার দীর্ঘকালীন অঘোষিত যুদ্ধে শেষোক্ত দেশের প্রচ্ছন্ন এজেন্ট রূপে পাকিস্তান ওই সময়ে আফগানিস্তানের তালিবান সদৃশ মৌলবাদীদের আমেরিকার বিপুল অর্থ ও আধুনিক অস্ত্র সরবরাহের কাজ করেছে। সেই সব অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রের একটা বড় অংশ স্বভাবতই পিছনের দরজা দিয়ে পাকিস্তানেও ঢুকে পড়েছে। যাদের হাতে ওসব গেছে তারা ও-দেশের রাজনীতি ও ব্যবসায় জগতের প্রভাবশালী বর্গ। ওই বিপুল বেহিসাবি টাকা ও অস্ত্র পাকিস্তানে অবাধে ছড়িয়ে পড়ায় ও-দেশের সমাজ-অর্থব্যবস্থা-রাজনীতিতে অসুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তানে থেকে থেকেই যেসব আত্মঘাতী দাঙ্গা ও হত্যালীলা সংঘটিত হয়, ওই গোপন অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র তার প্রভূত সহায়ক।

এই অরাজকতার পরিস্থিতির অপর একটি উপাদান হল আফগানিস্তান ও বিশেষ করে পাকিস্তানের সীমান্তপ্রদেশের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় ড্রাগ উৎপাদন ও তার আন্তর্জাতিক চোরাচালান ব্যবসার প্রসার। এক্ষেত্রের মাফিয়ারাও অত্যন্ত প্রভাবশালী ও সমাজের উচ্চবর্গের রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, এমনকী সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট। ওই শ্রেণীর লোকেরা ড্রাগের ব্যবসায়ে রাতারাতি প্রচুর ধনোপার্জন করে পাকিস্তানের সমাজে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। রাশিয়া ও তার আশ্রিত সরকারের বিরুদ্ধে আফগান যুদ্ধের সময়ে আমেরিকা এইসব ড্রাগ ব্যবসায়ীদের প্রতি চোখ বুজে থাকলেও নিজের এবং নিজ শ্বেতাঙ্গ মিত্রদের স্বার্থে বর্তমানে এই ড্রাগ ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। খাইবার পাসে যেতে যেতে খাইবার এজেন্সিতে এক জায়গায় মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যান সদৃশ্য এক হরিৎভূমিতে সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এক বিরাট প্রাসাদের অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে সঙ্গী লতিফ আফ্রিদিসাহেবের প্রতিনিধির কাছে তার মালিক কে জানতে চাইলাম। শুনলাম সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ওখানকারই এক ড্রাগ ব্যবসায়ী। বর্তমানে তিনি অবশ্য আমেরিকায় কারাবন্দি। বলা বাহুল্য অনৈতিকভাবে প্রাপ্ত অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও ড্রাগ—এ সবই ইসলামবিরোধী। ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তান এসব ইসলাম বিরোধী ও আত্মঘাতী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান করবে তা দেখার বিষয়।

অপর দিগন্তটি হল ধনী-দরিদ্রের দুস্তর ব্যবধান। ভারত-বাংলাদেশের মতোই নতুন মধ্যবিত্তসমাজে ওখানে উপভোক্তাবাদ ও সম্পদের কুৎসিত বহিঃপ্রকাশ। আর এ সবই রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিজ ব্যক্তি ও শ্রেণীস্বার্থে অন্যায়ভাবে কাজে লাগিয়ে। পাকিস্তানের ১৪ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ৯ কোটি ৮০ লক্ষ নিরক্ষর। অর্ধেক অধিবাসীর কাছে স্বাস্থ্য-পরিষেবা স্বপ্ন। শিশুমৃত্যুর হারে অল্প কয়েকটি রাষ্ট্রই পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ৭০ লক্ষ নাগরিকের মাথার উপর আচ্ছাদন নেই। দারিদ্র ও বেকারি ভয়ঙ্কর। আর্থিক দিক থেকে পাকিস্তানি সমাজ প্রকটভাবে স্তরবিভক্ত। এর উপর কোনও রকমে যে সামরিক বাহিনীকে রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে পাঠানো গিয়েছিল, বুদ্ধিদোষে নওয়াজ শরিফ তাকে আবার নিজের দুর্বল প্রশাসনের "সহায়তায়" সামনে আনছেন। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক আদেশে ও প্রচেষ্টায় সাময়িক বাধা পড়েছে ঠিকই। কিন্তু যথার্থ জনসমর্থন পাবার জন্য জনকল্যাণকারী পদক্ষেপ নেবার বদলে রাজনৈতিক নেতাদের মনে যতদিন সামরিক বাহিনীর "সহজ বিকল্পের" প্রতি সর্বনাশা মোহ থাকবে, ততদিন ভরসা নেই। পাকিস্তানের অস্তিত্বের অর্ধেকের বেশি সময় ও-দেশে প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন সামরিক নিয়ন্ত্রণ ছিল। তাই জাতিরাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের অস্মিতা বা আত্মপরিচয়ের সঙ্কট বেশ গভীর।

॥ ৪ ॥

এ প্রতিবেদনকে যেন পাকিস্তান-দূষণ বিবেচনা করা না হয়। বিশেষ করে ভারতে, যেখানে আমরাও কাচের ঘরের অধিবাসী। আর কেবল ভারতীয় উপমহাদেশের সাম্প্রতিক কালের রাষ্ট্রগুলি কেন—গোড়াতেই বহু পুরাতন রাষ্ট্রের অস্মিতার সঙ্কটের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পাকিস্তানের এই দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধে ভারতে আমাদের এই জন্য সচেতন থাকা উচিত যাতে আমরা সেসব সংবেদনশীল স্থানে ভুলবশত আঘাত না দিই। ভারতের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া পাকিস্তানকে ভেঙে বাংলাদেশের সৃষ্টি হতে পারত না বলে ভারত সম্বন্ধে একটা গভীর অবিশ্বাস ও ভীতি ওদেশে আছেই। এই অবিশ্বাস কমাবার সক্রিয় চেষ্টা চাই আমাদের তরফ থেকে। প্রথমেই বলা হয়েছে যে আমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য শক্তিশালী পাকিস্তানকে বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে কাম্য। বলা বাহুল্য পাকিস্তানেরও মঙ্গল এতে। তাই উভয় দেশের পরস্পরকে বুঝে চলা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ধনে-জনে-সম্পদে অনেক বেশি সমৃদ্ধ হওয়ায় এই বোঝাপড়ার ব্যাপারে ভারতের দায়িত্ব একটু বেশি। সেই কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্যই পাকিস্তান সম্বন্ধে এই আলোচনা। □

[কারগিল ক্ষেত্রে 'প্রায়-যুদ্ধ' পরিস্থিতির আগে এই নিবন্ধটি লিখিত—সম্পাদক-চতুরঙ্গ]

শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য বার্লিন সম্মেলন : জুন, ১৯৯৯

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ধর্মের মূলসূত্রের নামে আধুনিকতাবিরোধী ও সহিষ্ণুতাবিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে জীবনধারা প্রবর্তনের আদর্শ ইদানীং মৌলবাদ বলে পরিচিত তা আজ সারা বিশ্বেই ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে; এই সত্যের একটা দিক হল খাদ্য-বস্ত্র ও গৃহ সমস্যায় জর্জরিত দুটি দেশ কর্তৃক ১৯৯৮ সালের মে মাসে একাধিক আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যুদ্ধ শক্তির দম্ভ ঘোষণা। এর পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানির হুমবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত ১৭, ১৮ ও ১৯ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত হল এক বিশাল আলোচনাচক্র। উল্লেখযোগ্য যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেই ১৯৪৩ সালের ১০ মে নাৎসিরা এক ভয়ঙ্কর গ্রন্থদাহ যজ্ঞ করেছিল যা চিন্তা ও বুদ্ধির বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতার এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। দগ্ধকৃত গ্রন্থগুলির স্মারক রূপে এখানে আছে দুটি তাম্রফলক যাতে লেখা আছে হাইনের একটি উক্তি : বই পোড়ানো মানে তার লেখক মানুষটিকেও পোড়ানো। এখানে দাঁড়ালে আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

এই আলোচনাচক্রের আয়োজনে হুমবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে শান্তিনিকেতন-বার্লিনের ট্যাগোর-আইনস্টাইন কাউন্সিল। এই কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিতদের স্বাগত জানান অধ্যাপক সুনীল সেনগুপ্ত। প্রথম পত্রেই বিশ্বভারতীর উপাচার্য দিলীপকুমার সিংহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশ্চর্য উন্নতির পাশাপাশি মূল্যবোধ ও নীতিবোধের অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির অধ্যাপক অনিলকুমার সরকার সন্ধান করেন একদিকে অসহিষ্ণু মৌলবাদের অন্যদিকে উদার বিশ্বায়ণের যে-স্ববিরোধিতা তার অন্তর্গত সূত্রাবলির। বিশেষ চিন্তা-উদ্দীপক ভাষণ দেন মাগডেবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানফ্রেড উয়সেলের—তাঁর বিষয় ছিল বিগত বিশ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুনরুত্থিত মৌলবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। প্রথম দিনের প্রধান আকর্ষণ মহামান্য দলাইলামা তাঁর বহুভাষিত বক্তব্যগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেন।

ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রমে কীভাবে মৌলবাদ ও প্রতিবেশী-ঘৃণা শিক্ষা দেওয়া হয় তা নিয়ে দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করেন ভারতের পবিত্র সরকার ও পাকিস্তানের রুবিনা সাইগল। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মনীষা সেন কোরান ও হাদিসের অহিংসা ও উদারতার এবং হুমবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. হিলট্রুড রুয়েসটাউ হিন্দুধর্মের সহিষ্ণুতার উপর আলোকপাত করেন। ভ্যাঙ্কোবার থেকে আগত লি তান মৌলবাদ ও সহিষ্ণুতার ব্যাখ্যা করেন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি সেই প্রেরণার কথা মনে করিয়ে দেন যাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে এক-নীড় রূপে উপলব্ধি করেছিলেন। বিশ্বভারতীর স্বপন মজুমদার সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদের যে-ব্যাধি তার প্রতিকারের জন্য পর্যালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথের সমাধান। দলিতদের প্রতি হিন্দুত্বের রাজনীতি সম্পর্কে মুম্বাইয়ের ড. এস. এম, মাইকেল প্রশ্ন তোলেন এবং বর্তমান প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল যে রাষ্ট্র সেকিউলার হলেই কি সমাজ বা জাতিও সেকিউলার হয়?

এই আলোচনাচক্রের অপর অংশ ছিল আণবিক বিস্ফোরণের পর দ্রুত পরিবর্তমান দক্ষিণ এশীয় চিত্রনাট্যের বিশ্লেষণ ও মূল্য-নির্ণয়। ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্রসচিব অধ্যাপক মুচকুন্দ দুবে, নতুন দিল্লির ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল চেঞ্জের অধিকর্তা ভবানী সেনগুপ্ত, ওয়াশিংটনের দ্য হেনরি এল্ স্টিমসন সেন্টারের সভাপতি অধ্যাপক মাইকেল ক্রেপন, স্ট্রাসবর্গের অ্যাকাডেমি অব দ্য ফেডেরল আর্মড ফোর্সেস ফর কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফর্মেশনের ড. শ্বেন বার্ণহার্ড গারেইস, জেনেভার ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সলান্টিক সিকিউরিটির ড. ওলিভার মেয়ার, হুমবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. ইভা মারিয়া হেকসামার ও অধ্যাপক ভিথেলম ভাইডেমার, ইসলামাবাদস্থিত ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের সভাপতি ড. তনভির আহমেদ খান, নতুন দিল্লির অ্যাকাডেমি অব থার্ড ওয়ার্ল্ড স্টাডিজের অধ্যাপক শ্রীপ্রকাশ, ভিয়েনার ইন্টারন্যাশনল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির ড. সৌরভ সনাতনী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী পত্রপাঠ ও বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব পরিবর্তনকারী সমস্ত আন্দোলনেরই শুরু হয় মুষ্টিমেয় সচেতন ব্যক্তির উদ্যোগে ও কল্পনায়, ক্রমে ক্রমে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকশিত হয় মহান বাস্তবে। বার্লিনের এই সম্মেলনও আগামী শতাব্দীর শান্তি ও সম্প্রীতি সুরক্ষার জন্য এক মননশীল আন্দোলনের সূচনা। সবশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি শ্রীমতী হিল্লোলা দত্তের কাছে যাঁর সৌজন্যে আমার পক্ষে বার্লিনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। □

একটি উপন্যাস : দুটি বিচার

‘এ লেখার তীক্ষ্মতা... সচকিত করে, যন্ত্রণা দেয়’

কুমার রায়

এমন এক সময়কে ধরেছেন মধুময় পাল তাঁর উপন্যাস ‘আলিঙ্গন দাও, রাণি’-তে যে সময়টা আমরা অতিক্রম করে এসেছি। কিন্তু সত্যিই এসেছি কি? না হলে পড়তে পড়তে কেন এত স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে সময়ের অনুষঙ্গগুলি—ভুলে যেতে পারলেই তো ভাল হত। অবহেলিত প্রেম, প্রেমের মহত্ত্ব সত্ত্বেও কোথায় তাকে নমিত হতে হয়। বিবেকহীনতার সামনে গভীরতায় কৃতজ্ঞতাও অকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। ক্ষমা সেখানে পৌঁছতে পারে না। এই নিরন্তর সঙ্ঘর্ষের সমাধান নেই। আছে শুধু নির্ণয়হীন যন্ত্রণা। তাই মধুময়ের উপন্যাসে আমরা দাঁড়িয়েছি আমাদের মুখোমুখি। ভীষণ তেঁতো লাগে কিন্তু তবু এ লেখার তীক্ষ্মতা—কটু স্বাদ ভুলিয়ে দিয়ে, সচকিত করে যন্ত্রণা দেয়। ভালবাসতে গিয়েই জীবনের অর্থহীনতার উপলব্ধির মধ্যেও জীবনকেই ভালবাসতে হয়। এ এক অন্য ধরনের উপাখ্যান। এর চিত্রধর্মিতা প্রাণিত করেছে গণেশ হালুই, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত প্রমুখ চিত্রশিল্পীদের পরাবাস্তব ছবির সৃজনে, যা শোভিত হয়েছে উপন্যাসের প্রচ্ছদে, অঙ্গসজ্জায়। উপন্যাসের মধ্যে অ্যাবসার্ড নাটকের সুর যেন। কিংবা পরাবাস্তব প্রকাশের জন্যই এ লেখার অমার্জিত শব্দপ্রয়োগ ধাক্কা দিয়েও নিষিদ্ধ বলে মনে হয় না কাহিনীর মধ্যে। নতুবা মনে হতে পারত লেখকের মনের বিকার। কাহিনী বিন্যাসের প্রবাহের মধ্যে আগল নেই, পরোয়া নেই, বহুদিনের সঞ্চিত অভ্যাসের যুক্তি এবং বিন্যাস যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া গেছে।

মধুময়ের এটি প্রথম উপন্যাস। জানি না এর পরের উপন্যাসে তাঁকে কীরকম দেখব। কিন্তু এই প্রথম উপন্যাসে দেশভাগের, স্বাধীনতার, রাজনৈতিক দেউলেপনার বা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন, অত্যাচার নৃশংসতার চিত্র ধরা পড়েছে আপন বিশ্বাসের মনোভূমিতে। মধুময় দেখেছেন এক বিকলাঙ্গ অন্ধ সমাজকে, তার পারিপার্শ্বকে। উপন্যাসের নায়ক কৃষ্ণদাস। তার সঙ্গে পরিচয় হয় দেবব্রতর। তারা কি এক শরীরেই দু'জন থাকে?

কৃষ্ণদাস বিশ্বাস করে “হিংসা একটা চলমান প্রক্রিয়া। আজ যারা হিংসার পথেই মানুষের মুক্তির শাস্ত্রীয় পথিক, কাল তারাই ক্ষমতায় গিয়ে মানুষের মুক্তির পথ হিসেবে হিংসাকে অফিসিয়ালি, ডিসকার্ড করে অথচ, রাষ্ট্রীয় হিংসাকে পুষ্টি দিয়ে যায়।” (পৃঃ ৩৫) এর পর স্বাভাবিক প্রশ্ন তোলে, “হিংসার পথ ধরেই কি তা হলে চিরকাল ইতিহাস হাঁটছে, হাঁটবে?”

দেবপ্রিয় কৃষ্ণদাসের পরিচিত। সে কৃষ্ণদাসের জীবনী লিখছে যেন—কেননা কৃষ্ণদাস মারা গেছে। মারা গেছে এক খারাপ মেয়েছেলের বাড়ির দরজায় সাপে-কাটা অবস্থায়। সাপে কাটা না আত্মহত্যা? জানে না দেবব্রত।

কৃষ্ণদাস ভেবেছিল, ‘রাণিবৌদিকে ভালবাসা যায় কি? কেন যায় না? গাঢ়, অনন্ত সর্বাবরণকারী অন্ধকার।’ পার্টি থেকে বহিষ্কারের সময় কৃষ্ণদাস জিজ্ঞেস করেছিল—“রন্তিদা, ভাগ্যিস লেপার হওয়ার আগেই তোমরা আমাকে বহিষ্কার করলে!” এই কৃষ্ণদাসের পরিচয় ছিল রানিবৌদির সঙ্গে। এই মানুষটির জন্ম রেফিউজি ক্যাম্পে। দাদু ও দিদিমা তাকে মানুষ করেছে। দিদিমার সঙ্গে কৃষ্ণদাসের সম্পর্ক বড় আশ্চর্য সুন্দর। দিদিমা বই পড়ে। কৃষ্ণদাস শোনে। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা।

মধুময় জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে বঙ্কিমচন্দ্রকে মানেন। বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রতি পরিচ্ছেদের সূচনায় শিরোভূষণ হিসাবে নানান উদ্ধৃতি দেওয়া আছে পূর্বগামী লেখক, কবি, নাট্যকারের লেখার দু'চার ছত্রের মধ্যে পরিচ্ছেদের ভাববস্তুকে প্রকাশ করার জন্য—মধুময়ও এই উপন্যাসে তাই করেছেন। কখনও আলোয়ালের ‘পদ্মাবতী’ থেকে, কখনও বোলান গান থেকে, লোককথা থেকে, মেয়েলি প্রবাদ থেকে। বঙ্কিম যে উদ্দেশ্যে এ কাজ করেছিলেন মধুময়ও সেই একই কাজ করেছেন। উদ্ধৃতির মধ্যেই পরিচ্ছেদের আভাস পাওয়া যায়। এবং সেই সব প্রাচীন লোকসংস্কৃতির পরম্পরায় দেখা যাবে—যাকে আমরা অশ্লীল, অমার্জিত, স্থূল, গ্রাম্য আখ্যা দিয়ে আজকে বর্জন করতে চাই—তা অনায়াসে সেই সমাজে প্রযুক্ত এবং গীত হত। মধুময় সেই ঐতিহ্যটা মাথায় রেখেই বোধহয় অনায়াসে বেপরোয়া হতে পেরেছেন। আর তখনই—“পরিচ্ছন্নতা অপরিচ্ছন্নতা আর পুরোনো সংজ্ঞায় বিচার করা যায় না” কথাটা এসেছে দেবপ্রিয় প্রসঙ্গে (পৃঃ ৮২)। জীবনই দেবপ্রিয়কে এটা শিখিয়েছে। তার প্রেমিকা স্বাগতালক্ষ্মীর সঙ্গে তার সম্পর্কের জটিলতার মধ্যে সেটাই প্রকাশ পায়। আর সেই জটিলতা সে রাজনীতির ক্ষেত্রেও পরীক্ষা করে, বা বিশ্বাস করে। সে হিসাবে দেবপ্রিয় জীবিত। কৃষ্ণদাসের মতো মানুষদের সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ—“কৃষ্ণদাসদের সব কিছু নাকচ করে দেওয়ার মধ্যে যত বলবান ও শুদ্ধ উচ্চারণই থাক, মানুষের প্রতি ভালবাসা নেই।” দেবপ্রিয় স্বপ্ন দেখতে পারে—কৃষ্ণদাসদের মতো বাসি-মরা নয়, ডোম-মাছি তাকে ঘিরে থাকে না। দেবপ্রিয় কৃষ্ণদাসদের মতো শহিদবেদি নয়। দেবপ্রিয়কে কৌটোয় ভরতে চেয়েছিল স্বাগতা। রিনি দেবপ্রিয়র স্ত্রী। একটা অস্থির সময়ের সদিচ্ছাকে দেবপ্রিয়ের মধ্যে নিছক ব্যক্তিগত বলে ঠাট্টা করা যায়। পড়তে পড়তে কারও মন বিরূপতার মধ্যেও হঠাৎ যখন আবিষ্কার করতে পারে যে ব্যক্তিগত জীবনের উথাল-পাথাল কেমন করে সমাজ, সময়ের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থময়তাকে বাড়িয়ে তুলেছে এ-লেখায়। জীবন নিয়ে সময়ের সঙ্গে খেলা করেছেন মধুময়।

কৃষ্ণদাসের দিদিমার মৃত্যু হয়েছিল ভয়ঙ্কর বৃষ্টির মধ্যে। “দিদিমার মৃত্যুতে প্লাবন হয়।” এ উপলব্ধি কৃষ্ণদাসের। হিটলার ভক্ত দাদুও মারা যাবে। এ তল্লাটেই কৃষ্ণদাসের রানিবৌদি এসেছিল বেঁচে থাকা কত আনন্দের সেই খবর নিয়ে। “নামী কুমোরের হাতের সেরা প্রতিমা।” কৃষ্ণদাস ভাবত অভিশপ্ত কিন্নরী। বিনুদার সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল রানিদি। একদিন বিনুদাও ঘর ছাড়ে। রানিদির ঘর ভাঙার জন্য কৃষ্ণদাস দায়ী নয় এমন একটা বিশ্বাস আছে কৃষ্ণদাসের। বিনুদাকে যা শোনানো যায়নি—রানিদি সে সব গোপন কথা বলে কৃষ্ণদাসকে। সেই কৃষ্ণদাস রানির ঘরের সামনে এক রাত্রে সাপের বিষ নিজের শরীরে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করে।

পরীক্ষামূলক উপন্যাস। এখানে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে এক সময় নিজের আসল মুখ আবিষ্কার করে ফেলে মানুষ। রিরংসা, যৌনতার অ-বনেদি প্রকাশ আসলে মনে হতে পারে ইচ্ছাকৃত। এই সময়, এই সময়ের বিশেষ রাজনীতির মুখোসটাকেই যেন মধুময় ছিঁড়তে চেয়েছেন এর মধ্য দিয়ে। তবু এই আয়োজনে কিছু অতিরেক ঘটেছে। কিন্তু আশ্চর্য লাগে এর মধ্যে একটা প্রবল লিরিক আবেদনও আছে। এই লিরিক আবেদন কি অ্যাবসার্ড প্রকাশের অন্তরায়? জানি না।

নামকরণের মধ্যেই যেন এক অবচেতনবাদী ছাপ আছে। কাহিনী বলা হয়েছে দ্রুত, আত্মগত ভঙ্গিতে ব্যক্তিত্বের বিচূর্ণীকরণ নামক আধুনিক প্রক্রিয়ায়।

ঔপনিবেশিক প্রভাবে আমরা উপন্যাসের একটা অনড় রূপ কল্পনা করে এসেছি। কিন্তু সেটা অপরিবর্তনীয় নয় “কেননা নতুন নতুন, বিভৎস সময়ের অভিজ্ঞতা কী ভাবে প্রকাশ পাবে?” উপন্যাস তো স্মৃতিকথা মাত্র নয়—গল্প শুধু ঘটনার নথিভুক্ত হয়েই সার্থকতা পায় না আজ।

আত্মকথনে একটা একক স্বর থাকে, এখানে তা বহুমাত্রা পেয়েছে। উপন্যাসের ভিতর সময়ের প্রবাহ ঢুকে পড়েছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, লোকজীবনের ঢাকনা-বিহীন নগ্ন সত্যের প্রকাশ। এই সব প্রয়োগে উপন্যাসের শৈলী স্বাতন্ত্রে অন্তর্দীপ্ত।

উপন্যাস শেষ হয়েছে,—‘কৃষ্ণদাসের পায়ের পাতা থেকে বিষ ওঠে। দাঁড়িয়ে থাকে একা, অস্ত্রহীন কৃষ্ণদাস।’ এই সমাপ্তি বাক্যেই এ-উপন্যাসের জীবনদর্শন নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে। □

একই বাঙালি দেহে বিবেক ও বিবেকহীনতার দুই অস্তিত্ব

সোহারাব হোসেন

বাংলা কথাসাহিত্য এখন দুটি ধারায় খণ্ডিত। একটি ধারা দৈনিক সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণে বিনোদনমূলক রচনার কারবারে মুখর। এর বিপরীতে অন্য একটি ধারা আছে, যাকে অনেকেই বিকল্প সাহিত্যধারা বলে থাকেন। কেউ কেউ সৎসাহিত্যের ধারাও বলেন। এই ধারা বাংলা কথাসাহিত্যের গঠনমূলক দিকটিকে সমানে পুষ্ট করে চলেছে। জীবন ও সময়কে তার সত্যচিত্রের অবয়বে যথার্থ সাহিত্যিক মর্যাদায় তুলে ধরেছেন এই ধারার লেখকরা। প্রচার-প্রসারের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই ধারার লেখকরা সৃজনশীল গল্প-উপন্যাস রচনায় বেশ শক্তিধর। তাঁদের শক্তিই বাংলা উপন্যাসকে-গল্পকে নতুন করছে—বলিষ্ঠ করছে।

এই বলিষ্ঠতার ধারায় সংযুক্ত থেকেই মধুময় পাল তাঁর সাহিত্যচর্চার পথহাঁটা শুরু করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘আলিঙ্গন দাও, রাণি’-তে তেমন প্রতিশ্রুতির স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। মধুময় পালকে এবং তাঁর উপন্যাসকে বোঝার জন্য প্রথমেই তাঁর উপন্যাস থেকে একটি উদ্ধৃতি তোলা যেতে পারে: “রাণি বৌদির শাশুড়ি পাশের ঘরে ডাকে কৃষ্ণদাসকে। তার লগে কথা কস ক্যান? সবটায় খালি মতলব দ্যাখে। ছেনাল মাগী টিপনি ছাড়া কথা কয় না তো!

কৃষ্ণদাস হাঁ করে শোনে। অনেক অপরিচিত শব্দ, কিন্তু একটা গন্ধ সে পায় যা রাণিবৌদিকে ঘিরে অনেকের চোখের ভেতর মনের ভেতর ঈর্ষা ও ঘৃণার বুনোলতার মত স্পষ্ট। একটা কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, যেখানে রাণিবৌদি বড্ড বেশি জোরালো বাকিরা এলেবেলে। বিনুদার মা, যে এখন অনেক বেশি রাণির শাশুড়ি, কৃষ্ণদাসকে বলে, আয়নার দিকে তাকা। কৃষ্ণদাস তাকায়। রাণিবৌদির বাপের বাড়ি থেকে আসা ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় সে দেখে, উদোম পাছা। মুহূর্তে শাদা থান নামিয়ে ছরকুটে দাঁতে বুড়ি কুটি কুটি হাসে, কী দেখলি?”

আলোচনার প্রথমে এমন উদ্ধৃতি-স্মরণ এই জন্য যে, ঔপন্যাসিক মধুময় পালের রচনারীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়টিকে সরাসরি, কিছুটা হলেও, পাঠক বুঝে নিক। এই সামান্য উদ্ধৃতি চিহ্নিত করায় দুটি দিক। যথা: ১. মধুময় পাল জীবনকে

অবলোকন করেন চরম তিক্ততা ও তীক্ষ্ম বিদ্রূপের দর্শনে। ২. তিনি বর্তমানের তথাকথিত কাহিনী-সর্বস্ব সুখপাঠ্য ধারায় রচিত মান্য রীতির উপন্যাস লিখতে চান না।

হ্যাঁ 'আলিঙ্গন দাও, রাণি'র মধ্যে স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন বাংলা দেশের জীবনপ্রবাহ, যাপনপদ্ধতি, আর্থ-সামাজিক গতিধারার যে সত্য-সন্দর্ভ লেখক নির্মাণ করেছেন তা যথার্থ অর্থে তিক্ততার ইতিহাস। বিদ্রূপেরও। এই তিক্ততা ও বিদ্রূপ কতটা ক্ষতহৃদয় থেকে উৎসারিত তার প্রমাণ উপরের উদ্ধৃতিটির একটি চিত্রকল্পে রয়েছে। তা হল — মাতৃপ্রতিম মহিলা প্রায়পুত্রসম এক যুবককে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে তার নিজের, ঈর্ষা ও ক্ষোভের গরলভাণ্ড, উদোম পাছা। সত্যই তো বর্তমানের সার্বিক নাস্তির যুগে আমাদের দেশ তার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে নির্লজ্জভাবে, এই উপন্যাসের মা-টির মতোই, আমাদেরকে দেখিয়ে যাচ্ছে অমনই এক উদোম পাছা। চোখ-কান-নাক খোলা রাখা পাঠক মাত্রই এ সত্য বুঝবেন আশা রাখি। বিশ্বব্যাপী পণ্যায়নের যুগে আমরা, এই সময়ের তরুণ যুব বাঙালিরা নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ভাষা-আদর্শ-মূল্যবোধ সব কিছু বিকিয়ে দিয়ে বহুজাতিকের অনাস্বাদিত অথচ অপ্রাপণীয় স্বপ্নবস্তুর পিছনে যেভাবে ম্যারাথন-দৌড়ের তোড়জোড় করছি, তার মুখে একজন সৎ-ঔপন্যাসিকের এখন আর প্রবল চপেটাঘাত না মেরে অমনই উদোম পাছা ছুঁড়ে মারা ছাড়া আর কোনও পথ আছে কি?

এখানে অবশ্য একটা কথা স্বীকার্য, যাঁরা এখনও এ দেশে মূল্যবোধের শিকড়ে বাস করে বেঁচে-বর্তে আছেন এ-চিত্র তাঁদের সংস্কারে আঘাত করবে। তবুও বলি, আজকের দিনে লিখে যদি চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তোৎকর্ষ সাধনের কাজ করতেই হয় তবে তার রীত্ নিশ্চিতভাবে মধুময় পালের দেখানো পথকেই সমর্থন করবে। লেখককে সাধুবাদ।

এ তো গেল বিষয়গত প্রতীতির দিক। দ্বিতীয় যে কথাটি এখানে বলার তা হল, ঔপন্যাসিকের নিপুণ শিল্প-নির্মাণের দিক। এখানে লেখক তাঁর নায়ক কৃষ্ণদাসকে ও আমাদের মতো পাঠককে দেশ-কালের যে নগ্নচিত্র দেখালেন তা সরাসরি নয় — দেখালেন দর্পণে, প্রতিচ্ছবিতে। এর মধ্যে একটা গভীর ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে। তা হল, স্বাধীনতা পরবর্তী কালখণ্ডের যে অবক্ষয়ী রূপের চিত্র এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়, তাকে লেখক সরাসরি দেখাবেন না। দেখানওনি। তিনি বাস্তব জীবনের এসব চিত্রকে মিথ, রূপকথা, উপকথার দর্পণে ফেলে দেখিয়েছেন। উপন্যাসের রচনারীতিতে এই ব্যাপারটা অভিনব। কেননা, দর্পণের সামনে মানুষ দাঁড়ালে যেমন সত্য মানুষ ও প্রতিবিম্বিত মানুষ মিলে দুটি মানুষের অস্তিত্ব হয়, এই উপন্যাসের কাহিনী-ঘটনাতেও তাই হয়েছে। যেমন:

ক. উপন্যাসের নির্দিষ্ট কালখণ্ডে যে উদ্বাস্তু-জীবনের ছবি আছে তা বাস্তব। কিন্তু এই বাস্তব যখন রূপকথা, উপকথা ও মিথের দর্পণের মাধ্যমে শিল্পরূপ পেল তখন তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা রক্তাক্ত, অবক্ষয়িত, ঘৃণাজর্জর অন্য এক বাংলাদেশের অস্তিত্ব পাঠকের সামনে জীবন্ত হল। লেখকের শিল্প-অঙ্গুলি সেই দ্বিতীয় অস্তিত্বের দিকে উচানো রয়েছে।

খ. দর্পণের সামনের ও পিছনের দুই অস্তিত্বের মতোই এই উপন্যাসের দুই রানি। একজন — বাস্তবত দেহজীবীপ্রায় অন্যজন রূপকথা-উপকথার রানি। দু'জনেই অতৃপ্ত। দু'জনেরই নাক দিয়ে নির্গত হয় বিষধর সাপ। একজনের রূপকথার নীতিচেতনার সাপ, অন্যজনের এ যুগের নিখিল নাস্তির সাপ।

গ. আজকের দিনে, আজকের সমাজে বাঙালিজীবন তার বিবেককে হারিয়ে ফেলেছে। আজকের বাঙালির দেহে-মনে যদি কোথাও বিবেক কিছু বর্তমান থাকে, তাকে বর্তমানের দুর্নীতিপরায়ণ, আত্মস্বার্থসর্বস্ব রাজনীতি ও বহুজাতিক স্বপ্নের মাদক কেড়ে নিচ্ছে — নষ্ট করে দিচ্ছে। বলতে পারি এই বাঙালি দেহে বিবেক ও বিবেকহীনতার দুই অস্তিত্ব এখন নিয়ত দ্বন্দ্বশীল। আয়নার সামনে-পিছনের দুই অস্তিত্বের মতো এই উপন্যাসেও যেমন এক মানুষের দুই রূপ — কৃষ্ণদাস-দেবপ্রিয়। একজন বিবেক, অন্যজন বিবেকহানিকর। একজন সত্যসন্ধিৎসু, অন্যজন সত্যহন্তারক। এ জন্যই একই রাজনীতির সতীর্থ হয়েও কৃষ্ণদাস এমন বিপর্যস্ত জীবনযাপন করে, অন্যজন সুখের পায়রা।

আসলে সমগ্র উপন্যাসটিকে মধুময় পাল এমনই দ্বিত্ব-অস্তিত্বে ধরতে চেয়েছেন। এ কাজে তাঁর সাফল্যের ভাগই বেশি — ব্যর্থতা সামান্যমাত্র। দেবপ্রিয়-উপাখ্যানটি যেন দুর্বল অনেকাংশে। কৃষ্ণদাস-আখ্যানে যেমন গল্পে-কাহিনীতে সত্যসন্দর্ভে শিল্পের নতুন মাত্রা এসেছে, দেবপ্রিয়-উপাখ্যানে যেন তার বিপরীত। গল্প এখানে যেন লেখকের-ন্যারেশনে পথ হারিয়েছে।

কিন্তু এহ বাহ্য। বাংলা উপন্যাসে প্রতিষ্ঠান-লালিত যে তরল ও জনপ্রিয় ধারার বর্তমানে রমরমা চলছে তার বিকল্প-ধারায় মধুময় পালের উপন্যাস একটা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। সময়-সমাজ সম্পর্কে লেখকের যে তিক্ততা, যে রাগ, যে বীতশ্রদ্ধা তাকেই সম্বল করে গড়ে ওঠা 'আলিঙ্গন দাও, রাণি' সব শ্রেণীর না হলেও দীক্ষিত ও মননশীল পাঠককে নাড়া দেবে। □

আলিঙ্গন দাও, রাণি — মধুময় পাল / নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-৬ / ৩৫.০০।

মুক্তিকামী মেধা ও তরুণ সৈনিক

অনিতা অগ্নিহোত্রী

সমীরণ দাশগুপ্তর অশ্রুনদী (১৯৭১) আমি পড়িনি। ১৯৯৬-এ প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'অমিয়র স্বদেশ'-এর প্রথম গল্পটি (নৌকা, তাঁর নয়নমণি) 'সকাল'-এ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সালে। হয়ত এই প্রথম আমি কোনও সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থ পড়লাম, যাতে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির রচনাকাল আড়াই দশক ধরে বিস্তৃত। প্রকাশকাল একটু হ্রস্ব, ১৯৬৭–১৯৮২ পনেরো বছর। মুখবন্ধে লেখক বলেছেন 'দেশ বিভাগ এবং পরবর্তীকালে ব্যক্তির বাঞ্ছিত স্বদেশের সন্ধান — সংকলনের গল্পগুলিকে এভাবে বিচার করা বোধহয় সঙ্গত হবে'। 'বাঞ্ছিত স্বদেশের সন্ধান'-এর মতন জীবনব্যাপী সাধনার ফল লতাগুল্মে ফলে না। গল্পগ্রন্থটি সেইজন্য তিলে তিলে, ধীরে ধীরে, সময়ের রৌদ্র ও বৃষ্টিতে জারিত হয়ে মহীরুহের মতন নিজেকে বিস্তৃত করেছে।

স্বতন্ত্র, অথচ লেখকের নির্মাণচেতনার প্রবহমানতা একটি কশেরুকার মতো গ্রন্থটিকে ধারণ করে আছে, এই অনুভূতি সচেতন পাঠককে স্পর্শ করবেই। লেখক প্রায় অদৃশ্য, অথচ সর্বত্র বিরাজমান — আজকের দৃশ্যমানতার প্রতিযোগিতার যুগে এ এক গা ছমছম্ করানো অভিজ্ঞতা। 'ঘোড়সওয়ার' গল্প যাদের নিয়ে লেখা, রক্ত ঝরিয়ে ঊষর মাটিতে ফসল ফলানো মানুষদের, তাদের মুখের ভাষা এই গল্পে ব্যবহার করা হয়নি। বুড়াদাদা, তার নাতি, তুফানী নামের এক ঈর্ষাতুর পোষমানানো বন্য ঘোড়া, সুখাই, পার্বতী এদের মধ্য দিয়ে মৃত্যু এসেছে গেছে। ক্যানেস্তারা বাজে খেতে নেমে আসা পাখিদের তাড়াতে, শস্যে ভরে উঠেছে গাছ, তারপর ফলবান গাছ মারা গেছে; তুফানী মারা গিয়েও তার খুরের শব্দে ভরে রেখেছে চারদিক। মুক্তি পেয়েছে তুফানী, অথচ সুখাই এসে যতক্ষণ না বিশাল শস্য খেতের ভার নিচ্ছে, ততক্ষণ ফলভারনত, ক্লান্ত তুফানীর মালিক ক্যানেস্তারা বাজিয়েই চলেছে, তার মুক্তি নেই।

মুক্তিঅভিলাষী আত্মার উদ্দেশে নিবেদিত এই লিরিক্যাল গল্পটি পড়ে মন শান্ত হয়। বিশেষ করে, যখন আখ্যানহীন আধুনিক গল্পের নামে নানা মল্লযুদ্ধের মহড়া পাঠককে ক্লান্ত করে তোলে। সমীরণ দাশগুপ্ত এই কোলাহলে একটি নির্জন দ্বীপ।

'আবরণ', 'সনাক্তকরণ' দুটি গল্প মধ্যবিত্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এক অস্থির সময়ের কয়েকটি দৃশ্য। গল্প বা আখ্যান বলতে গেলে কিছুই নেই। 'সনাক্তকরণে' প্রায় অচেনা শিশির তার একজোড়া চটি ফেলে রেখে উধাও হয়ে যায়। সম্ভাব্য রাজনৈতিক শত্রুরা শিশিরকে খুঁজছে, তার আশ্রয়দাতা সন্দেহে নিখিলের উপর নজর রাখছে। অথচ শিশিরকে শনাক্ত করার মতো কোনও সূত্রই নিখিলের কাছে নেই। কেন যে সে এসেছিল, তাও অজানা রয়ে গেছে। ছোট্ট তাতার আঁকা ছবি — শিশিরের শরীরে নিখিলের মুখ — তার মনে নিজের বেঁচে থাকার প্রণালী সম্বন্ধেই আতঙ্ক আর সংশয় তৈরি করে।

"চেয়ে দেখল বারান্দার এক কোণে বসে তাতা মনোযোগ দিয়ে শ্লেটের বুকে কি ছবি আঁকছে। দেখতে দেখতে সহসা অতি তুচ্ছ অথচ ভয়ঙ্কর চেনা একটা আতঙ্ক শূন্য থেকে লাফ মেরে তার বুকের মধ্যে উঠে এলো। উঠে আড় হয়ে ঠেকে গিয়ে ধারালো কোনো অস্ত্রের ক্ষতের মতো যন্ত্রণা ছড়াতে লাগল। শিশির কে, সঠিক ক'রে সে কি চেয়েছিল, না জেনে বেঁচে থাকা কত বিপজ্জনক ক্রমেই সে কথা নিখিল উপলব্ধি করতে পারছিল।"

'আবরণ' গল্পে নয়নের অর্থহীন মৃত্যু, স্ত্রী মণিমালার জীবনের স্থায়িত্ব আর নিরাপত্তার প্রশ্নে ফুটে উঠেছে কোনও কিছুরই সমাধান না করে নয়নের চলে যাবার অন্তর্নিহিত করুণা। বন্ধু যতীন এই মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করছে, এমনই সময়ে তার অফিসের সহকর্মী তরুণ ও ভবিষ্যৎ হিসাবি শ্যাম এক বন্ধুকে খুঁজতে নীচে নেমে হারিয়ে যায় — অভীক নামের সেই ছেলেটিকে পুলিশ খুঁজছিল। এই বিচ্ছিন্নপ্রায় দৃশ্যটুকুকে খুবই অন্যমনস্ক ভাবে সমীরণ কাহিনীর মধ্যে রেখেছেন। অন্য কারও মতো এই অংশটুকুর উপস্থাপন বা নির্মাণের উপযোগিতা বিচারে বসেননি। শেষে মণিমালার কাছ থেকে নয়নের খালিবাড়ি বিক্রির কথা আলোচনা করে যতীন ফিরে আসছে। নয়ন কিছুই রেখে যায়নি, কিছুই করে যায়নি — এই অনুযোগ মণিমালার কথার ভঙ্গিতে স্পষ্ট।

"সিঁড়িতে আলো, ঘরের আলোর নির্মম প্রতিফলন মণিমালার শরীর ঘিরে পাহারার মতন দাঁড়িয়ে আছে। তবু একবার ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাতে যতীনের মনে হ'ল এক ফোঁটা আলো এতদিনেও যেন ভেতর থেকে স্পর্শ করতে পারেনি।"

আসলে, সমীরণের বক্তব্যের শিকড় ছিল শেষ পরিচ্ছেদেই। চল্লিশ বছরের নয়নের প্রাপ্তির ঘরে এইটুকুই — আলোক-বঞ্চিত তার ভালবাসার জনেরা, হঠাৎ-মৃত্যু না এলে যাদের অন্ধকার মুখ দেখা যেত না। সমীরণ তাঁর পাঠকদের বয়ঃপ্রাপ্ত ও অনুভূতিশীল বলে বিশ্বাস করেন। আমাদের কাছে তা এক বিস্ময়কর উপহার। রাশি রাশি স্বকৃত মন্তব্য ও ডিটেলের ভারে ক্লান্ত পাঠকের পক্ষে এও এক বিশ্রাম।

আমার মতে, সৎ সাহিত্যের তিনটি নিশ্চিত চিহ্ন বা লক্ষণ থাকবে :

১. লেখকের অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত হবে আখ্যানে

২. পাঠক উন্নীত বোধ করবে পাঠের পর

৩. মানুষ, সময়, ইতিহাসে, মানুষের বাঁচার সংগ্রামের মধ্যে শিকড় থাকবে সাহিত্যের।

সমীরণের লেখাগুলি এই তিনটি মাত্রারই অস্তিত্বে সমৃদ্ধ।

'তেতর খত্বের জীবন' গল্পটির কথা এই প্রসঙ্গে বলি। গল্পটির কথা এইজন্য বলা দরকার যে কোনও ত্রিহুতি বা অন্য অঞ্চলের হরিজনকে নিয়ে লেখা গল্প বাঙালি সাহিত্যিকের কলমে খুব সুলভ নয়। জমিদার চৌধুরীর লোভে জমি-হারানো হরিজনদের একজন তেতর খত্বে। সে আবার জন্মসূত্রে চৌধুরীর জার। নিজের পল্লীতে তার সম্মান নেই, কারণ সে চৌধুরীর আশ্রয়ভুক্। এ গল্প তার প্রতিশোধের, পলায়নের ও মুক্তির।

এই অসামান্য থিমটি যদি মহাশ্বেতা দেবীর হাতে পড়ত, আমরা একটি ধারালো তালপাতার খাঁড়া হাতে পেতাম, যা হাতে নিলে রক্তপাত হয়। সমীরণ দাশগুপ্তর গল্প পড়ে পাঠকের মনে যে কোনও দ্রোহ, ক্রোধ বা প্রতিবাদস্পৃহা তৈরি হয় না তার কারণ লেখকের দার্শনিকদৃষ্টি জ্যোৎস্নার মতন এর অবয়বের কোণ ও ভঙ্গুর তির্যকতাগুলিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। তার ফলে তেতরের জীবনদৃষ্টি ও 'ঘোড়সওয়ারে'র কথকের দর্শন মিলে মিশে গেছে। বাস্তবের রক্তমাংসে চরিত্রগুলি নির্মিত হতে পারেনি। কারণ তেতর খত্বে বা ঘোড়সওয়ার অদৃশ্য লেখক ছাড়া আর কেউ নন। সমীরণ দাশগুপ্তের সার্থকতা বা ব্যর্থতা — দুয়েরই নির্দশন — 'তেতর খত্বের জীবন'।

সমীরণ দাশগুপ্ত বরং অনেক স্বাভাবিক এবং ক্ষুরধার — 'ভাত' গল্পে : শরৎ তার স্ত্রী আর শ্যালিকার সঙ্গে বনভোজনে গেছে, ইঁটভাটির মাটি কাটা পুকুর, তার মালিকের ছেলে ও দাদাশ্বশুর অবনীমোহন — পুকুরে স্নান, খাওয়া, কাকের দল, তারপর ভাঁটির কাজ থেকে ছাঁটাই একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে অবনীমোহনের গাছের পিছনে চলে যাওয়া। ইতিহাস প্রবক্তা অবনীমোহন; খিদে, তৃষ্ণা দুটোই যাঁর সবার চেয়ে বেশি, তাঁর ক্লান্তি নেই এবং তিনি বলেন 'বি সিওর আই অ্যাম নট অ্যান এসকেপিস্ট।' কনট্রাক্টরি করে লাখ টাকা উপার্জন করেছেন, তাঁর আছে, খাচ্ছেন পরছেন, এটা অপরাধ হবে কেন? তিনি লড়ে নিতে দিতে রাজি, কিন্তু আদর্শের জন্য ধনের সমবন্টনকে সমর্থন করেন না। তেতাল্লিশেও মানুষ পথে পড়ে মরেছে অথচ খাবার জন্য লড়াই করেনি। যারা লড়াই করতে অক্ষম, তাদের ভাত ছড়িয়ে ডাক দেওয়া অবনীমোহনের কাছে কোনও দুর্নীতি নয়। উচ্ছিষ্ট ভাত মাংসের ঘ্রাণে ক্রীত মেয়েটির চলে যাওয়া দেখতে দেখতে ইতিহাসের শিক্ষককে ইতিহাস প্রবক্তা বলেন — 'যতদিন ভাত দিয়ে মানুষ কেনা যাবে, ততদিন বোধহয় আমরা সবাই নিরাপদ। কি বল শরৎবাবু?'

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের লেখালিখির সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের। কলকাতার বাইরে থেকেও নানা পত্রপত্রিকায় নীলাঞ্জনের উপস্থিতি চোখে পড়েছে, এ ছাড়া তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মিশ্ররাগ'ও পড়েছি। নীলাঞ্জন নিজে যদিও বলেছেন, তাঁর লেখালিখি অনিয়মিত এবং এলোমেলো, শৃংখলাবদ্ধভাবে, পরিকল্পনা মাফিক কিছুই এগোয় না। একটু দূরত্বে আছি বলেই হয়ত নীলাঞ্জনের সৃজনপ্রয়াসের মধ্যে যে আত্মনিবেদন আছে, একনিষ্ঠতা আছে তার প্রবহমানতা আমার চোখে স্পষ্ট। নীলাঞ্জন লিখতেই এসেছেন।

যা হওয়ার কথা ছিল গল্পগ্রন্থের মুখবন্ধ, "আমার সামান্য কিছু কথা" সেই অংশটি কেন যে শেষে নিক্ষিপ্ত হল, তা বোঝা যায় না। 'গন্ধ' গল্পগ্রন্থটির পাঠ শুরু করার আগে পাঠককে এই শেষের অংশটি পড়ে দেখতে বলি। এই ছোট্ট লেখাটির মধ্যে লেখক নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রেখে গেছেন। তাঁর নিজের সম্বন্ধে যা তিনি বলেননি, তার খোঁজে গল্পগুলির কাছে যেতে হবে।

সত্তর, আশির একেবারে সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গে নীলাঞ্জনের বাস। এই সময়ের মানুষের অস্তিত্বের লড়াই, ব্যর্থতা, ফিরে যাওয়া — এগুলি তাঁর লেখার উপজীব্য বিষয়। সমীরণ দাশগুপ্তর মতন কাহিনীকে সংকেতে পরিণত করেননি নীলাঞ্জন। তাঁর কাহিনীতে ঘটনা, চরিত্র, তাদের বিন্যাস ও সম্পর্ক খুবই জরুরি। নীলাঞ্জন একজন রক্তমাংসের মানুষ, যিনি নিজের কোনও অনুভূতিকেই মুখোশ পরাতে চান না, তিনি জানেন, লুকোবার বা গোপন করার মতন তাঁর কিছু নেই। লেখক হিসাবে কোনও স্বতন্ত্র ভঙ্গি, শৈলী বা স্ট্র্যাটেজি আয়ত্ত করতে তিনি ভালবাসেন না। যতটুকু যেমন দেখেছেন, তেমন করেই বলেন। অথচ তাঁর বর্ণিত ঘটনা, সময় ও মানুষকে নির্মাণ করে এক দুর্বার প্রাণশক্তি, যে পারিপার্শ্বিক থেকে ক্রমাগত আঘাত পায়, অথচ ছাইগাদার ফুলগাছের মতো প্রতিদিন বেড়ে ওঠে আলোর আকাঙ্ক্ষায়।

এই গ্রন্থের নামগল্পটি (গন্ধ) আমি 'দেশ' পত্রিকায় পড়ি। গল্পটি যে অগ্রজ লেখক বিমল করকে কতখানি স্পর্শ করেছিল, তা লেখক নিজেই বলেছেন। আমার মতন অনেক পাঠক এই গল্পটির তীব্র অভিঘাত বহু বছর মনে রেখে দিয়েছেন। গল্পটি ছোট করে বলছি। মধ্যবিত্তের আবাসনের মধ্যে দুঃসহ দুর্গন্ধ। পাগল কুকুরের শরীরের ঘায়ের। অথচ কুকুরটাকে ধরা যাচ্ছে না। জিতেন চারপাশের দু'নম্বরি করা মানুষদের একজন। বিরাট তার ক্রয়ক্ষমতা। বউয়ের পুজোর নেশা দাম্পত্য সম্পর্কে

শীতল দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। বউকে ঘৃণা করে জিতেন, সমান্তরাল সম্পর্ক নিয়ে বাসন্তীর সঙ্গে সে ভালই আছে। অফিসে কী করে বস্‌কে সন্তুষ্ট রাখতে হয় সে জানে। জানে উপার্জনের নানা পন্থা। শেষে সন্ধের অন্ধকারে প্রতিবেশীদের নিয়ে পাগল কুকুরটাকে খুঁজতে গিয়ে জিতেন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে খুঁজতে এক সময় সে বুঝতে পারল গন্ধটাকে নিজের অস্তিত্ব থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না। অসাধারণ গল্প। সহজ, ক্রূর এবং অব্যর্থ।

'দু'নম্বর আসামী' গল্পেও নীলাঞ্জন একই রকম সাবলীল ও নিশানায় সফল। পার্টির নির্দেশে আসল আসামির বদলি আসামি খুঁজতে হবে। পার্টির ইমেজের প্রশ্ন। নিরীহ সুবল ধর্ষণের আসামি সাজার নির্দেশ শেষ পর্যন্ত মানতে পারে না, আত্মহত্যা করে। দু'নম্বর আসামিদের নিয়ে এমন গল্প আমি এই প্রথম পড়লাম, যদিও আমাদের আইনব্যবস্থায় এই ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। যাঁরা এই সব বৃত্তান্ত কাছ থেকে দেখেন, তাঁদের অনেকেরই সংবেদনশীলতা এমন পর্যায়ে থাকে না যে সুবলদের গল্প মানুষের কাছে পৌঁছবে।

'ভকু মণ্ডল পড়তে যায়' গল্পটিও বর্তমান সময়ের। সর্বজনীন শিক্ষার জন্য সরকারি প্রয়াসের উদ্দেশে একটি মৃদু ব্যঙ্গ। খাবারের 'বাস্ক' হাতে পেয়েই শিশুশ্রমিক ভকু দৌড় দেয় দোকানের দিকে। একদিকে বাপের ভয়, অন্যদিকে খাবারের লোভ। ভকুকে শেষ পর্যন্ত জঙ্গলে পালাবার কথা ভাবতে হয়। সর্বজনীন শিক্ষার জনসংগঠনের কী হবে?

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসের সদস্য নীলাঞ্জন শাসনপ্রণালীর নানা দিক খুব কাছ থেকে দেখেছেন। দেখেছেন, উন্নয়নের নামে বঞ্চিত সাধারণ মানুষকে। তাদের মধ্যে অনেকে সরকারি ক্ষমতার একটু কাছে থাকায় পারিপার্শ্বিকে জন্ম দেয় নানা ইচ্ছাপূরণের প্রত্যাশার। (দুলালের দেবদর্শন, বড়সাহেবের লোক) অথচ তারা নিজেদের অক্ষমতার মোকাবিলাই করে উঠতে পারে না। ব্যর্থতার, সামাজিক সম্মানহানির ভয় তাদের নীরক্ত করে রাখে। মেইনস্ট্রিমের দু'পাশে নিক্ষিপ্ত এই সব মানুষ নীলাঞ্জনের আপনজন। কবি, প্রাবন্ধিক, বিশ্বসাহিত্যের সচেতন পাঠক নীলাঞ্জনের মেধা তাঁর সহমর্মিতাকে কোথাও অস্পষ্ট বা আচ্ছন্ন করেনি। লেখক হিসাবে আমাদের তিনি উপহার দিয়েছেন একটি সজীব মানবহৃদয়ের অকপট আত্মউন্মোচন। কোনও তরুণ ফৌজির মুখ মনে আসে নীলাঞ্জনের লেখা পড়লে। দেশ যেন তাকে লড়তে পাঠিয়েছে ফ্রন্টে, সামান্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। সে ফিরবে না, তাকে লড়তে হবেই, অথচ শত্রুর পরিচয় বিষয়ে ফৌজির সম্বল অপর্যাপ্ত বিবরণমালা। তার রাগ, ক্ষোভ, কষ্টের স্টিল ছবি দিয়ে তৈরি হচ্ছে যুদ্ধপরিস্থিতির বিশ্লেষণ।

নীলাঞ্জনের চরিত্ররা সাদা বা কালোয় আঁকা নয়, তারা মধ্যবর্তী বর্ণের, সাধারণ মানুষ। 'আশ্রয়ে'র মনোজ যেমন স্ত্রী বনশ্রীর আচরণে বার বার আহত হয়েও তার কাছে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবে, আশ্রয়ের জন্য। 'ভার'-এর শুভেন্দু কালো টাকায় হাত মলিন করে পরিবারের জন্য ফ্ল্যাট কেনে, একই সময়ে সৎ ও বিবেকবান তার ভগ্নিপতি নিহত হয়, আপস না করার অপরাধে। নিজের পরাজয়ের যন্ত্রণা শুভেন্দুকে তার চরম সাফল্যের মুহূর্তেও ছেড়ে যায় না।

তবে, সাদা-কালোয় মেশানো মানুষ নির্মাণের মধ্যে প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি ঘটছে কি না, নীলাঞ্জনকে সেই দিকটিও ভেবে দেখতে হবে।

নীলাঞ্জনের লেখায়, আগেই বলেছি, গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের পশ্চিমবঙ্গের ছবি এসেছে। গ্রামবাংলার, মফস্বলের, কখনও শহরের। এই দীর্ঘ সময়ে গ্রামবাংলায় নানা আর্থ সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে, তারই মধ্যে দিয়ে উত্থান হয়েছে স্বতন্ত্র একদল ক্ষমতাব্যবসায়ীর। অপারেশন বর্গা, সাক্ষরতা অভিযান এসেছে। শহরের ব্যবসা, শিল্পকেন্দ্র ছেড়ে পুঁজি অন্যত্র গেছে, ভারতের অন্যান্য প্রান্তে। বেকারত্ব বেড়েছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবনমন ঘটেছে। দীর্ঘকাল ক্ষমতায় অবস্থিত সরকারকে এই সব সাফল্য ব্যর্থতা দুয়েরই দায় ও কৃতিত্ব নিতে হবে। আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে দীর্ঘকাল কাটিয়েছি, তারা সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতিতে ক্ষমতার প্রভূত কেন্দ্রীভবন দেখেছি, গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের পরাজয় সেখানে নতুন কোনও কথা নয়। স্বর্গভূমি না হলেও, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাবণ্টন-জনসংগঠন নীতির কিছু দৃষ্টান্তের দিকে আমরা আজও আশালিপ্ত চোখে তাকিয়ে থাকি। সাক্ষরতা অভিযানের ইতিহাসে ভকু মণ্ডলের গল্প যেমন আছে, তেমন আছে নবসাক্ষর ও স্বেচ্ছাসেবীদের সাফল্যের কাহিনীও। জেলাশাসক মানেই শ্বশুরকুলরঞ্জক মেরুদণ্ডহীন নয়। এখনও কিছু পথ খোলা আছে মেরুদণ্ডবান সৎ মানুষদের জন্য। তাদের জন্য আত্মহনন সর্বত্র অনিবার্য নয়। একজন ভারতীয় কথাকার হিসাবে নীলাঞ্জনকে তাঁর দেশ ও সময়ের কিছু উজ্জ্বল ছবিও তুলে ধরতে হবে। না, এ আমার সরকারি তথ্যচিত্র পরিচালকদের কাছে পেশ করা দাবি নয়। নীলাঞ্জনের মতন লেখককে পাঠক বিশ্বাস করে। কারণ তিনি জীবনকে কাছ থেকে গাঢ় অভিনিবেশে দেখেছেন। কিন্তু কঠিন সময়ে বাঁচার মন্ত্র, জেতার মন্ত্রও আমরা তাঁর কাছ থেকে চাই। আশা করি, এই তরুণ ফৌজি আমাদের নিরাশ করবেন না।

অমিয়র স্বদেশ — সমীরণ দাশগুপ্ত / স্বকাল প্রকাশন, / ৪০.০০

গন্ধ — নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় / অন্তরঙ্গ প্রকাশন, কলকাতা-৬৮/ ৫০.০০

দু'টি অনবদ্য সংকলন

মেঘ মুখোপাধ্যায়

জনসাধারণের মধ্যে যিনি 'আরামবাগ হ্যাচারি'-র প্রতিষ্ঠাতা তথা মালিক হিসাবে বহুল পরিচিত কিন্তু আসলে যাঁর কর্মপরিধি বি.কে. রায় গ্রুপ অব কোম্পানিজ-এর নামে বহুধা বিস্তৃত সেই প্রয়াত (৩০ জুলাই '৯১) বাঙালি শিল্পপতি বলাই কৃষ্ণ রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ প্রকাশ করেছেন 'বনস্পতি' নামের একটি স্মরণিকা-সংকলন। বলাই কৃষ্ণ রায় সাধারণ বাঙালি সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত বড় ব্যবসায়ী তথা নামী বাঙালি শিল্পপতি হিসাবে বিখ্যাত হলেও তাঁর জীবনসাধনা আর কর্মপরিধি শুধু ব্যবসায় বা শিল্প-পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না — সমাজ ও দেশের নানা মঙ্গলকর্মে তাঁর নেপথ্য-অবদান ছিল প্রচুর। তিনি ছিলেন এক সৃজনশীল শিল্পোদ্যোগী। গান্ধী-আদর্শে অনুপ্রাণিত বলাইবাবুর মূল লক্ষ্য ছিল গ্রাম-ভিত্তিক শিল্পের প্রসার। বাংলার গ্রামের দরিদ্র-অশিক্ষিত কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষদের নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য, তাদের নিয়মিত আর স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থার জন্য তিনি কয়েকটি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছেন এবং সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর শিল্প বা ব্যবসায় পরিকল্পনাগুলি সেকালে ছিল অভিনব।

ব্যবসায় তথা শিল্পোদ্যোগে অনাগ্রহী ও পশ্চাৎপদ বাঙালি জাতির মধ্যে শ্রম-নিষ্ঠা-অধ্যবসায়-স্বপ্ন-কল্পনায় তিনি যে বৃহৎ শিল্পরাজ্য রচনা করে গিয়েছেন সে-জন্য বলাই কৃষ্ণ রায়ের জীবনকথা আমাদের জানা দরকার। সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের জীবনকাহিনী জানার মতোই একজন সফল শিল্পোদ্যোগীর জীবনকথা জানার কৌতূহল থাকা কাম্য। অতি সাধারণ অবস্থা থেকে নামজাদা শিল্পপতি হয়ে ওঠার পিছনে তাঁর যে সংগ্রামী জীবনপর্ব তার বিবরণ শুনিয়েছেন তাঁর অনুজ গোপাল কৃষ্ণ রায়, সমীরণ মজুমদার, শ্যামাপ্রসাদ সরকার, শ্যামলেন্দু দে প্রমুখ। এই সংকলনের সবচেয়ে মনোগ্রাহী লেখাটি লিখেছেন গোপাল কৃষ্ণ রায়। এক অনুজ তাঁর গভীর ভালবাসা, শ্রদ্ধা দিয়ে তাঁর বিখ্যাত দাদার জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন কিন্তু ভালবাসা বা শ্রদ্ধার আবেগে তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়নি। দাদার জীবনের সাফল্যের কারণগুলি তিনি গভীর অভিনিবেশে আর যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করেছেন। ছেলেবেলা থেকে কাছ থেকে দেখেছেন বলে আর কারও পক্ষে বুঝি একমাত্র ভাই ছাড়া এমন অন্তরঙ্গভাবে মানুষটিকে বোঝা সম্ভব নয়।

তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য জেনে আমার বেশ ভাল লেগেছে। স্বাধীনোত্তর দেশে তিনি প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষের মতো প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা তাঁকে রাজনীতিতে আনতে চাইলেও তিনি কখনও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি — এতে তাঁর আগ্রহ ছিল না। একাগ্র নিষ্ঠায় একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় সম্পূর্ণ উদ্যম নিয়োজিত করেছিলেন। কোনও মতেই বিভ্রান্ত বা রাজনৈতিক ক্ষমতা উপভোগে প্রলুব্ধ হননি। শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাকেই স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশগঠনে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা বলে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন।

কয়েকজন উল্লেখ করেছেন যে তিনি বই পড়তে ভালবাসতেন। কর্মজীবনের শতব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নিয়মিত সাহিত্যপাঠের জন্য সময় বের করে নিতেন। নতুন বেরনো বইপত্রের খবর রাখতেন এবং কিনতেন। এই রুচি থেকেই একজন মহৎহৃদয় মানুষকে বোঝা যায়। সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের কাছে তিনি ছিলেন একান্নবর্তী পরিবারের পিতার মতো — তাঁরা তাঁকে আদর করে, আপন করে বলতেন 'বড়বাবু'। এত বড় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেও তিনি কখনও তাঁর সদয় ও সদাচারী মনটি হারিয়ে ফেলেননি — এ-যুগে এ-এক বিরল ও শিক্ষণীয় ঘটনা। এই সংকলনটি পড়ে মনে হল এর 'বনস্পতি' নামকরণ যথার্থ হয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে বলাই কৃষ্ণ রায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখিয়ে প্রকাশ করা উচিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১–৪ সংখ্যা ১০৩ বর্ষ হাতে নিয়ে রোমাঞ্চ হয়। প্রচ্ছদে মুদ্রিত ১০৩ বর্ষ-এর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় সংকল্পবদ্ধ একটি পত্রিকা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও ১০৩ বছর যাবৎ প্রকাশিত হয়ে চলেছে — এ এক গৌরবময় ঘটনা। সত্যজিৎ চৌধুরীর সম্পাদনায় আলোচ্য সংখ্যাটি মূলত জন্মশতবর্ষ পূর্ণকারী তিনজন মহৎ সাহিত্যিক-সঙ্গীতবেত্তার জীবন ও কীর্তির আলোচনায় নিবেদিত হয়েছে। পত্রিকার নিবেদনে সম্পাদক জানিয়েছেন — "উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে জন্মেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের এমন বেশ কয়েকজন মনস্বী কবি সাহিত্যিকের শততম জয়ন্তী বিংশ শতাব্দীর এই উপান্ত দশকে আমরা পেরিয়ে যাচ্ছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে এঁদের জীবন ও কীর্তি বিষয়ে স্মরণ-সমীক্ষণ পবিত্র কর্তব্য।.... শততম-জয়ন্তী-স্মরণ পর্যায়ে বর্তমান দশকে স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ এই সংখ্যায় সংকলিত হল।" এই প্রবন্ধ তিনটি লিখেছেন যথাক্রমে অনন্তকুমার চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং সুমিতা চক্রবর্তী। তিনটি প্রবন্ধই বিশদ, বিশ্লেষণমূলক আর যত্নসহকারে লিখিত। প্রত্যেকেই তাঁদের আলোচ্য সাহিত্যিক সম্বন্ধে নতুন কিছু তথ্য আর বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করেছেন।

উক্ত তিনটি প্রধান সন্দর্ভ ছাড়াও বাকি নিবন্ধগুলি সমান মনোযোগের দাবিদার। সুভদ্রকুমার সেনের 'বাংলা ভাষার বিলুপ্ত অধ্যায়: একটি অনুসন্ধান', জিনাত মাহরুখ বানুর 'ঢাকাই জামদানি' এবং শিপ্রা দস্তিদারের, 'বাংলাদেশের চর্যাপদ চর্চা' উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য অকাদেমি থেকে ১৯৬১-তে প্রকাশিত A Centenary Volume / Rabindranath Tagore — 1861 — 1961 তে সংকলিত ধূর্জটিপ্রসাদের Tagore's Music প্রবন্ধটির সরস অনুবাদ এই সংখ্যার সম্পদ। এর বাংলা অনুবাদ আগে কোথাও সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি।

যে গুরুত্ব দিয়ে এই সংখ্যাটির পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতে নিয়মিতভাবে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পড়ার জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে থাকব — পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির কাছে এই আমাদের আন্তরিক অনুরোধ। □

বনস্পতি — বি. কে. রায় গ্রুপ অব কোম্পানিজের কর্মীবৃন্দ, কলকাতা-২০ **সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা** (১–৪ সংখ্যা ১০৩ বর্ষ) — **সম্পা: সত্যজিৎ চৌধুরী** / বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৬ / ৪০.০০

স্বর্গ থেকে ঘরের দুয়ারে

নগাধিরাজ হিমালয়কে ভারতের ঋষি-কবিরা বলেছেন দেবতাত্মা। হিমালয় হল হর-পার্বতীর লীলাস্থল। হিমালয়ের দুর্গম কোলে অবস্থিত দেবস্থানগুলির প্রতি ভারতীয়দের দুর্মর আকর্ষণ অতি প্রাচীন। হিমালয় ধারণ করে আছে কত না তীর্থ আর সেই তীর্থক্ষেত্রগুলিতে পৌঁছনোর পথ যেমন ভয়ংকর তেমনই সুন্দর। অনাদিকাল থেকে ভয়ংকর আর সুন্দরের মেলবন্ধনেই হিমালয়ে তীর্থযাত্রার আকর্ষণ তীব্র হয়ে উঠেছে। নয়নাভিরাম হিমালয়ের দুর্গম উপত্যকায় কিংবা দুরধিগম্য চূড়ায় মানুষ আবিষ্কার করেছিল দেবতাদের নিবাস। দেবতাদের স্পর্শ পেতে মর্ত্যভূমি থেকে সাধুসন্তরা যুগ যুগ ধরে গিয়েছেন হিমালয়ের অজানা-অচেনা প্রান্তে। পথহীন দুর্গম পর্বতগাত্রে পথের রেখা তৈরি করে গিয়েছিলেন কোনও একদল যাত্রী — সেই ক্ষীণ পথচিহ্ন অনুসরণ করে এসেছেন নতুন নতুন পুণ্যার্থীর দল। আধুনিক যুগে আর হিমালয়ে যাওয়াকে তীর্থযাত্রা বলে না, বলে হিমালয়-ভ্রমণ। কয়েক দিনের জন্য বেড়িয়ে আসা, দেবতার সাক্ষাৎ পেতে, দেবতার স্পর্শ লাভে ধন্য হতে নয় — ভয়ঙ্কর-সুন্দর দৃশ্য দর্শনে রোমাঞ্চিত হবার কামনায় অধিকাংশই এখন হিমালয়ে যান। সেদিক থেকে সুমিত্রা দত্তর হিমালয় যাত্রাকে তীর্থযাত্রাই বলতে হয়। তিনি নিছক ভ্রমণে বেরোননি। প্রাচীন ভারতীয় মন নিয়ে তিনি হিমালয়ে গিয়েছিলেন দেবতার সান্নিধ্যে জীবনকে পবিত্র করে তুলতে — এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। হরিদ্বার-হৃষিকেশ সহ গাড়োয়াল হিমালয়ে অবস্থিত চারধাম ভ্রমণের রমণীয় বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন তাঁর 'স্বর্গ থেকে ফিরে'-তে। ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ মহিলার মন নিয়ে তিনি স্বামীসঙ্গে চারধামের তীর্থ পর্যটন করেছেন। কিন্তু পথের প্রান্তের তীর্থ শুধু নয় পথের দু'পাশের হিমালয়ের অপরূপ শোভা এবং বিপজ্জনক গিরিপথের শঙ্কা তাঁকে সমপরিমাণে রোমাঞ্চিত করেছে।

বাসের সহযাত্রী অবাঙালি পরিবারগুলির সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছায় আর ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের প্রয়াসে লেখিকার জীবনজিজ্ঞাসু মনের ছবিটি ধরা পড়েছে। এ রকম তীর্থপথে আগেকার দিনে যাকে বলা হত চলনদার, এখন বলে গাইড — গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের গাইড তরুণ মহাদেবের কথা এই ভ্রমণকাহিনীর অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রতি মহাদেবের সদাসজাগ দৃষ্টি। সরকারি কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও সে তার কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে যে নিষ্ঠা ও দরদের পরিচয় দিয়েছে তা মনে দাগ কাটে। যমুনোত্রীতে লেখিকা ঘোড়াওয়ালাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে তাঁদের জন্য যমুনোত্রীতে পূর্বনির্দিষ্ট লজে আশ্রয় না নিয়ে কয়েক কি.মি নেমে অন্যত্র এসে হাজির হয়ে নিজ দোষে বিপত্তি ঘটান। একে বিধ্বস্ত অসুস্থ শরীর তায় প্রবল ঠান্ডা এমতাবস্থায় সেখানে তাঁদের রাত্রিবাসের কোনও বন্দোবস্ত হওয়া ছিল অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল মহাদেব। তাঁদের রাত্রিবাসের, আহারের আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করল পরম মমতায়। সাধারণ সরকারি কর্মচারীর কাছ থেকে যা ছিল অপ্রত্যাশিত সেই মহৎ দায়িত্বজ্ঞানের আর মানবিকতার দৃষ্টান্ত সে স্থাপন করেছে। পরে লেখিকা জানতে পারেন বন্দোবস্তের জন্য মহাদেবকে নিজের রাহা খরচ থেকে কয়েকশো টাকা দিতে হয়েছিল কিন্তু তা সে ঘূণাক্ষরে জানতে দেয়নি। এই টাকা তার গা.ম.বি. নিগম থেকে ফেরত পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা সে এখনও ফেরত পেয়েছে কি না আনন্দময় তীর্থযাত্রা শেষে বাড়ি ফিরেও সেই সংশয় লেখিকার মনে কাঁটার মতো বিঁধেছে।

তিনি তাঁর ভ্রমণ বিবরণের নানা স্থানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি গেঁথে দিয়ে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছেন। রণেন আয়ন দত্তর আঁকা প্রচ্ছদ এ-বইটির সম্পদ। নীলের পটে শীর্ষদেশে আবছা সাদার পোচে পর্বতশৃঙ্গের আভাস। পর্বতের এক বাঙ্ময় আধুনিক চিত্র — প্রচ্ছদটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে মন-কেমন করা অনুভূতি জন্মায়।

শতরকম প্রস্তুতি নিয়ে, হাজার মাইল পেরিয়ে দূরের ও

দুর্গমের নামকরা তীর্থে নয়, অজয়কুমার নন্দী নিজে বেড়িয়ে এসে আমাদের জন্য লিখেছেন ঘরের অদূরের বেড়ানোর জায়গাগুলির কথা। সপ্তাহান্তে হঠাৎ করে বেড়িয়ে আসা যায় পশ্চিমবাংলার এই সমস্ত জায়গাগুলিতে। আমরা সবাই এই জায়গাগুলির নাম শুনি কিন্তু যাওয়া হয় না — হয়ত খুব কাছে বলেই তেমন টান বোধ করি না। কাছের জিনিসের গুণ বোঝা আর কদর করা সত্যিই কঠিন। পশ্চিমবাংলার প্রত্যেক জেলাতেই ছড়িয়ে রয়েছে কোনও না কোনও দেখার মতো জায়গা — ঐতিহাসিক মন্দির, মাজার, নৈসর্গিক শোভার জন্য কিংবা বিখ্যাতজনের জন্ম বা কর্মসাধনার স্থান বলে সেই জায়গা গুরুত্ব অর্জন করেছে — যেমন ব্যান্ডেল, সামতাবেড়ে, মুকুটমণিপুর, চুরুলিয়া, পলাশি, হাড়োয়া, ঘুটিয়ারি শরিফ, পাথরা, রাজবলহাট ইত্যাদি। অজয়বাবুর কয়েকটি লেখা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলে দায়সারা গোছের মনে হয়েছে। পৌঁছনোর আর থাকবার জায়গার বিবরণমাত্র দিয়েছেন। নিজের বেড়ানোর অনুভূতির কথা তেমন করে জানাননি। তা হলেও ভ্রমণপিপাসুদের কাছে বইটি গুরুত্ব পাবার যোগ্য। □

স্বর্গ থেকে ফিরে — সুমিত্রা দত্ত / বিবলিয়া, কলকাতা-৫৯ / ৩০.০০

ভ্রমণের দর্পণে — অজয়কুমার নন্দী / ক্রান্তিক প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩ / ২৫.০০

মানুষের খোঁজে

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

'মানুষ খুঁজে বেড়াই'-র লেখক দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পেশায় লেখক নন। একটা নেশায় বা মনের তাড়নায় লেখক হয়েছেন। সুতরাং তাঁর একটু পরিচয় প্রয়োজন। দেবব্রতবাবু একজন আই পি এস অফিসার। বন্ধু ও অবন্ধুজনের কাছেও তিনি স্বল্পভাষী, এক ঋজু ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বইটিতে তিনি যা লিখেছেন তার সবটাই তাঁর কর্মজীবনের বহু বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার অঙ্গ। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতাগুলিকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন। এক একটি ভাগের এক এক নামকরণ। ঘটনাগুলি এবং তার বিন্যাস ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কারণ তিনি ব্যক্তির মধ্যেই 'মানুষ' খুঁজতে বেরিয়েছেন। 'মানুষ' খোঁজার এই অভিযানে তাঁর সবচেয়ে ভাল রচনাটি হল 'রূপের আড়ালে'। এর কেন্দ্রবিন্দু হলেন 'গুপ্ত সাহেব'। এ কাহিনীর পটভূমিকা ছিল ১৯৬৮ সালের জলপাইগুড়ির বন্যা, যেটা শতাব্দীর মহাপ্রলয় হিসাবে চিহ্নিত। সরকারি অফিসারদের দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা 'রূপের আড়ালে' খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং এ দায়বদ্ধতা মাস-মাইনে দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। এই দায়বদ্ধতা হল অনুভূতির, মনুষ্যত্বের ও অভিজ্ঞতারও বটে। দেবব্রতবাবু যে 'গুপ্ত সাহেবের' কথা বলেছেন, তাঁর পরিচয় তিনি অসম্পূর্ণ রেখেছেন। কিন্তু যাঁরা ওই মহাপ্রলয়ের কথা বলেন, তাঁরা এটাও জানেন যে, উল্লিখিত 'গুপ্ত সাহেব' হলেন রঞ্জিত গুপ্ত আই পি, অর্থাৎ ইংরেজ আমলের 'ইন্ডিয়ান পুলিশ'। দক্ষতায়, বাচনভঙ্গিতে, লেখনীতে এবং গবেষণামূলক কাজে তিনি তাঁর আমলের এক অবিস্মরণীয় প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব। ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে বন্যাবিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি শহরের দৃশ্য বর্ণনা এবং 'গুপ্ত সাহেবের' ভূমিকার উল্লেখ করে লেখক বলেছেন, "সগর রাজার ৬০ হাজার ছেলেকে ভস্ম থেকে জীবনে ফিরিয়ে এনেছিলেন ভগীরথ, সেও অনেক তপস্যার পর। গুপ্তসাহেব 'মরা শহর' জলপাইগুড়িকে বাঁচিয়ে তুললেন এক আঘাতে যা ছিল আমাদের কাছে অকল্পনীয়।"(৬১ পৃ:) এই অভিমত যথার্থ।

আমাদের দেশে বিশেষ করে বাঙালিসমাজে সরকারি অফিসারদের সম্পর্কে একটা প্রচার, অপপ্রচার বলাই সঙ্গত, হয়ে থাকে যে অফিসাররা মাইনে নিয়েই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন। কিন্তু সেটা যে অনেকাংশে অপপ্রচার তা দেবব্রতবাবু তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। অফিসারদেরও যে একটা সামাজিক দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা আছে তা লেখক 'বড় আমিন বাবু' ও 'হাজি বনাম কাজি'র ঘটনাবিন্যাসে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'তোমার বিচার তুমি করো প্রভু' এই এপিসোডে মালদায় তাঁর কর্ম-জীবনের এমন অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন যেখানে একজন হোমগার্ড গ্রামের ব্যক্তিগত দলাদলির শামিল হয়ে মেরে ফেলে ধর্মভীরু 'নামাজি' মুসলমানকে, সজ্জন বলে মৃত আসলামকে সবাই চিনত। গ্রামের সালেহা বিবির সে 'দুলাভাই' ছিল (৪৮ পৃষ্ঠা)। সালেহার স্বামী ছমিরদ্দি তার ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে হোমগার্ড আফজলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। তার পরিণতিতে আসলামের খুন 'দু' কুড়ি দশটাকার' বিনিময়ে।

'মানুষ খুঁজে বেড়াই' এপিসোডে কর্মজীবনের প্রারম্ভেই এক প্রতারণার ঘটনা শুনিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন তাঁর দুই সহকর্মীকে — কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় ও তছুর মিয়াঁকে। এঁরা ট্রেজারি থেকে সরকারি অর্থ তছরুপের চক্রান্তের হাত থেকে লেখককে রক্ষা করেছিলেন।

ঘটনাগুলিতে লেখক দেবব্রতবাবুর মানসিকতা ও চরিত্রের স্ফুরণ ধরা পড়ে। তবু কিছুটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গিয়েছে ঘটনাগুলির পরিণতিতে। মনে হয় যেন আরও কিছু বলার ছিল। □

মানুষ খুঁজে বেড়াই — দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় / দীপ প্রকাশন / কলকাতা-৬ / ৫০.০০

গৌরীদি — আমার স্মৃতিতে

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

গৌরীদি চলে গেলেন, আমাদের অনেকেরই জীবন থেকে পাঁচ নম্বর পার্ল রোডের সেই বাড়িটার অস্তিত্বই হারিয়ে গেল চিরদিনের মতো। সত্যি যেন নিটোল মুক্তোর মতোই ছিল গৌরীদির শান্ত স্নিগ্ধ সঙ্গ। মানুষটাকেই যেন প্রকৃতি তিলে তিলে গড়ে তুলেছিল অমনই নিভৃতে, অমনই সযত্নে। জীবনের পথ চলতে চলতে এমন মানুষের সঙ্গে দেখা যে হয়েছিল সেই আমি বহু মানি।

সেইদিনই বোধহয় তাঁকে প্রথম দেখি, যেদিন আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান' পড়া হল সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ির সেই বড় ঘরটায়, যেখানে তখন কিছুকাল আগে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কাজ শুরু হয়েছে। নীলিমা সেন গান গেয়েছিলেন, স্বয়ং আইয়ুবসাহেব উপস্থিত ছিলেন, প্রবন্ধটি পড়েছিলেন গৌরীদি। তাঁর শান্ত মধুর কণ্ঠের পাঠ যেন এখনও মনে পড়ে। তখনও পা মুড়ে স্বচ্ছন্দে বসেছিলেন মঞ্চের উপর। পরে জেনেছিলাম অল্প বয়স থেকেই বাতব্যাধির আক্রমণে কষ্ট পেতেন তিনি। সেদিনও হয়ত কড়া মাত্রার ওষুধ খেয়ে এসেছিলেন, কি জানি!

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আসতেন কখনও কখনও। ক্রমশ চলবার শক্তি সীমিত হয়ে এল বলে কমে এল সেই আসা। তবু ১৯৮০ সালে রবীন্দ্রচর্চা ভবনের উদবোধন-দিনে আনন্দযাত্রায় তিনিও যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম দিকে ঈষৎ সম্ভ্রমে দেখতাম তাঁকে দূর থেকে, ক্রমে কবে যে আড়াল ভেঙে গেল জানতে পারিনি। সকলেই তাঁর যে প্রীতিমাখা সস্নেহ ব্যবহারের বশ হতেন আমি তার ব্যতিক্রম নই। বিনা গুণে একটুখানি অতিরিক্ত সহানুভূতি পাবার রাস্তা আপনা হতে খুলে গিয়েছিল — গৌরীদি শুনেছিলেন আমার কিঞ্চিৎ দুর্বল দৃষ্টিশক্তির কথা। এমন কখনও হয়নি যে দেখা হলে তিনি আমার চোখের কুশল জানতে চাননি বা তাঁর বাড়ি থেকে আসবার সময় সন্ধ্যা হয়ে গিয়ে থাকলে বাসে তুলে দেবার জন্য কাউকে সঙ্গে দেননি। প্রতিবাদে ফল হত না।

এ যেন 'কেবলি আমি লব'। 'দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি' বললেও ভুল হবে। কেননা বিনিময়ে আমি তো কিছুই দিইনি, তাঁর কোনও কাজে সাহায্য করবার যোগ্যতা বা সুযোগ ছিলও না। তবু পেয়েছি অনেক। লিখতে বসে অবশ্য সংকোচ বোধ করছি। মনে হচ্ছে কতটুকুই বা তাঁকে জানি, যেটুকু জানি তার বৃত্তটা নেহাতই ছোট, সে বৃত্তের সীমার মধ্যে থেকে তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া হয়নি।

এও জানি, তাঁর সবটাই শুধু স্নেহময়ী, সবার জন্য ভাবিত, সবার জন্য সাহায্যের হাত-বাড়ানো এক নারীর সত্তা নয়। বিদগ্ধসমাজে সর্বজনপরিচিত চিন্তাবিদ, বিদুষী, অধ্যাপিকা গৌরী আইয়ুব এক বিশিষ্ট নাম। মৈত্রেয়ী দেবী — মৈত্রেয়ীদি ছিলেন, ছিলেন এবং এখনও আছেন আরও অনেক মানুষ — তাঁরা একত্রে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত করতেন, তার শরিক হতেন। ষাট সত্তরের দশকে নানা ভাবনা, নানা আলোচনায় সক্রিয় অংশ নিতেন তাঁরা। সে-সব সংগঠিত ভাবনায় গৌরী আইয়ুব একটি অপরিহার্য নাম। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার লক্ষে তাঁদের কাজ। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের জন্য ত্রাণের কাজ চালাতে গিয়ে তাঁদের হাতে জন্ম নিয়েছিল 'খেলাঘর', অনাথ শিশুদের নব-আবাস।

কিন্তু এই তো সব নয়। গৌরী আইয়ুব আবু সয়ীদ আইয়ুবের সহধর্মিণী, পুষন আইয়ুবের জননী। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি স্পর্শ করাই চলে না, প্রথমটিও তা ছাড়া আর কি। তার ব্যঞ্জনাটুকু নীরবে অনুভব করবার চেষ্টা করা চলে, বিশ্লেষণ করতে গেলে সে তার মর্ম হারাবে। আমার পক্ষে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। শুধু মনে পড়ছে কোনও বইয়ের ভূমিকায় আইয়ুবের আপাত সামান্য ছোট্ট একটুখানি মন্তব্য — 'গৌরীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার অর্থ নেই, কারণ তার শেষ নেই।' আবু সয়ীদ আইয়ুবের ঘরে যখনই গেছি, দেখেছি তিনি ধবধবে পরিষ্কার বিছানায় যেন সদ্য পাটভাঙা জামা পরে শুয়ে আছেন, চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। দুটি কল্যাণময়ী হাতের ও সদাজাগ্রত দৃষ্টির স্পর্শ যেন ঘরের সর্বত্র মাখানো থাকত।

গৌরীদির মননঋদ্ধ রচনা পড়বার সুযোগ হয়েছে কখনও। সৃষ্টির তাগিদ ছিল ভিতরে, ছোট গল্পের বই আছে তাঁর। ইদানীং দেখেছি ফরমায়েসি লেখাই বেশি লিখতেন। কারণ অনেকেই এসে ধরতেন তাঁকে, অনেকেরই ভালবাসার দাবি এড়াতে পারতেন না। বিছানার উপর বইপত্রের সঙ্গে অর্ধসমাপ্ত বা সদ্য-আরম্ভকরা লেখা রাখা থাকত। অল্পবয়সীদের বার

করা ছোট পত্রিকা বা কোনও বড় আদর্শনির্ভর পত্রিকা তাঁর মনোযোগ টানত। বড় পত্রিকার দাবি তুচ্ছ হয়ে যেত তাঁর কাছে।

আইয়ুবসাহেব যাবার পরেও গৌরীদির ঘরে বোধহয় রোজ সন্ধ্যাতেই জ্ঞানীগুণী মানুষজনের বৈঠক বসত। তা ছাড়াও কাজে অকাজে সারাদিনই নানা মানুষ আসতেন। আসতেন সমস্যায় পরামর্শ করতে, সার্থকতার আনন্দটুকু প্রকাশ করতে, ব্যথাহত মনটিকে মেলে ধরতে।

আমি তাঁর কাছে বেশি গেছি সকালবেলার দিকেই। তখন দেখেছি কারও সঙ্গে গভীর বা গম্ভীর কোনও বিষয়ের আলোচনার মধ্যেই সংসারের খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয়ের প্রতিও তাঁর সমান অভিনিবেশ। কী আনতে হবে তার সতর্ক নির্দেশ সহ পুনদেওকে দোকানে পাঠাচ্ছেন, সে-ই হয়ত তাঁর কাছে এনে দেখাচ্ছে সেদিনের কোনও একটা রান্নার পদ যেমন চেয়েছিলেন তেমন হল কি না, পাড়া-প্রতিবেশীর ব্যাপারেও তাঁর করণীয় এটা-ওটা নিয়ে ভাবছেন। নানা কথার ভিড় ঠেলে আমার দুটো অভিজ্ঞতার কথা বলতে ইচ্ছা করছে। আমার এক আত্মীয়া অবসর সময়ে অনাথ ছেলেদের জন্য পশমের জামা বুনতে ভালবাসতেন। সারা বছরে তৈরি করা নানা মাপের কতকগুলি জামা প্রায় প্রতি বছর একটি আশ্রমে দেওয়া হলে তাঁদের ভাঁড়ারে জমা করে নেওয়া হত। এমনই চলছিল, তার মধ্যে একবার গৌরীদিকে বললাম খেলাঘরের জন্য এ রকম পশমের জামা বুনে দিতে পারেন কি না আমার দিদি। গৌরীদি বললেন, 'দাঁড়াও, যার যার সোয়েটার লাগবে তাদের মাপ এনে দেব।' ক'দিনের মধ্যে মাপের তালিকা এল—কয়েকজন ছেলেমেয়ের নামের পাশে পাশে কোন মাপের জামা হবে তার জন্য তা লেখা আছে। জামা বোনা হল। দিদির খুব ভাল লাগল না-দেখা সেই বিশেষ ছেলেটির বা মেয়েটির জন্য আলাদা নক্সায় রঙে বিশেষ জামাটি বুনতে। গৌরীদি বলেছিলেন প্রত্যেক জামায় যার জামা তার নামের একটা লেবেল যেন থাকে। যথাসময়ে জামাগুলি গেল যথাস্থানে। পরে গৌরীদি ফোনে বললেন তারা সকলে খুব খুশি হয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি অবাক হয়েছে জামায় তাদের নিজের নিজের নাম লেখা আছে দেখে। সকলেরই প্রশ্ন কে তার নাম লিখে তার জন্য জামা পাঠাল? সে কি করে তার নাম জানল? একথা শুনে আমার প্রৌঢ়া দিদিও প্রায় তাদেরই মতো খুশি হলেন। সেই দেখেছিলাম একটি সহৃদয় মনের মধ্যস্থতায় একই কাজ কেমন ভিন্ন মাত্রা পায়।

আর একবার আমার এক বন্ধু খেলাঘরের জন্য সামান্য কিছু টাকা দিয়েছিল। সে বলেছিল রসিদ চাই না, টাকাটা ওদের কোনও কাজে লাগলেই খুশি হব। গৌরীদিও টাকাটা কাছেই রাখলেন—তা থেকে ধীরে ধীরে দরকার বুঝে ছেলেমেয়েদের কারও কারও সখের জিনিস কেনা হল—এর খেলনা, ওর চুলের বাহারি ক্লিপ, আর কারও অন্য কিছু। টাকা ফুরোলে গৌরীদি আমার বন্ধুকে বিস্তারিত হিসাব লিখে পাঠালেন নিজের হাতে। লিখলেন তোমার দরকার নেই জানি, কিন্তু আমি হিসাবটা না লিখতে পারলে শান্তি পাব না।

'কেহ কারো মন বুঝে না'—গৌরীদি যেন সবারই মন বুঝতেন। সেই জন্য নানা বয়সের নানা ভাবনার মানুষ তাঁকে এমন আপন করে পেতেন। আমার বেশি মনে পড়ে মনার মা, আহমেদির মতো দু'-চার জন দেখা এবং অজস্র না-দেখা সমস্যাক্লিষ্ট মানুষকে, গৌরীদি যাদের কারও বা কাজের, কারও-বা চিকিৎসার, কারও-বা মেয়ের নিরাপদ আশ্রয়সন্ধানের অসাধ্যসাধন ব্রত নিয়েছিলেন। এদিকে আবার এর ইংরেজি ওর উর্দু বা হিন্দি পরীক্ষাপারের কাণ্ডারীও হতেন। দেখেছি কয়েকটি মুসলমান ছেলে আসত—আই. এ. এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে তিনি ইংরেজি পড়াতেন তাদের। যখন বেশ কয়েকটা লেখা হাতে রয়েছে, সময় পাচ্ছেন না, তখনও দেখেছি বছর দশ-এগারোর ছেলেকে পাঠদানের চেষ্টায় আছেন, যার বিশ্বের আর সব কিছুর প্রতি মনোযোগ এবং কৌতূহল থাকলেও, পড়ার প্রতি মন আছে এমন কথা পরম মিত্রও কবুল করতে পারত না। এমন পোষ্য বোধহয় কেউ না কেউ তাঁর কাছে থাকতই।

মনার বিয়েতে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। দেখেছিলাম তাঁর সেই বিবাহসভার আয়োজন, নিমন্ত্রিত আপ্যায়ন। কখনও আভাস পেয়েছি কোনও তরুণ বা তরুণীর জীবনসমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর মন, দেখেছি সর্বদাই তিনি উদ্যোগী হয়েছেন কোনও শিল্পীর আত্মপ্রকাশকে কিংবা কারও ভাব বা ভাবনার মৌলিক প্রকাশকে তাঁর ঘরে-ডাকা বন্ধু পরিচিতজনের সমাবেশে স্বীকৃতি জানাতে। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না তো গৌরীদির, পথের প্রান্তবর্তী কোনও তীর্থে পৌঁছবার তাগিদ ছিল না তো মনে।

আজ সবই অতীত। আজকের চরম এবং নির্মম সত্যটুকু হল 'ফুলটি ঝরে গেছে রে'। তার সুবাসটুকু শুধু আবেশ ছড়ায় মনে। একটি আকালমৃত্যু উপলক্ষে লেখা কবির কয়েকটি কথায় সান্ত্বনা খুঁজি: 'যাকে ভালোবেসেচ, যাকে সত্য বলে জেনেচ, সে মৃত্যুতেও সত্যই আছে, এই বিশ্বাস দৃঢ় রেখে শোক থেকে মনকে মুক্ত কর।' অজানার পথে পাড়ি দেওয়া সেই পথিক হৃদয়টিকে কি স্পর্শ করা যাবে না যদি সেই কবিরই শরণ নিই?

'জীবন হয় নি ফাঁকি ফলে ফুলে ছিল ঢাকি,
যদি কিছু রহে বাকি কে তাহা লবে।
দেওয়া-নেওয়া যাবে চুকে, বোঝা-খসে-যাওয়া বুকে
যাব চলে হাসিমুখে—যাব নীরবে।' □

চিঠিপত্র

গৌরী আইয়ুবের পিতৃপরিচয়—একটি শুদ্ধিপত্র

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০৫ সংখ্যায় প্রয়াতা অধ্যাপিকা গৌরী আইয়ুবের সম্বন্ধে রচিত কিছু প্রবন্ধ এবং তাঁর নিজস্ব কিছু রচনা প্রকাশ করার জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই। 'দেশ' সম্পাদক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী লিখিত 'গৌরী আমাদের জীবনের অন্যতম বিস্ময়' শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। লেখক অধ্যাপিকা আইয়ুবের যে অন্তরঙ্গ চিত্রটি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন তার মধ্য দিয়ে এই মহীয়সী মহিলার চরিত্রের অনেকগুলি দিকই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর রচনার অনেকটাই লেখকের মতামত-ভিত্তিক, সে-সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করি না, কারণ প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব একটি দৃষ্টিকোণ থাকাই প্রত্যাশিত। কিন্তু প্রবন্ধটিতে কিছু তথ্যগত ভ্রান্তি রয়েছে যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য বলে মনে করি। (গৌরীদির সঙ্গে আমার আত্মীয়তার কথা আপনার অজানা নয়—তিনি ছিলেন আমার সহধর্মিণীর আপন দিদি।) বিশেষ করে গৌরীদির মেজদা শ্রীসুধীজিৎ দত্তের তাগিদে এ-চিঠি লিখছি। তিনি নিজে এখন মুম্বাইতে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন, কিন্তু 'চতুরঙ্গে'র ওই সংখ্যাটি পড়েছেন। তিনি বেশ কিছু অংশ সংশোধনের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। এর মধ্যে তিনটি বিষয়ই মুখ্য। সেগুলি আপনার গোচরে আনছি:

(১) গৌরীদিদের পৈতৃক বাসস্থান পূর্ববঙ্গের যে-গ্রামে ছিল সেই সিঙরৈল ময়মনসিংহ জেলার সদর মহকুমায়, কিশোরগঞ্জ মহকুমায় নয়। কিশোরগঞ্জ অবশ্য সিঙরৈল গ্রাম থেকে মাত্র আট মাইল দূরে। ময়মনসিংহ থেকে ট্রেনে আসতে প্রথমে সিঙরৈলের স্টেশন মুশুলী পড়ে, তারপর নীলগঞ্জ আবার তারই পরের স্টেশন কিশোরগঞ্জ।

(২) গৌরীদির পিতা স্বর্গত অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত সম্বন্ধে শ্রীচৌধুরী লিখেছেন, "তাঁর জেলে বসে অর্জন করা এম.এ., প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ.....।" এ-থেকে অনেকের ধারণা হবে তিনি রাজনীতি করার সুবাদে জেল খেটেছেন। আসলে কিন্তু নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক দত্ত কখনও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেননি, তাই জেলে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাঁর পুত্র সুধীজিৎবাবু আমাকে জানিয়েছেন: "বাবা কিন্তু কোনও দিনই জেল খাটেননি। তা হলে কি সরকারি চাকরি পেতেন সে-আমলে? বাবার ইচ্ছা ছিল তাঁর ছোড়দা (শ্রী সাধন দত্ত মহাশয়ের পিতা স্বর্গত সুরেশচন্দ্র দত্ত)-র মতো দর্শন শাস্ত্র পড়ার। কিন্তু যেহেতু আই.এ.-তে লজিক পড়েননি, তাই বি.এ.-তে দর্শন পড়তে পারেননি। সংস্কৃত অনার্স ও অঙ্ক নিয়ে পড়েন। ১৯১৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। তারপর ১৯২১-এ এম.এ.-তেও সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। এম.এ. পরীক্ষা দিয়েই বাবা সবরমতীতে গান্ধীজির আশ্রমে চলে যান বেশ কিছুদিনের জন্য। পরে ময়মনসিংহে ফিরে এসে বছর দুই সামাজিক (অর্থাৎ সমাজসেবার) কাজে লিপ্ত ছিলেন। ১৯২৪-এ মহারাষ্ট্রের অমলনেরে Indian Institute of Philosophy-তে দর্শন গবেষণা করতে যান। তদানীন্তন ডিরেক্টর গান্ধীজির বন্ধু ছিলেন এবং সেই সূত্রে বাবার সঙ্গে সবরমতীতেই অলাপ হয়েছিল। ১৯২৫-এ যাদবপুরে National Council of Education-এর প্রধান হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাবাকে ওখান থেকে নিয়ে আসেন পি সি বসু মল্লিক চেয়ারে। সেখান থেকে পাটনায় যান। ১৯২৭-এ যাদবপুরে থাকাকালীন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ অর্জন করেন। পাটনায় এসে ১৯৩০-এ পি-এইচ.ডি. হন।"

(৩) শ্রীসুধীজিৎ দত্ত আরও লিখেছেন: "বাবা ১৯২৮-এর নভেম্বর মাসে বিহার সরকারের Educational Service-এ যোগ দেন পাটনা কলেজের সহকারী অধ্যাপক রূপে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন ১৯৫১-তে। অবশ্য এম.এ. ক্লাসগুলি সেকালে পাটনা কলেজেই ছিল। পদরেণু (অমিতাভ চৌধুরী) লিখেছে তার যখন ছয়-সাত বছর বয়স ছিল তখন নাকি বাবা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপদে যোগ দেন। পদরেণুর জন্ম কিন্তু ১৯২৭-এ।" তাই এ ক্ষেত্রেও শ্রীচৌধুরীর প্রদত্ত তথ্যগুলি সঠিক নয়।

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার আগামী কোনও সংখ্যায় একটি শুদ্ধিপত্র সংযোজিত হলে পাঠকদের ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ থাকে না।

অতীন্দ্রমোহন গুপ
এইচ এ—৪৪ বিধাননগর
কলকাতা-৭০০ ০৯১